সুন্দর থেকে সুন্দরতম...
দত্ত 13
অলঙ্কার শিল্পী ও স্বর্ণরৌপ্য ব্যবসায়ী
১১৭/২, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২
ফোন:: ৩৪-৪৭৬০

শিল্পগুরু
অবনীন্দ্রনাথের উদ্দেশে
আমাদের প্রণাম

ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর নাটকাবলী—**শরৎ-নাট্যসম্ভার** ৮৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
সাত পাকে বাঁধা ৪৷৹

দেবেশ দাশের
সেই চিরকাল ৩৷৹

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
পরিশোধ ৪৷৹

সুমথনাথ ঘোষের উপন্যাস
দিগন্তের ডাক ৩৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নূতনতম উপন্যাস
নীলতারা ৪৷৹ **অস্তি ভাগীরথী তীরে** ৭৷৹

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস
তরঙ্গের পর ৫৲

দক্ষিণারঞ্জন বসুর নবতম গ্রন্থ নিবেদন
একটি পৃথিবী একটি হৃদয় ৪৲

তারাশঙ্কর : বিভূতিভূষণ : বনফুল : প্রবোধ সান্যাল : গজেন্দ্র মিত্র : আশাপূর্ণা : মনোজ বসু : গৌরীশংকর ভট্টাচার্য : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় : সুমথনাথ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকদের বিবাহ বিষয়ক গল্পের সংকলন
নবজীবনের প্রান্তে ৩৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
মিলনান্তক ৪৷৹

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সুবিপুল ঐতিহাসিক উপন্যাস
বহ্নিবন্যা (তৃতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) ৮৷৹

প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস
কেরী সাহেবের মুন্সী ৮৷৹

যোগেশচন্দ্র বাগলের
জাগৃতি ও জাতীয়তা ৪৷৹

নিরুপমা দেবীর উপন্যাস
অনুকর্ষ ৪৲

নির্মলকুমারী মহলানবিশ প্রণীত রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের মর্মস্পর্শী কাহিনী—**বাইশে শ্রাবণ** ৫৲

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বিদ্যোদয়ের বই

চিত্রদর্শন ॥ *কানাই সামন্ত* ২৫·০০

বিশ্বভারতী পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার কাছে **শ্রীকানাই সামন্ত** ও তাঁর এই অনবদ্য গ্রন্থখানির পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বভারতী পত্রিকার গত শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮১ শকের সংখ্যায় গ্রন্থখানি সম্পর্কে **শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের** লেখা একটি বিস্তৃত আলোচনা বেরিয়েছে। তাছাড়া এই সুলিখিত তথ্যপূর্ণ মহাগ্রন্থখানি **যুগান্তর** [সম্পাদকীয় ॥ ২৩. ১১. ৫৯], **অমৃতবাজার পত্রিকা** [২২. ১১. ৫৯], **হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড** [৩১. ১. ৬০] প্রভৃতি পত্রপত্রিকা এবং শিল্পাচার্য **শ্রীনন্দলাল বসু** প্রমুখ দেশের বিশিষ্ট শিল্পী, শিল্পরসিক ও সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে।

মানব-বিকাশের ধারা ॥ *প্রফুল্ল চক্রবর্তী* ১২·০০

পৃথিবীর উৎপত্তি থেকে শুরু করে তার বুকে জীবনের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের ধারাপথে সর্বশেষে মানবের উদ্ভব এবং তার দৈহিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের তথ্যনিষ্ঠ সাবলীল ইতিহাস। গ্রন্থখানি সম্পর্কে শনিবারের চিঠি [মাঘ, ১৩৬৬] তে **নারায়ণ চৌধুরী** বলেছেন : "……এই বৃহদায়তন গ্রন্থটি বাংলা জ্ঞানবাদী সাহিত্যে এক অভিনব মূল্যবান সংযোজন।· বাংলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ খুব বেশী রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।…এই মূল্যবান গ্রন্থটি সকলেরই পড়া উচিত এবং পড়লে তাঁরা উপকৃত হবেন, সেকথা অবশ্য স্বীকার।" এ ছাড়া গ্রন্থখানি **যুগান্তর** [৭. ২. ৬০], **আনন্দবাজার পত্রিকা** [৬. ৩. ৬০] প্রভৃতি পত্রপত্রিকার অভিনন্দন লাভ করেছে। গ্রন্থখানিতে প্রায় ৬০ খানি আর্ট প্লেট দেওয়া হয়েছে।

পরিব্রাজকের ডায়েরী ॥ *নির্মলকুমার বসু* ৪·৫০

বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর সম্মিলন-ভূমি আমাদের এই দেশ। বিচিত্র তাদের জীবনযাত্রা, বিচিত্র তাদের সংস্কৃতি। এদেরই জীবনের অন্তরঙ্গ রসঘন চিত্র এঁকেছেন গ্রন্থকার। গ্রন্থখানি **আনন্দবাজার পত্রিকা** [৭. ২. ৬০], **যুগান্তর** [১৩. ৩. ৬০] প্রভৃতি পত্রপত্রিকার উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। **যুগান্তর** বলেছেন : "……সবশ্রেণীর সকল রকম পাঠকের মন ও রুচি তৃপ্ত করে এই বই-এ।"

পরিভাষা কোষ ॥ *সুপ্রকাশ রায়* ১০·০০

ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ও দর্শন—এই পাঁচটি বিষয়ের ইংরাজী পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ, সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও বিশেষজ্ঞগণের মত সম্বলিত এ জাতীয় গ্রন্থ এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নি। তাই **অমৃতবাজার পত্রিকা** বলেছেন : ". . . By bringing out this compilation the author has tilled the virgin soil. . . . It will help all scholars to find out what they have been seeking so long . . . ." এ-ছাড়া গ্রন্থখানি দেশ [১১. ৪. ৫৯], **যুগান্তর** [২৪. ৮. ৫৮] প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও দেশের পণ্ডিতজনের আন্তরিক প্রশংসা লাভ করেছে।

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ॥ *খগেন্দ্রনাথ মিত্র* ৭·০০

ডঃ **শশিভূষণ দাশগুপ্ত**, ডঃ **আশুতোষ ভট্টাচার্য**, **শ্রীকালিদাস রায়** প্রমুখ সুধীবৃন্দ এবং **যুগান্তর** [৪. ১. ৫৯], **প্রবাসী** [চৈত্র, ১৩৬৫], **দেশ** [৭. ২. ৫৯], **অমৃতবাজার পত্রিকা** [২২. ২. ৫৯], **মডার্ন রিভিউ** [ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯] প্রভৃতি পত্রপত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে এই গ্রন্থখানি। **ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য** বলেছেন : "…ইতিপূর্বে এই সাহিত্য সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা কেহই করেন নাই। তিনিই (খগেন্দ্রবাবু) নিঃসঙ্গভাবে এই দুরূহ ব্রত সার্থকতার সঙ্গে প্রথম উদ্‌যাপন করিলেন।… গবেষণামূলক আলোচনা হইলেও রচনার গুণে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।…"

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র ॥ *সংকলন* ৬·০০

যুগান্তর [১৭. ১. ৬০] বলেছেন : "জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আচার্যের বেশ কয়েকখানি জীবনচরিতই প্রকাশিত হয়েছে, তবু প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, আলোচ্য জীবনীগ্রন্থটি নানা কারণেই সেগুলির থেকে স্বতন্ত্র।…" এবং **দেশ** [২১. ৩. ৫৯] বলেছেন : "…এই গ্রন্থের মহৎ উদ্দেশ্যকে আমরা অভিনন্দন জানাই।"

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

ঝকঝকে
করতে হলে আপনার পিতল ও তামার
জিনিস পত্র
রোজ ব্রাসো দিয়ে পালিশ করুন
BRASSO
BRASSO
এ্যাটলান্টিস্ (ইষ্ট) লিমিটেড (ইংলণ্ডে সংগঠিত)
PSAE 23

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জোড়াসাঁকোর ধারে

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত

"এ বইয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর শিল্পীজীবনের ক্রমবিকাশের কথা। অবনীন্দ্রনাথ শুধু রেখা-রঙের শিল্পী নন, ভাষাশিল্পীও। বাংলা গদ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট আসনের অনুপেক্ষণীয় দাবি নিয়ে এসেছে— 'জোড়াসাঁকোর ধারে'।" —কবিতা

মূল্য ৪'০০ টাকা

ঘ রো য়া

"ঠাকুর-পরিবারের, ও তাকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন অভিজাত ও মধ্যবিত্ত বাংলা দেশের যে রূপ 'ঘরোয়া'য় ফুটে উঠেছে তা ইতিহাসের পাতায় কিংবা অন্য কোনো বইএ পাওয়া যাবে না, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'য় ছাড়া।" —চতুরঙ্গ

মূল্য ২'৫০ টাকা

বিশ্বভারতী

বই বাঁধাইবার বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

- বহুবৎসর যাবৎ সুষ্ঠুরূপে ও সুনামের সহিত
- বিশ্বভারতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আর্য পাবলিশিং প্রভৃতি প্রকাশকদের পুস্তক নিয়মিত বাঁধাই হইয়া থাকে
- উন্নত ধরণের বাঁধাই-কার্য চুক্তিবদ্ধ হইয়া গ্রহণ করা হয়।

ইণ্ডিয়ান বুক বাইণ্ডিং এজেন্সি

৭২ বৈঠকখানা রোড। কলিকাতা ৯

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৬ সংখ্যা ২-৩ কার্তিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য তিন টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৬ সংখ্যা ২-৩ কার্তিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক

চিঠিপত্র

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীনন্দলাল বসুকে লিখিত

১

26th June [1924]
Jorasanko

প্রিয় নন্দলাল

চীনের যে পোষ্টকার্ডগুলো পাঠিয়েছিলে সেগুলো দেখে ভারি খুসি হলুম এতদিন তোমরা জাপান দেখে ফিরছ— এই চিঠি তোমাদের ফেরার পথে গিয়ে আমার মনের সঙ্গে অপেক্ষা করে রইলো তোমাদের ঘরে আসার পথ চেয়ে।

এবারে এখানে ভীষণ গরম পড়েছে— কলকাতায় এমন গরম কেউ দেখেনি গ্রীষ্মে কিন্তু আমার ছবি পুরোদমে চলেছে— কিন্তু শরীর ভারি অবসন্ন বোধ হয়। বোলপুরে বৌমা এবং তোমার ছেলে মেয়ে ও ছাত্রেরা সকলে বেশ আছে খবর পাই।

আমি এখন বিরুর[১] জন্যে কতকগুলো পশুপক্ষী আঁকছি। আমাদের শিল্পশাস্ত্রকারেরা দেবমূর্ত্তিই ধ্যান করতেই বলেছেন কিন্তু তাতে করে বানর আঁকার বেলায় টিয়াপাখি ছাগল ইত্যাদি লিখতেও ভারি মুস্কিল বাধে এটা আমি দেখতে পাচ্ছি।

মাটি ছেড়ে আকাশের দিকে শুধু হাত বাড়ালে artist কোন ফল পাবে না, আকাশকুসুম দুচারটে পেয়ে কি হবে তার ঠিক নেই। চীন মাটির বাসনে সিদ্ধহস্ত হল তবেই না এতটা দূর থেকে তার নাম শুনে লোক ছুটলো China দেখতে। আর্টিষ্ট মাটিছাড়া হলেই বিপদে পড়ে এটা ভারি সত্যি অতএব চীনের শিল্পশাস্ত্র জল মাটি হাওয়া এই তিনের সম্বন্ধে যে উপদেশ দেয় তার মধ্যে মাটিকেই প্রথম স্থান দেওয়ার কথা আছে, মৃদঙ্গের ধ্বনি শ্রেষ্ঠ এই কথা চীনে ভাষার সঙ্গীতশাস্ত্রেও দেখেছি।

প্রথম মাটি হতে হবে তার পর জলে গলতে হবে তার পর কল্পনার ডানায় ভর ও ওড়া। আমাদের বোলপুরের ও এখানের[২] ছাত্রগুলো একেবারেই উড়তে চায় জল কাদা ছেড়ে, পড়েও ঝুপ্‌ঝাপ্‌। এত ঠেকে শেখার চেয়ে দেখে শিখলেই আপদ চুকে যায়। আমি দেখ না মাটি কামড়ে যেখানকার সেখানে গট্ হয়ে বসে আছি আর তোমরা— বিশেষ ক্ষিতিমোহনবাবু[৩] আমাদের কি দুঃখই পাচ্ছেন ভুঁইছাড়া হয়ে। জলপথে কালিদাসবাবুর[৪] কথা স্বতন্ত্র আর ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা কিম্বা অবনীবাবুর কথা স্বতন্ত্র। এই

১ পৌত্র শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিএণ্টাল আর্ট বা 'সোসাইটি'র ছাত্রেরা ?

৩ ক্ষিতিমোহন সেন। চীনভ্রমণে তিনি, শ্রীনন্দলাল বসু ও শ্রীকালিদাস নাগ রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন।

৪ শ্রীকালিদাস নাগ

শেষের দুজনের নাম পর্য্যন্ত মাটি না হয়ে যায় না যদি না এরা ঘ'রো রকমে বসবাস করতে গৃহস্থাশ্রমে না থাকে। বেদের মহীসূক্তটা পড়ে দেখো—মাটি আর মাটির জন্যেই সেখানে সব ছন্দ সব ভাষা ভাব! একেবারে পাকা আর্টিষ্টের কথা।

রথী[৫] প্রতিমা[৬] এখানে কলকাতাতেই রয়েছে—প্রতিমা প্রায় আমার কাছে এসে এসে ছবি শিখছে।

রবিকাকাকে আমার প্রণাম জানিও—গান বাজনার সাড়াশব্দ কোথাও পাইনে। বর্ষামঙ্গলটাও বাদ পড়ে গেল। বিশ্বভারতী কেবল যদি মস্ত একটা আফিস আর লাইব্রেরী হয়ে পড়ে তো সব যে মাটি হবে তার আর কথা কি।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

শুক্রবার
জোড়াসাঁকো

প্রিয় নন্দলাল!

কবির জন্মদিনে তোমরা যোগ দিয়ে উৎসব করছো সুতরাং নিশ্চয়ই তোমরা রূপদক্ষ এবং রসিকও বটে আমি এ সম্বন্ধে কোনো তর্ক তুলছিনে শুধু আমি কেন যেতে পারলাম না তাই বলি—আজ সকাল থেকে আলোর একটি সাদা পাখি এবং অন্ধকারের একটি কালো পাখি দুজনে দুটী পালক আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললে এর মধ্যে কোনটি সাদা কোনটি কালো বিচার করে বল—ভাবতে ভাবতে রেলের সময় উৎরে গেল প্রশ্নেরও মীমাংসা হল না তাই তোমাদের শরণাপন্ন হচ্চি—আমার নাম ডোবে যদি তোমরা কেউ এর সদুত্তর একটি সাদা পালক আর একটি কালো পালকের সঠিক হিসেব না লিখে পাঠাও। দিন রাত দুজনে আমাকে মহা সমস্যায় ফেলে তোমাদের ওখানে উৎসব করতে গেছে—আমি এখানে বসে মনের আসনে সাদা কালোর আলপনা টান্‌চি আর কল্পনায় দেখছি কবির সঙ্গে তোমরা সেই আসনে বসে উৎসব করছো।

রবিকাকাকে আমার প্রণাম দিও, বন্ধুজনকে সম্ভাষণ জানিও, তোমরা এবং ছোটরা আমার বাকি যে শুভকামনা নিয়ো। মন গেল উড়ে সেখানে, মাথা বসে বসে ভাবছে সাদা কালো পালকের তত্ত্বকথা। আর থেকে থেকে পাখার বাতাস খাচ্ছে।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

৫ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬ শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর

রবিবার
জোড়াসাঁকো

প্রিয় নন্দলাল!

তোমার আর রমেনের[১] কাছ থেকে প্রশ্নটির পরিপাটি উত্তর পেয়ে আনন্দিত হলেম। গিরিমাটির রংটি রং এবং রূপ দুয়ের মাঝে বৈরাগীর মতো নির্লিপ্তভাবে বসে থাকে রূপের পরশ রংএর আভা তার উপর দিয়ে আসা যাওয়া করে কিন্তু কাবু হয় না বৈরাগী, সাদা কাগজ সাধাসিধে মানুষটি তাকে রং রূপ দুজনেই সহজেই কাবু করে, রংএর সঙ্গে রূপের সঙ্গে সে লিপ্ত হয়ে যেতেই চায়— "রংএর ধারায় (রূপ) হৃদয় হারায়" এই দেখতে পাই বিশ্বচিত্রে— কিন্তু মানুষের চিত্র, সেখানে রূপকে সজাগ করে দিতে রইলো বৈরাগী ও রং রূপকে রংএর সমুদ্র রংএর আবর্ত্ত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে চংল বৈরাগী নয়ও বটে প্রায় সাদা কাগজ বটে আবার রং বল্লেই চলে ওকে। তার পরে আর এক কথা গিরিমাটির রং হল জাৎসাপের মতো, ওর একটা আভিজাত্য আছে, অন্য রং তারা আভা রং নয়, তারা হঠাৎ নবাবের মতো বহুরূপী ও ক্ষণিক তাদের প্রকাশ, নটনটীর মতো তারা সাজসজ্জা করে যখন আসে তখন বৈরাগী পালাই পালাই করেন বটে মনে হয় কিন্তু খাঁটি আগলে নিজেকে সমান বরাবর বসেই থাকে ঠিক জায়গায় রংএর খেলায় রূপের লীলায় তিনি বাধা দেন না এইটাই প্রমাণ করেন যেন তিনি কেউ নয় রূপ রং তারাই সব, রংএর বাক্সর থেকে তিনি ডেকে বলেন আমি তৃণাদপি কমজোর আমার চেয়ে রংরাই সব কার্য্যকরী, ওদের নিয়ে খেলাঘর বাঁধ, ওরা কেউ শক্তিমান কেউ রূপবান, আমার রূপও নেই শক্তিও নেই কিন্তু মাটির মতো আমি স্থির, রূপের রংএর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমাকে জেনো, আমার মধ্যে রং রূপ আছে এবং নেই।

এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়েছ তাই তোমাদের সকলকে আর্ট সম্বন্ধে আমার একটা বচন উপহার পাঠাই—

পুতুলী গড়তে চারদিক দেখি
পট্টি লিখতে একদিক লেখি

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ— চিত্র একমুখি— গড়ন চারমুখি। এখন ছবিতেও perspective ইত্যাদি দিয়ে চার মুখ দেখানো হচ্ছে, আসলে কিন্তু সেগুলো ছবি হচ্ছে না, গড়ন হচ্ছে খাঁটি পট লিখবে তো এক মুখ লিখবে। পারস্য দেশের গালিচা একমুখি পটের নমুনা— বিলাতি গালিচা চতুর্ম্মুখ গড়নের নমুনা।

---

১ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

৪

রবিবার

প্রিয় নন্দলাল!

আজ গোটা কতক কথা মনে এল শিল্পের 'ক' 'খ' জানতে হলে এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই :—

(ক) যে ছবিকে লোকে পাথরে কাটলে কাঠে কুন্দলে স্ুঁচ দিয়ে তুল্লে কিম্বা আঁচড়ে বার করে আনলে তারা এক জিনিষ আর—

(খ) যে ছবি ফুটলো পটে সে আর এক জিনিষ।

কারণ (ক) সে মানুষের শক্তির পরিচয় ছাড়িয়ে উঠতে সম্পূর্ণভাবে পারলে না। মানুষ-ছোঁয়া হয়ে রইলো অনেকখানিই, যে তাদের ফোটালে তার বাহাদুরি কতকটা মনে পড়াতে থাকলো— যে ভাবে কাগজের ফুল সেই ভাবের কাজ এরা।

(খ) কিন্তু অন্যভাবে কাজ করতে থাকলো, কেননা সে সত্যি ফুটলো পটে, কেউ যে তাকে ফুটিয়েছে যত্নে চেষ্টায় এটা লোপ পেয়ে গেল কাজ থেকে।

একমাত্র চিত্রে সুকুমার সমস্ত পরশ দিয়ে এইভাবে রস ফোটানো চললো— অন্য কিছুতে নয়।

কাযটি ফুটলো চমৎকার, কায যে ফোটালে সে বাতাসে মিলিয়ে গেল পরিষ্কার— এ হল চিত্রবিদ্যার চরম সার্থকতা— সবাই এটা পারে না।

নদীজলে মাছ থাকে কিন্তু আঁস-গন্ধ পায় না জল। কুণ্ডের জলে মাছ থাকে জল পর্য্যন্ত মাছের গন্ধে দূষিত হয়!

(ক) তেমনি একরকম ফুলও আছে যা মালি মালি গন্ধ করে, কাযও আছে যা মানুষ মানুষ গন্ধ করে!

(খ) আর একরকম আজ আছে যা ফুটন্ত ফুল— ফুল ফুল গন্ধ করে।

তোমারি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅসিতকুমার হালদারকে লিখিত

৫

প্রিয় অসিত,

বোলপুরে যদি ছোটখাট একটি gallery করে তুলতে পার তো মন্দ হয় না।

আমি এখন চিত্রের ষড়ঙ্গ[১] লিখতে ব্যস্ত আছি সুতরাং আর কোনো বিষয়ে মন দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বোলপুরে শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে সব কথা খুলে তোমায় লিখতে সময় নেই, এইটুকু মনে রেখো যে নিজেকে সেখানে গুরুমশায়ের জায়গায় বসিয়ে ছেলেদের ভয় খাইয়ে দিও না। মনে রেখো যে পাখী পড়াতে হলে পাখীর সঙ্গে নিজেও পাখী হতে হয়।

১ ১৩২১ সালে ভারতী পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ', বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী

৬

প্রিয় অসিত,

…খবরের কাগজ হইতে সাবধান থাকিও। আমি কখনো খবরের কাগজ পড়ি না, সুতরাং সেটার certificate-এর মূল্য আমার কাছে নাই। তা ছাড়া অত দেখিবার সময় কোথা?

মান মনীকী মুট্‌কী সির পর্
নাহক্ বোঝ মরোবি।
মুট্‌কী পটক মিলো পীতম সে
সাহেব কবীর কহোরী॥

—র মত যদি নাম ও টাকা খুঁজিয়া বেড়াও তবে তোমার দশা কিরূপ হইবে জান?

গৃহী ত্যজিকে ভয়ে উদাসী
বনখণ্ড তপ্‌কো যায়।
চোলী থাকি মারিয়া
বেরই চুনি চুনি খায়॥

গার্হস্থ্য ছাড়িয়া হইল উদাসীন, তপস্যার জন্য গেল বনখণ্ডে, দেহকে মারিল ক্লান্ত করিয়া, এত করিয়া শেষে বাছিযা বাছিয়া খাইতে লাগিল জঙ্গলী কুল!

৭

প্রিয় অসিত,

[১]স্বপ্নপ্রয়াণ লইয়া Society[২] ছাপাইতে তো চাহে নাই? তুমি ভুল বুঝিয়াছ। ছবিগুলি হইলে সেগুলি society হইতে বিলাতে পাঠাইয়া যাহাতে অল্প খরচে ছাপানো হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে এইমাত্র। তুমি বড়জ্যাঠামশায়কে[৩] ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিও।

রবিকাকার গল্প সম্বন্ধে তিনি যেরূপ বলেন sketch করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া আঁকিও। বীজের ভিতর যেমন গাছ real-এর আড়ালে ideal তেমনি লুকাইয়া থাকে, খুঁজিলেই পাইবে।

তোমার অজন্তার drawing গুলি পাঠাইতে ভুলিও না। সমরেণ গুপ্ত July মাসে তাহারগুলি লইয়া আসিবে।

স্বপ্নপ্রয়াণের ছবি বড় শক্ত, কেননা সেটি নিজেই একটি চমৎকার ছবি। কেবল ছবি না দিয়া সেটাকে গোটাকতক decorative border দিয়া ছাপাইলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাহাও করিয়া তোলা সময়-সাপেক্ষ, এবারের মত ছবি না দিয়া বইখানি বাহির করা ছাড়া তো উপায় দেখি না। আমার গল্প পূজার মধ্যেই বাহির হইবে।

---

১ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ (ও রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের) সচিত্র সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব উপলক্ষ্যে এই পত্র লিখিত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এক সময় অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বপ্নপ্রয়াণের কোনো কোনো অংশ চিত্রিত করিয়াছিলেন।

২ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট

৩ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

প্রিয় অসিত,

তোমার চিঠি বীরেশ্বরের[1] লেখা সব পেয়েছি। সময়াভাবে জবাব দিতে পারি নি।

Tradition-এ আর fashion-এ গোল করেছেন বিরু[1]। বোঁটা ছাড়া ফল যেমন অসম্ভব, tradition ছাড়া art-ও তেমনি অসম্ভব। মৌচাক tradition-মতো গড়া হয়— মধুও তৈরী হয় traditional প্রথায়; নতুন নতুন বাগানের ফুলে নতুন নতুন মৌমাছি মধু রচনা করে, এই তো জানি। চাক্ ছাড়া মধুর মানে কেমিক্যাল মধু যা জার্মানি ও বিলাত থেকে আসে; তার স্বাদ আর আসল মধুর স্বাদ ঢের তফাৎ। Saccharine রোগীর পক্ষে, Glucose তাও মুমূর্ষুর পক্ষে, সুস্থ মানুষের পক্ষে আক না হয় মধু। তাড়ি খায় মাতালে তাও প্রস্তুতের tradition আছে। গুড় প্রস্তুতের tradition ছেড়ে গুড় কে করে? আমাদের প্রত্যেকের অস্থি মাংস মজ্জা সবই tradition মতো ধরে, তবেই হয়েছি তুমি, আমি, এ, ও, সে; ওটা বাদ দিয়ে spirit নিয়ে ভূতগত ব্যাপার সৃষ্টি হতে পারে। পুব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশই নেই, কোনো art নেই যার tradition নেই, খালি আমাদেরই থাকবে না— এ কেমন কথা? জগৎ জোড়া ফুলবাগিচা, ছেড়ে দাও সেখানে ছাত্রদের, বেছে নিক নিজের অমৃত নিজেরাই। নয় তো tradition বাদ ছবি, মূর্ত্তি, তাদের করে দেখাও পারো তো— Example is better than precept। বরং অজন্তা জান, কিন্তু Argentine কিছুতেই নয়।

৯

প্রিয় অসিত,

তুমি তো সেখানে art school-এর কর্ত্তা কিন্তু আজ তোমায় একটা নূতন ও চমৎকার জিনিষের খবর দিই, যা লক্ষ্ণৌ-এ তৈরী হয়ে বিক্রী হচ্ছে অথচ এতদিন তোমরা সে আর্টটার খবর নাওনি একেবারেই:

আমার কয়েক আত্মীয় এবার লক্ষ্ণৌ থেকে এক টিনের বাক্স ভর্ত্তি মাটির পুতুল এনেছেন, তার মধ্যে দেখলুম কতগুলি এক ইঞ্চি পরিমাণ মাটির গড়া নানা রকম পাখীর মূর্তি, অতি মজাদার খেলনা। এই যেমন পাখীর তেমনি পশুর set নিশ্চয় আছে, জাপানিদের তৈরী ছোট ছোট চিনেমাটির মানুষ পশু পাখী ইত্যাদি দেখেচ তো? ঠিক্ সেই art, কেবল পোড়া মাটিতে হাতে রং করে গড়া, এই তফাৎ। খেলনাগুলো একেবারে বাজারের রকমে cheap কিন্তু art শেখার পক্ষে ভারি কাজের। তুমি যদি খেলনার খোঁজ নিয়ে দুই সেট পাখী এবং দুই সেট চতুষ্পদ ইত্যাদি complete set কিনে আমাকে ভাল করে pack করে V. P.-তে পাঠিয়ে দাও তো তোমায় শত শত আশীর্ব্বাদ করি। তুমি জিনিষগুলো দেখলে খুশী হবে, আর ছেলেমেয়েরা তোমার তো সেগুলিকে একেবারে গালে পুরে দেবে। নীচে একটা পাখীর পুরো মাফটা যথাসম্ভব দিলাম। এই artist-এর নামধামও জানা দরকার। একে তোমরা উৎসাহ দিও।[2]

১ শ্রীবীরেশ্বর সেন

২ উত্তরে অসিতকুমার লিখিয়াছিলেন— "আপনার পত্রখানি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হলুম। কেননা আমি ঠিক ঐ জিনিষই (মাটির মুড়কি পাখী) তৈরী করিয়ে Emporium-এর মারফৎ বহুল প্রচার করেচি। এখন আপনার নিকট ঠিক সেই জিনিষেরই প্রশংসা পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত ও গৌরবান্বিত বোধ করচি। ·"

১০

প্রিয় অসিত,

'কলার বোল' যা দু একটা হাতের কাছে ছিল তাই পাঠালাম। ইংরাজী ভাষার প্রতিধ্বনি দিয়ে আমাদের কলা সম্বন্ধে বলাবলি চালাতে যদি হয় তবে আমি বলি ইংরাজীটাই বা রাখলে মন্দ কি? যদি সত্যি একটা অভিধান চাও তো গাঁয়ের মিস্ত্রি, সহরের কারিগর, এদের কাছ থেকে ঘুরে ঘুরে বোল্‌চাল্‌গুলো আদায় করে নেবার চেষ্টা কর। এ না হলে সবাই 'আকালিক স্থাপনা' 'উৎকট-ধারা-প্রিয়তা'র মত উদ্ভট হয়ে উঠবে—বাংলাও হবে না, ইংরাজীও হবে না, হিন্দীও হবে না। তা ছাড়া বিধির-নিয়মে যেমন আগে বোল পরে আম বা আগে মোচা পরে কলা, art সম্বন্ধে তার উল্টোটা ঘটে যথা:—আগে কলা তারপর কলাভবন, শেষে সেখানে বসে বোলচাল্। আমি দেখছি আমরা কলাবাগান প্রস্তুত করে বসতে চাচ্চি কলাসংগ্রহের পূর্ব্বেই। একেই বলে চলিত কথায় গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। চলিত কথার মধ্যে অনেকখানি আমাদের অনাবিষ্কৃত, সেই জন্যেই বলি বসে থেকো না। চলে ফিরে কথাগুলি সংগ্রহ কর।

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তকে লিখিত ১১

পোষ্টমার্ক
কলিকাতা ৩১ মার্চ ১৯২৪
সোমবার

ওগো গুপ্তশিল্পি

জাপানি চিত্র সম্বন্ধে, তোমার প্রবন্ধটি[১] পাঠ করে গোটাকয়েক প্রশ্ন মনে উদয় হয়েছে সেগুলি শিল্পের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন হিসেবে লিখে পাঠাচ্ছি— গুরু-শিষ্য সবাই মিলে জনে জনে নিজের নিজের নাম সই করে প্রশ্নের সদুত্তর আমার কাছে পাঠাতে যেন অন্যথা না হয়—

প্রশ্ন

১ গাছের গুঁড়ির উপরে একটা ফড়িং এবং গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়া একটা মানুষ এ দুটোকেই চিত্র হিসেবে একই প্রাকৃতিক দৃশ্য বলা ভুল না ঠিক?

২ প্রাকৃতিক দৃশ্য Landscape, Nature Study ইত্যাদি জীবযুক্ত হলেই কি নিছক Landscape হয় না জীবকে বাদ দিয়ে Landscape আছে— এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

৩ "ভারতীয় চিত্রে কোথাও দৃশ্যচিত্রের স্থান নাই" এ কথাটি ভুল না ঠিক লিখিয়া জানাও।

৪ "আমাদের (চিত্রে) মানুষ সামনে, প্রকৃতি পিছনে; আর জাপানীদের প্রকৃতি সামনে মানুষ পিছনে" এই উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণ কর লিখিয়া— এবং প্রকৃতি বলতে কি বোঝায় তাও নির্দ্দেশ কর।

৫ "পিউ বল্ল, মহারাজ অন্যেরা বীণা বাজাতে ব্যর্থ হয়েছে—" এই ছত্রটিতে ভুল কোথায় আছে সংশোধন করে লেখ এবং প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন লিখিবার সময় কোথায় কোথায় বানান ভুল করেছেন সেটাও ধরে দাও।

৬ Landscapeর প্রতিশব্দ দৃশ্যচিত্র না আর কিছু হবে— চিত্র মাত্রেই তো দৃশ্য!

---

১ জাপানী আর্টের যৎকিঞ্চিৎ। ভারতবর্ষ ১৩৩০ চৈত্র

বিশেষ প্রশ্ন

একটা ছবি চীনের কি জাপানীর কি ভারতবাসীর অথবা মিশরবাসী কিম্বা সাহেবের আঁকা এটা যে সহজেই ধরা পড়ে দেখবামাত্র তাহার কারণ অনুসন্ধান কর। প্রাচীনকালেই শিল্পের মধ্যে ভিন্ন জাতি হিসেবে যে রূপের ভিন্নতাও হয়ে গেল এটা মানবমনের কোন গোপনীয় রহস্য ব্যক্ত করছে তা বিচারপূর্ব্বক লিখে জানাও।

৭ আজকালের দিনে জাতীয় শিল্প বলে একটা শিল্প উদ্ভব হতে পারে কিনা এ বিষয়ে তোমার মতামত জানাও—

ইতি

প্রশ্নকর্ত্তা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

পোষ্টমার্ক

শান্তিনিকেতন ৮ এপ্রিল ১৯২৪

সোমবার

[কলিকাতা]

প্রিয় মণীন্দ্র

আমার প্রশ্নের জবাব তুমি সহজে বেশ পরিষ্কার করেই দিয়েছ দেখে আনন্দ হল—তোমাকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ধরা গেল। প্রশ্নের উত্তরে যদি তোমার হারও হতো তাতেও আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতেম এবং কবির ভাষায় যে হার স্বীকারের কথা বলা হয়েছে সেই কথাই স্মরণ করতে বলতাম

তোমার সাথে বারে বারে

হার মেনেছি এই খেলাতে

যে artist হারতে ভয় পায় সে কোন দিন কিছু জিতে নিতে পারে না এটা তোমার সহপাঠীদের জানিয়ে দিও।

প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো ছাপাতে চাও তো আমার আপত্তি নেই তবে আমার বানান ভুলগুলো শুধরে ছাপিও।

Landscape-র ঠিক প্রতিশব্দ হল "স্থানচিত্র" আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে কয় রকম চিত্রের কথা বলা হয়েছে যথা— ১ চিত্র ২ বন্ধচিত্র ৩ আকারচিত্র ৪ গতিচিত্র ৫ স্থানচিত্র ৬ বর্ণচিত্র ৭ স্বরচিত্র

তোমাদের ওখানে যিনি পণ্ডিত আছেন তাঁর কাছে এই কটা রকম চিত্রের হিসেব জেনে নিও নয়তো এখানে যখন আসবে তখন আমি বুঝিয়ে দেবো।

গরমে তোমাকে ভাবিয়েছি বলে মনে করো না, চিন্তামণি যাতে পাও তারি চেষ্টায় আছি জেনো।

সবাইকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও

তোমারি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পী শ্রীচারুচন্দ্র রায়কে লিখিত ১৩

প্রিয় চারু

তোমার বয়সের হিসেব নিয়ে যদি তোমাকে ছেড়ে দিই কিম্বা তোমার জাতের খবরটা নিয়ে চুপ করে বসে থাকি তবে তোমাকে জানা একেবারেই হল না, তেমনি এই চীনদেশের ছবি মুর্ত্তি ইত্যাদির বেলায় শুধু এগুলো কত দিনের এবং কোন দেশের ইত্যাদি জেনে আর্টিষ্ট রস পায় না।

এরা কি সংবাদ নিয়ে এল, কোন রসের উদ্রেক করলে এই সব দেশ দেশান্তরের দূত এবং অভ্যাগত এইটের খবর নেওয়া যখন হল তখনই এদের সঙ্গে ঠিক উপযুক্ত ব্যবহার করলে তুমি, না হলে কাপ্তেন বাবু যেমন কুক কোম্পানীর আড়গোড়ায় গিয়ে ঘোড়ার দাঁত দেখে বয়েসের ও লক্ষণ মিলিয়ে জাতের ঠিক করে আসে সেই ভাবের ব্যবহার করলে এই সব শিল্পদেবতার দূতগণের সঙ্গে, এদের সঙ্গে আসল পরিচয় হলই না তোমার।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তরুণ পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত ১৪

ওগো তরুণ সম্পাদক,

এই বুড়োর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর, কিন্তু দূরে থেকে তাকে নমস্কার ক'রো, অন্যথা হলেই বিপদে পড়বে। বুড়োকে তরুণ বলে ভুল করা তোমাদের স্বভাব, কিন্তু বুড়ো সে জানে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে পারলে বেশ এক চোট মোড়লী করবার স্থবিধা পাবে। তাই সে দূর থেকে কাছে এগোতে চায় তোমাদের নানা ছলাকলায় ভুলিয়ে। সাবধান! বুড়োদের লেখা যত কম পারো ছাপিও। একটা গল্প আছে— কচিপাতায় আর একটা ছাগলে একবার ভাব হয়েছিল। কচি ডালে কচি পাতা, ছাগল তার নাগাল পায় না, কিন্তু রোজ তাকে ডেকে বলে— তোমার ফুটন্ত ভাবে আমি মজে আছি। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তোমারি নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ছবি মনে পড়ে। ওগো তরুণ এসো বুকের কাছে! কচি পাতা খুসি হয়ে ভাবে এ-যে আমার একজন, এর প্রাণে যৌবনের জোয়ার বইছে দিনরাত! ভুল করে পাতা ফলভরে নুয়ে পড়ে, এগিয়ে আসে মাঠের দিকে। বুড়ো মালী এসে ফল পেড়ে নেয়। বুড়ো ছাগটা এসে সবুজ পাতা চিবিয়ে নিজের চোয়াল সবুজ রংএ ছুপিয়ে চুপি চুপি কচি ছেলের মতো মা মা করতে করতে অন্য ডালের কচি পাতার দিকে অগ্রসর হয়। ইতি—

অর্দ্ধবৃদ্ধ তোমাদের
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তরা-সম্পাদক শ্রীসুরেশ চক্রবর্তীকে লিখিত ১৫

কলিকাতা— ১১ই মাঘ [১৩৩২]

প্রিয়বরেষু

তোমাকে বলেছিলেম যা বলবার ইচ্ছা ছিল তা বাড়ী গিয়ে লিখে পাঠাবো— কিন্তু তখন ভাবিনি সেখানকার আবহাওয়াতে যে-সব কথা ফুটি-ফুটি করলেও তারা এখানে এসে ঝরে যাবে! আবার যদি দিন পাই তো সে-সব কথা যত্নে ফুটিয়ে মালা গেঁথে পাঠাবো "উত্তরা"র জন্যে। গোমতী নদীকে আমাদের আগেকার লেখকেরা ভাল চক্ষে দেখেন নি, তা তো জান—"ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে, মরণং গোমতীতীরে" কিন্তু সত্যি বলছি— ঐ গোমতীর ধারেই আমি অনেকদিন পরে একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেয়ে এসেছি— আমি বোধ কচ্ছিলেম আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে কিন্তু এই নদীপারে আমার নতুন কর্ম্মক্ষেত্র আমি বিস্তৃত দেখে এলেম, কাজেই আমি সেই প্রাচীনা গোমতীর নতুন নাম দিচ্ছি "ঘুমতী নদী"। আমি আমার প্রেয়সী "ঘুমতী"কে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি, ঘুমোতে যাবার আগে দেখেছি, সকাল সন্ধ্যা আমি তাকে শুধিয়েছি— সে কাকে খুঁজে খুঁজে ফিরছে! "ঘুমতী" আমাকে তার মনের কথা বলেছে— সে চাচ্ছে তার বাদশা বেগমকে! সাহিমহলের সুন্দরী পরিচারিকা— সে সকাল-সন্ধ্যা অপরূপ সাজে সেজে "মোতিমহলের" ধারটিতে এসে দাঁড়াতো— আমি তখন ঘাটে বসে— আমাকে সে শুধোতো, "এসেছেন তাঁরা!"

আমি বলতেম— "কই না তো?" প্রাতঃসন্ধ্যায় কোনদিন সোনার ওড়না টেনে, সায়ংসন্ধ্যায় কখনো বা নীল বোরখায় আপনাকে আড়াল করে সে চলে যেতো। একদিন তখন সন্ধ্যারাগে বারোদোয়ারীর টুকরো টুকরো পাথরগুলো হোলির দিনে আবিরে যেন রাঙা হয়ে উঠেছে, নদীর ওপার থেকে অকালে দক্ষিণের হাওয়া বইতে শুরু করেছে, সেই সময় আমি আমার ঘুমতী নদীকে বলেছিলেম— "তোর বুকে আমার ছাওয়া কি পড়েনি ঘুমতী?"

নদী সে স্থির হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো— দক্ষিণের বাতাস দূরে কোনখানে ধুলোর ধ্বজা উড়িয়ে চলে গেল তার ঠিক নেই, আকাশের রং মুছে গিয়ে নদীর বুকে এক টুকরো পাঙাস আলো উড়ে পড়লো, হঠাৎ সেই আলোর উপর দিয়ে আমি আমাকে ভেসে যেতে দেখেছি—

যাত্রীশূন্য একখানি শূন্য তরীর একা মাঝি!

ঘুমতী নদী বেয়ে ঘুরে ঘুরে নৌকো চলেছে, নদীতীরে কোথাও বাজছে— উৎসবের সানাই, কোথাও জ্বলছে মজ্‌লিসের বাতি আর কোথাও বা বাদশার কবর স্তব্ধ অন্ধকার জলে ফেলেছে আপনার ছায়া। এমনি করে ঘুমতীর বুক বেয়ে আমার ছায়া-মূর্ত্তিকে আমি দেখে এসেছি ভেসে বেড়াতে! ঘুমতীর জল আমার তরীকে ভিজিয়ে দিয়েছে— অত্যন্ত মধুর, অত্যন্ত শীতল স্পর্শে, আমি ঘুমতীকে, তার দুই কূলকে, তার আশে-পাশে যে-কেউ এবং যা-কিছু ছিল সবাইকে আপনার করে পেয়ে এসেছি, ঘুমতী নদীর বাতাস আজও আমার বুকের বাঁশিতে নতুন পুরোনো দুই সুরে বেজে চলেছে।

তোমারি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে লিখিত ১৬

বুধবার

ওগো সম্পাদক,

তোমার 'সাত ভাইয়ে'র পালাটা বেড়ে হয়েছে। দু-এক জায়গায় দু-একটা কথা বদল করে পাঠালুম। পালাটাতে গান দিয়ে ভর্তি করে দিতে চেষ্টা করো। আমার মাথায় একটা plot ঘুরছে— দেখো যদি এটা নাটকে ফেলতে পারো— "বড় রাজা— বড় বড় রাজ্য জয় করতে গেলেন, মস্ত হাতি ঘোড়া বড় বড় সেনাপতির সঙ্গে। ছোট রাজা গেলেন ছোট রাজত্ব জয় করে নিতে খেলার হাতি ঘোড়া নিয়ে। দিক্-বিজয়ের শেষে দুই রাজার দেখা— তর্ক উঠলো জয় কার বেশি— জয়লক্ষ্মী এসে ছোট রাজাকে মালা দিয়ে গেলেন।"

আমি এখন ছবি নিয়ে পড়েছি— লেখার দফা রফা— তাই তোমাকে plotটা উপহার দিলেম।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভগিনী বিনয়িনী দেবীকে লিখিত ১৭

শনিবার

প্রিয় বিনয়িনী,

আজ তোমার পত্র পাইলাম। আগ্রার শুভ্র স্বপ্ন আর হিমাচলের তুষারতরঙ্গ দুইই দেখিবার সামগ্রী। এক মানুষের সৃষ্টি অন্যটি ভগবানের খেলা— অতি অনির্ব্বচনীয়! ঘরে বসিয়া মনে করিতাম— বরফের পাহাড় বুঝি একখানা প্রকাণ্ড মেঘের মতো সাদা হইবে, কিন্তু এখন বুঝিতেছি কতই না তফাৎ— সে তীক্ষ্ণতা ও ধবলতা মেঘে সম্ভবে না। তোমার পত্র পড়িয়া বুঝিতেছি আগ্রার তুমি সকলি দেখিয়াছ কিন্তু ফতেপুর ও সেকেন্দ্রার কোন কথা লেখ নাই যে? আগ্রায় শাজাহান বাদশার সকলি পাইবে কিন্তু আকবর শাহের যা কিছু ওই দুই জায়গায় দেখিবে।

শেষেন্দ্র[১] যে কোনো কথাই বলে না। তার কি সেখানে ভাল লাগিতেছে না? বেচারা বড়ই একা পড়িয়াছে দেখিতেছি। তোমার ছেলেমেয়েরা বোধ হয় খুব আনন্দে আছে। কিন্তু তাজমহলের সৌন্দর্য্য বা মর্য্যাদা একটু অধিক বয়সে না দেখিলে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। যমুনার পরপারে শাজাহানের নিজের জন্য কালো পাথরে এক সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিতে দিলেন তাঁহার ইচ্ছা যমুনার উপর দিয়া এক সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দুই সমাধিমন্দির একত্র যোগ করিয়া দিবেন— সে জায়গাটা দেখিয়াছ কি? মীনাবাজারের যেখানে রাজপুত মহিষী আকবরশাহের বুকে ছুরি বসাইতে গিয়াছিল সে স্থান দেখিবার উপযুক্ত। নূরজাহানের পিতার সমাধি যাহাকে বলে ইত্মাতউদ্দৌলা, কেল্লার ভিতরে বেগম সাহেবের গোর এই সকল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দেখিতে ভুলিও না। আমি যদি সঙ্গে থাকিতাম তবে এ সকল স্থান নিশ্চয়ই খুঁজিয়া বাহির

১ বিনয়িনী দেবীর স্বামী শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়

করিতাম। মথুরা বৃন্দাবন আর মথুরা বৃন্দাবন নাই কিন্তু আগ্রা এখনও সেই আগ্রাই আছে। শেষেন্দ্রকে বলিও যদি পুরাতন ছবি সংগ্রহ করিতে পারে তবে যেন চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

বৃহস্পতিবার

প্রিয় বিনয়িনী,

কাশী থেকে তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। সারনাথ অতি আশ্চর্য্য জায়গা আমি সেবারে এলাহাবাদ থেকে গিয়ে দেখে এসেছি। জায়গাটা প্রথম দেখেই আমার খুব চেনা চেনা বোধ হয়েছিল, আমার মনে হল যে মন্দিরের কোণে কুয়োটার ধারে আমার দোকান ঘর ছিল সেখানে বসে আমি মাটির পুতুল আর পট বিক্রি করছি সহরের ছেলেমেয়েগুলো আমার দোকানের সামনে রংচং করা পুতুলগুলোর দিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে। মেয়েরা সামনের কুয়ো থেকে জল তুলছে গল্পগুজব করছে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে লোক উঠছে নামছে। এসব যেন অনেক দিনের স্বপ্নের মতো মনে পড়ে গেল। আরও আশ্চর্য্য যে অতগুলো ঘরবাড়ির মধ্যে আমার ঘরটি আমি দেখেই চিনতে পারলুম ৫ কি ৬ হাত চৌকো একটি ছোটো ঘর দরজার উপরে দুটি হাঁস পাথরের চৌকাটে লেখা আছে। তোমরা বোধহয় সে ঘরখানি দেখনি সেটা নেহাৎ ছোটো সামান্য দোকান ঘর কিনা, আমার মন কিন্তু আজও সেই ঘরখানিতে পড়ে আছে। সারনাথের যাদুঘরে যেসব মাটির ঘোড়া খুরি গেলাস কুঁজো দেখেছো সে সব আমার হাতে গড়া তার কোনো ভুল নেই। তখনকার পটগুলো কোথায় গেল কে জানে।

লোকে ঘরে ফিরলে মন যেমন হয় সারনাথে গিয়ে মন আমার ঠিক তেমনি হয়েছিল।

তোমাদের শুঃ
অবনদাদা

কন্যা শ্রীসুরূপা দেবীকে লিখিত

১৯

Tagore Studio.
5, Dwarakanath Tagore Lane,
Calcutta.
রবিবার ১৯৩১

কল্যাণীয়া সুরূপা,

তোর চিঠিতে সব খবর পেয়ে নিশ্চিন্তি হলেম। যতই লোভ দেখাও, এখন কলকাতা ছেড়ে কোথাও নড়ছিনে—বেশ লাগছে কলকাতা, আহা এমন স্থান কি আর আছে! কোথায় লাগে তোদের ঘাটশীলা—আহা, এই শহরের বাড়ি-ঘেরা দৃশ্য কি চমৎকার! সকালের একটু একটু কুয়াসার মধ্যে দিয়ে বাড়িগুলোর উপর দেখছি রোদ আর ছায়া পড়েছে, দেখাচ্ছে ঠিক যেন পর্ব্বতের গায়ে আলোছায়ার ঝরণা ঝরছে! মাঝে মাঝে একটা চিমনি ধূঁয়া ছাড়ে আর মনে হয় যেন বনের মধ্যে কারা চড়ুইভাতি

খেতে বসেছে— রান্নার গন্ধ পর্য্যন্ত নাকে আসে! তার উপর এখন আবার ছট্‌পূজো লেগেছে সিংঘীর বাগানে— সকাল থেকে রাত বারোটা একটা পর্য্যন্ত চমৎকার সুরে চারিদিকে মাদোল ঢাক ঢোলের সঙ্গে মেয়েরা ছেলেরা গান জুড়ে দিয়েছে, ওধারে কোথায় একটা নতুন বাড়ি হচ্ছে— মজুররা ছাত পিটছে তালে তালে দুপ দুপ, মনে হয় ঠিক যেন কাঠঠোক্‌রা ডাকছে কুব কুব। থেকে থেকে মোটরগাড়ি ভোঁ, সেও সুরে বেজে যাচ্ছে রার্মাশণ্ডে। একদল পায়রা ছাতে— নীল আকাশের গায়ে কালো দিয়ে লেখা— চুপ করে বসে থাকতে থাকতে অকারণে ঝাঁক বেঁধে উড়ে পড়লো, আবার একটা পথ হারিয়ে এসে বসলো আমাদের কার্ণিশে রোদ পোহাতে, কি সুন্দর! ঠিক যেন কাঁচপোকার সাড়ি পরে টুনুদিদি[১] বসে আছেন। বারান্দার উপরে রোদ পড়েছে এলিয়ে, একদল চড়াই তারি উপর চেঁচামেচি ডিগবাজি খেলা জুড়েই হঠাৎ পালালো, দেখি জলি কুকুব প্রবেশ করছেন পায়ে পায়ে। বাগানে লট্‌কান গাছে ফুল ধরেছে, তারি মধু খেতে একটা প্রজাপতি সকালে দুপুরে ঘুর ঘুর করছে। ফুলগুলো লাল জামাপরা টুনুদিদির খোকাটির মতো গুটিসুটি রোদে ঘুম যাচ্ছে। কাগডিমি আকাশে সন্ধ্যাবেলা ফানুস ওড়ে, মানুষ, কোনটা হাতি, কোনটা কিম্ভূত-কিমাকার গোলাকার! রাতে রেডিওতে দূর খবর আসে আর তার পর বাদশা[২] মশায় কাসেন, কাঁদেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন নিশ্চয়, কিন্তু সকালে সব ভুলে যান, বলতে পারেন না। ছোটুবাবু,[৩] টুনুদিদি ওরা ভালো তো? পনু[৪] তুমি আমাদের আশীর্বাদ নিও। ইটালীতে [Entally] যাবো একদিন। কোকো[৫] এখনো আসেনি চিঠি দিয়েছে ভালো আছে। আমরা সবাই ভালো আছি। ইতি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

বুধবার

[সাহজাদপুর। পাবনা]

খুকী,

এবারে এখানে বান ডেকে সব জলে ভর্ত্তি। ঘর দুয়ার গাছপালা ঘোড়া গরু সবাই হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে আছে। নৌকোয় কিন্তু ভারী আনন্দ— যাত্রী বহে ধানক্ষেতের উপর দিয়েই পাল তুলে পাখীর মত চলেছে— চমৎকার দৃশ্য। পনুবাবু[৪] আর তুই বেশ আসতে পারতিস। ভোরে বোটে চড়ে বেলা দশটার মধ্যে পৌঁছে গেছি। পথে মুষলধারে বৃষ্টি। চমৎকার শোভা দেখতে দেখতে চলে এলেম, এ যেন কবিতার রাজত্ব। সোনার বাংলার অপরূপ রং দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছে করে এইখেনে একটা নৌকোয় অনেক দূরে দূরে ঘুরে ফিরে খালি চলেই চলি ভেসে আর ভেসে। আজ চাঁদ উঠেছে সপ্তমীর— জলের উপর নৌকোয় ছেলের দল গান গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে— কী তাদের ফূর্ত্তি! আমার ভাঙা হাতে ছবিও হয় না বেশী লেখাও চলে না—

১। দৌহিত্রী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা, রেবা।

২। পৌত্র, শ্রীসুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। শ্রীপৃথ্বীনাথ মুখোপাধ্যায়,। শ্রীরেবা দেবীর স্বামী

৪। কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীপ্রণবনাথ মুখোপাধ্যায়

৫। পুত্র শ্রীতরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই মাত্র টাকার ঘড়া সিন্দুকে তুলে এসে এই চিঠি লিখছি। উৎসব[১] সাঙ্গ হলো, এবারে কিছু দিন কাজ আর একটু একটু বিশ্রাম। আসছে হপ্তায় বাড়ী যাবো। আমি বেশ আছি। কলিমুদ্দি মিয়ার[২] কারি কাটলেট্[২] আর গয়লাবাড়ির দুধ, মুদির সন্দেশ খুব চলছে।—ইতি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের কুড়িখানি চিঠি মুদ্রিত হইল। ইহার অধিকাংশ পূর্বপ্রকাশিত, কিন্তু অনেকগুলিই পাঠক সাধারণের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। ১ সংখ্যক পত্রখানি শ্রীবিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত। অন্য চিঠিগুলির পূর্বপ্রকাশ-নির্দেশ প্রভৃতি দেওয়া হইল: ২ ও ৩ সংখ্যক পত্র ১৩৩২ ফাল্গুন সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত। ৪ সংখ্যক পত্র ১৩৩৩ বৈশাখ সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে মুদ্রিত। ৫-১০ সংখ্যক পত্র ১৩৫৮ পৌষ অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতি-সংখ্যা উত্তরায় প্রকাশিত শ্রীঅসিতকুমার হালদারের 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিঠিপত্রে)' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। ১১ ও ১২ সংখ্যক পত্র ১৩৪৭ ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের 'অবনীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মুদ্রিত। ১৩ সংখ্যক পত্র ১৩৩১ আশ্বিন সংখ্যা বাঁশরী পত্রে ও ১৪ সংখ্যক পত্র তরুণ পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৫ সংখ্যক পত্র উত্তরার পূর্বোল্লিখিত সংখ্যা হইতে গৃহীত। ১৬ সংখ্যক পত্র শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর সৌজন্যে প্রাপ্ত; তিনি এই সময়ে শান্তিনিকেতন পত্রিকার সম্পাদক। ১৭ ও ১৮ সংখ্যক পত্র শ্রীমতী প্রতিমা দেবী লিখিত 'স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থ হইতে গৃহীত। ১৯ সংখ্যক পত্র, অবনীন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী উমা দেবীর 'বাবার কথা' পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ২০ সংখ্যক পত্র ১৩৬৪ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা সংযোগ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। ১৩ ১৪ ও ২০ সংখ্যক পত্রের প্রতিলিপি শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

---

১ জমিদারিতে পুণ্যাহ উৎসব

২ চিরকুমার সভায় অক্ষয়ের গান 'এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা', ও তৎপর দারুকেশ্বরের প্রশ্ন 'আজ রান্নাটা কী হয়েছে বলো দেখি। অক্ষয়বাবু, কারি না কাটলেট।' এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে পড়িবে।
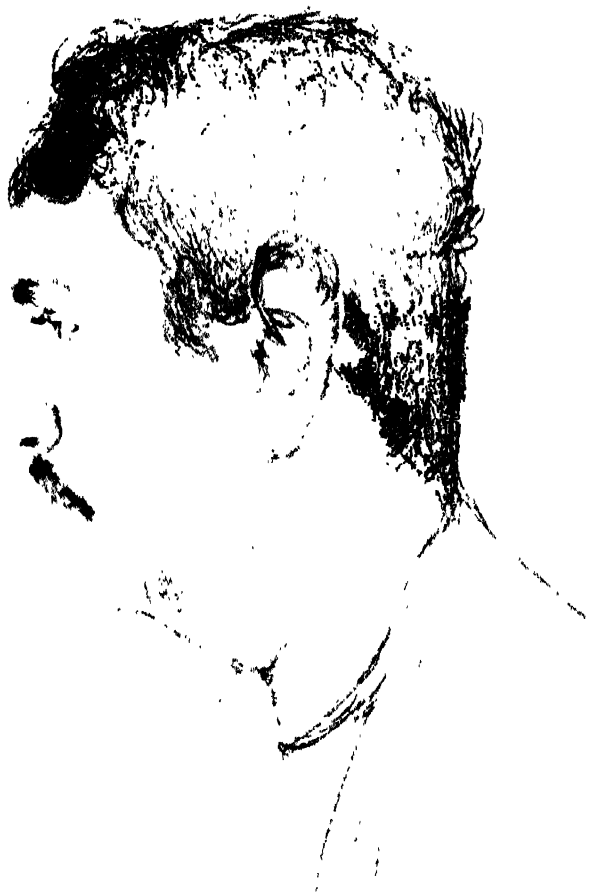
'অবন'
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত
১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ

বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

অশোকবিজয় রাহা

রূপলোকের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ বাণীলোকে নিয়ে এলেন এক আশ্চর্য রূপকথার জগৎ। এখানে প্রতিটি টুকরো-কথা রঙের আগুনে জ্ব'লে ওঠে, পংক্তিতে পংক্তিতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে রেখা, চমক দিয়ে ওঠে ছবি,— পাতায় পাতায় খুলে যায় রঙবেরঙের চিত্রশালা। অথচ এক হিসেবে তাঁর প্রতিটি ছবিই জীবন থেকে নেওয়া, যদিও তাঁর রূপকথাগুলি জীবনের বাঁধা নিয়মকে সব সময় মেনে চলে না : যেমন স্বপ্ন, যেমন কল্পনা ; এরা জীবনের বস্তুভারহীন সত্য।

তাঁর রূপকথার জগৎটি সত্যই বিস্ময়কর। এখানে প্রাণের একটি তাজা টাটকা ঘ্রাণ পাওয়া যায়। এ যেন শরতের সুন্দর সকাল— শিশিরে-আলোয় চারদিক ঝলমল করছে, উপরের আকাশ স্বচ্ছ নীল, কোথাও কুয়াশার লেশটুকু নেই। এখানকার মানুষগুলি আমাদের চোখের উপর পরিচিতের মতো ঘুরে বেড়ায় ; হাসে, খেলা করে, নাচে, গান গায়, বাঁশি বাজায় ; আবার হঠাৎ কখন এদের বুকে এসে লাগে কান্নার ঢেউ— চোখ ওঠে ছলছল ক'রে। এখানকার পশুপাখিগুলিও এখানকার গাছপালার মতো সজীব, সতেজ। এখানকার পুতুলগুলিরও যেন প্রাণ আছে, তাদের বুকে দুলছে ছোটো ছোটো সুখদুঃখের ধুকধুকি। এ এক জাদুর রাজত্ব, ইন্দ্রজালের দেশ ; এখানকার সব-কিছুই শিল্পীর খেয়ালি মনের সৃষ্টি ; টুকরো-কথার রঙ-চড়ানো টুকরো-দেখার 'কাটুম কুটুম' ; এদের বুকেই তিনি ছুঁইয়ে দিয়েছেন তাঁর মন্ত্র-পড়া জীয়ন-কাঠি।

বিশ্বসাহিত্যের বিশাল জগৎ থেকে হঠাৎ এদিকে চোখ ফেরালে এমনটি মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেননা অবনীন্দ্রনাথ আসলে রূপলোকেরই সাধক, বাণীলোকে এসেও তিনি মুখ্যত চিত্রশিল্পী। এই প্রসঙ্গে একটি পরিচিত দৃষ্টান্ত মনে আসে : রবীন্দ্রনাথের তুলির মুখে একদিন ঝাঁকে ঝাঁকে আশ্চর্যরকমের ছবি বেরিয়ে এসেছিল ; শেষ জীবনে হঠাৎ ছবি আঁকতে শুরু ক'রে সম্ভবত আড়াই হাজারেরও বেশি ছবি এঁকেছেন তিনি, কিন্তু তবু আমরা তাঁকে প্রধানত কবি বলেই জানি ; তিনি নিজেও বলেছেন, তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি কবি। এর ঠিক উল্টোরকমটি ঘটেছে অবনীন্দ্রনাথের বেলা। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি হয়েও বাণীর আবেগকে মুক্তি দিয়েছিলেন রেখায়, আর অবনীন্দ্রনাথ মূলত চিত্রশিল্পী হয়েও রূপসৃষ্টির আবেগকে ভাষা দিয়েছেন লেখায়। বাণীলোকে এসেও তাই ছবির জাদুকর হয়েই দেখা দিলেন তিনি।

কিন্তু তা হলেও একথা সত্য যে তাঁর রচনায় তাঁর স্বকীয় বাণীভঙ্গি একটি সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছে। তাঁর কণ্ঠে সব সময়ে একটি সাধা গলার আমেজ পাই আমরা অথচ আশ্চর্য এই যে এর জন্য কোনোদিন আলাদা ক'রে গলা সাধতে হয়নি তাঁকে। কী ক'রে এ সম্ভব হল সে এক রহস্য, তবে এটুকু বুঝতে পারি যে তাঁর মুখের ভাষাটি আসলে তাঁর ভিতরকার রূপসাধকের ভাষা, তাঁর কথা অনেকটা 'রঙরেখার'ই 'রূপকথা'। সাহিত্য রচনার শুরু থেকে তাই হয় তো রূপকথা-রীতিটিই বেছে নিয়েছিলেন তিনি। কথায় কথায় তারার মতো, ফুলের মতো ছবি ফোটানো যে-ভাষায় সবচেয়ে বেশি সম্ভব সে হল রূপকথার ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর মতো সচেতন বাণীশিল্পী তিনি কোনো কালেই ছিলেন না। তবু তাঁর প্রথম লেখাটিই ভাষার শিল্পরচনা হিসেবে সার্থক হয়ে উঠেছে। 'লিখে অভ্যাস করা' বলতে যা বোঝায় তা

এর আগে কোনোদিনই তাঁর হয়ে ওঠেনি। লেখার জন্য তাঁকে প্রথম উৎসাহিত করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, আর সেই প্রথম উৎসাহের মুখেই তিনি লিখে বসলেন 'শকুন্তলা'র মতো একটি আশ্চর্য সুন্দর বই,— যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি নিখুঁত। শুনতে যতই বিস্ময়কর হোক, এই হচ্ছে তাঁর সাহিত্যে হাতে খড়ির ইতিহাস। তিনি নিজের মুখেই বলছেন :

একদিন আমায় উনি [রবীন্দ্রনাথ] বললেন, 'তুমি লেখো-না, যেমন ক'রে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি ক'রেই লেখো।' আমি ভাবলুম···সে আমার দ্বারা কস্মিন্‌কালেও হবে না। উনি বললেন, 'তুমি লেখোই-না ; ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।' সেই কথাতেই মনে জোর পেলুম। একদিন সাহস ক'রে ব'সে গেলুম লিখতে। লিখলুম একঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো ক'রেই পড়লেন। শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল' ওই একটিমাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক্' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, যাঃ। সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখবার ক্ষমতা আছে। এত যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড়ো ফুর্তি হল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট লিখে যেতে লাগলুম— ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী ইত্যাদি।

—জোড়াসাঁকোর ধারে : পৃ ১২২-'২৩

এই তো সাহিত্যজগতে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব! 'শকুন্তলা'ই হচ্ছে রূপদক্ষের প্রথম বাণীসৃষ্টি,— '*যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা*'। এখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ; অবনীন্দ্রনাথের বাণীশিল্পের স্বরূপলক্ষণটি এতে আগে থেকেই সূত্রাকারে বলা হয়েছে। আমরা জানি, প্রিয়জনকে শুধু একটুখানি মৌখিক উৎসাহ দেবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখতে অনুরোধ করেন নি, তা হলে 'তুমি লেখো-না' পর্যন্তই বলতেন ; কিন্তু সেই সঙ্গে 'তুমি যেমন ক'রে মুখে গল্প কর' বলার অর্থ ই হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের 'মুখে গল্প করা'র বিশিষ্ট ধরনটির মধ্যে একটি শিল্পসম্মত মৌলিক বাণীভঙ্গি ফুটে উঠেছে, এবং তাকে ঠিক সেইভাবেই সাহিত্যে পরিবেশন করতে পারলে বাণীশিল্পের জগতেও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, সমস্ত বইটিতে তিনি একটিমাত্র কথা লিখেছিলেন 'সংস্কৃতে' অর্থাৎ তথাকথিত বিশুদ্ধ ভাষায়। তার মানে, এ ছাড়া অন্য সব জায়গায় তিনি আটপৌরে মুখের ভাষাই ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে অভয় পেয়ে প্রথমে বাধামুক্ত হয়েছে তাঁর মন, তারপর পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন নিজের স্বভাবের প্রেরণায়। নিজের শক্তি সম্বন্ধে যেই তাঁর আত্মবিশ্বাস এল অমনি হুহু ক'রে ছুটে চলল তাঁর কলম, লিখে চললেন বইয়ের পর বই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একেবারে শুরুতেই বাণীশিল্পে তাঁর এতখানি সিদ্ধিলাভ কী ক'রে সম্ভব হল? এর একটি প্রধান উত্তর এই যে, আসলে তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁর মধ্যে গোড়া থেকে এর জন্য একটি প্রস্তুতি চলছিল। তাঁর সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণায় এবং অসাধারণ শ্রুতি- ও স্মৃতি-শক্তির গুণে ভাষার একটি বিশেষ শিল্পভঙ্গি ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আয়ত্তে এসেছিল। ছেলেবেলাকার রূপকথা-শোনা কান তাঁর পরিণত বয়সেও কতখানি সূক্ষ্ম ও সজাগ ছিল, তাঁর শেষ লেখাগুলিতে পর্যন্ত তার পরিচয় পাওয়া যায়। রূপকথারও একটা স্থায়ী শিল্পরূপ আছে, সেটা লোকসংস্কার থেকে পাওয়া। অবনীন্দ্রনাথের বালক মন এর সহজ প্রাণছন্দটি স্বভাবতই ধরতে পেরেছিল। কিন্তু কেবল এতেই প্রশ্নটির সম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া যায় না। রূপকথার লোকসংস্কারজাত শিল্পরূপটিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করলেও অবনীন্দ্রনাথের রচনা যে শিল্পের প্রাকৃতস্তরের অশিক্ষিতপটুত্ব নয় তা আমরা তাঁর যে-কোনো একটি পংক্তির একটি ভগ্নাংশ থেকেই বুঝতে

পারি। তাঁর ভাষার ঐ আটপৌরে ঢঙের মধ্যেই আমরা এমন একটি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পসঙ্গতির পরিচয় পাই, যা মহৎ বাণীসাধকেরও সাধনা-সাপেক্ষ।

প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক, কেননা বাণীর সিদ্ধরসমূর্তি একেবারে প্রথমেই কারো কাছে আবির্ভূত হয় না, রবীন্দ্রনাথের মতো শ্রেষ্ঠ কবির কাছেও নয়,—তাঁকেও এর জন্য দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করতে হয়েছে। 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় তিনি তাঁর 'মানসী'র আগেকার যাবতীয় কবিতার শিল্পোৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে বলেছেন, 'লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি'। তাঁর আদর্শ অনুসারে 'মানসী'র কাল থেকেই তাঁর লেখা 'প্রবেশিকা অতিক্রম ক'রে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে'; আবার রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে 'মানসী' গ্রন্থের 'সূচনা'য় সব শেষে বলেছেন 'মানসী'তেই সর্বপ্রথম 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল'। অথচ 'মানসী'র রচনাকাল ১৮৮৭-১৮৯০। এখন, 'কবি'র সঙ্গে 'শিল্পী'র মিলন ঘটাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো বাণীশিল্পীরও যদি এত দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তা হলে অবনীন্দ্রনাথের রচনায় একেবারে প্রথমেই 'লেখকে'র সঙ্গে 'শিল্পী'র মিলন কী ক'রে ঘটতে পারল? রূপকথার ভাষার প্রাকৃত শিল্পভঙ্গিটি তাঁকে প্রথম থেকেই সাহায্য করলেও, সেই সঙ্গে বাণীর যে-সূক্ষ্মতর শিল্পসৌন্দর্য যুক্ত হলে রূপকথার ভাষা পরিস্কৃত হয়ে শকুন্তলার ভাষার পরিচ্ছন্ন রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে, তার জন্য তিনি ভাষাকে নিয়ে এর আগে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি। নির্বাচনের নৈপুণ্য, বিন্যাসের সংগতি ও প্রকাশের যাথার্থ্য— শিল্পরূপায়ণের এই তিনটি প্রধান গুণ তিনি এর আগে কীভাবে আয়ত্ত করেছিলেন? সর্বোপরি, সার্থক সৃষ্টিক্রিয়ায় পদে পদে যে-একটি সুনিয়ন্ত্রিত শিল্পসংযমের প্রয়োজন, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সাধনার মধ্যে দিয়েই তো তাকে বহু চেষ্টায় আয়ত্ত করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে আসে: 'শকুন্তলা'র রচনাকাল ১৮৯৫ সাল। এর আগে অবনীন্দ্রনাথ দীর্ঘ পাঁচ বছর ধ'রে যে-সাধনা করে এসেছেন তা একান্তভাবে চিত্রশিল্পের। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির অবনীন্দ্র-সংখ্যায়[১] অবনীন্দ্রনাথের এই সময়কার শিল্পসাধনা সম্বন্ধে যে তথ্য সন্নিবেশ করেছেন তার থেকে জানতে পাই, ১৮৯০ থেকে ১৮৯৫— এই সময়টি হচ্ছে তাঁর চিত্রসাধনার প্রথম পর্ব। এ-পর্বে তিনি পাশ্চাত্য চিত্ররীতির কলাকৌশলগুলি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন। ১৮৯০-১৮৯৩ হল এর প্রথম পর্যায়; দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৯৩-১৮৯৫। প্রথম পর্যায়ে Gilhardi র কাছে ছয় মাস চিত্রাঙ্কন শিক্ষার পর খসড়া ও নকশাচিত্র (sketch) আঁকবার উদ্দেশ্যে অবনীন্দ্রনাথ ছয় মাসের জন্য মুঙ্গেরে যান। সাধনার এই পর্যায়েই তিনি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র সচিত্র সংস্করণে অনেকগুলি রেখাচিত্র আঁকেন। 'চিত্রাঙ্গদা'র চিত্রসংখ্যা ৩২। তা ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রবীন্দ্রনাথের 'বিম্ববতী' ও 'বধূ' কবিতার জন্যও কয়েকটি ছবি আঁকেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষক Palmer-এর কাছে তিনি পাশ্চাত্য চিত্ররীতির অঙ্কনপদ্ধতি চূড়ান্তভাবে শেখেন। এ সময়ে তিনি অনেকগুলি কালি-কলমের ছবি (pen and ink), জল-রঙের ছবি (water colour), প্যাস্টেল-প্রতিকৃতি (pastel portrait) ও কয়েকখানি তৈলচিত্র (oil painting) এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, এবং দ্বারকানাথের তৈল-প্রতিকৃতির একটি অবিকল অনুলেখন (oil copy) তিনি এই পর্যায়েই এঁকেছিলেন; আর এঁকেছিলেন রবি বর্মার ধরনের কয়েকখানি ছবি: মায়ামৃগ শকুন্তলা ও সন্ধ্যা। তাঁর এই সময়কার ছবিতে ছায়াসুষমা (light and shade), বর্ণবিন্যাস (colour) ও স্পৃশ্যগুণ বা বুনন (texture)-এর উৎকর্ষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১ Vol VIII Parts I & II, May Oct, 1942, Pp 124 125.

এইভাবেই তিনি সাধনার প্রথম পর্বে চিত্ররূপায়ণের প্রাথমিক সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তারপর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৮৯৫ থেকে, তাঁর রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বিখ্যাত ধারাবাহিক 'চিকন-কাজে'র ছবিগুলিকে অবলম্বন ক'রে, আর ঠিক এই বছরেই লেখা হয় তাঁর প্রথম বই 'শকুন্তলা', যা প্রথম প্রচেষ্টাতেই লাভ করে বাণীর পূর্ণ সিদ্ধি। চিত্রের জন্য এতখানি কৃচ্ছ্রসাধনের পর অর্জিত সিদ্ধির কাছে এই সহজলব্ধ বাণীসিদ্ধি যেন সত্যই বিস্ময়কর ঠেকে। তবে যদি স্বীকার করা যায় যে রূপশিল্পের অনুশীলন করতে গিয়ে ভাবরূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি যে সৃষ্টিসাধনা করেছিলেন তাই তাঁকে এমন একটি গভীর শিল্পবোধ ও শিল্পচেতনা এনে দিয়েছিল যা বাণীশিল্পের সৃষ্টিতেও প্রথম থেকেই তাঁকে সাহায্য ক'রে এসেছে, তা হলে একরকম ক'রে এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাতে অন্তত এটুকু বুঝতে পারি যে রূপশিল্পের সাধনার মধ্যে দিয়েই হয়তো তাঁর প্রাকৃতসত্তা ধীরে ধীরে শিল্পীর সিদ্ধসত্তায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তাঁর সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টিই শিল্পের রসদৃষ্টি হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর মুখের আটপৌরে কথাগুলিও এই দৃষ্টির আভায় উজ্জ্বল ও চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছিল।

অবশ্যি এক শিল্পের সাধনার দ্বারা অন্য শিল্পে সিদ্ধিলাভ— এমনটি সচরাচর ঘটে না, তবে ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত আছে। এই প্রসঙ্গে চীনদেশের শিল্পিকবিদের (Painter-Poet) কথা প্রথমেই মনে আসে। চীনের বিখ্যাত শিল্পিকবি ওআঙ উই (Wang-Wei) ও সু তুং-পো'র (Su-Tung-p'o) কথা অনেকেই জানেন। বস্তুত সুঙ (Sung) যুগের শেষভাগ থেকে মিঙ (Ming) যুগ পর্যন্ত, এবং বিশেষ ক'রে চিঙ (Ching) যুগে— চীনদেশে বহু শিল্পিকবির আবির্ভাব হয়েছে। জাপানের শিল্পিকবিদের মধ্যে কোবো-দাইশি (Kōbō-daishi). কাজান ওআতানাবে (Kazan Watanabe) প্রমুখ কয়েকজন তো বিশেষভাবেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। য়ুরোপে স্বয়ং মাইকেল এঞ্জেলোও কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন; তবে ব্লেক এবং প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তদের মধ্যে রসেটির 'The Blessed Damozel' একই সঙ্গে শিল্পিকবির ছবি ও কবিতায়— রূপলোক ও বাণীলোকে— যুগ্মমঞ্জরীর মতো ফুটে উঠেছে।

কিন্তু দূর দেশে, দূর কালে গিয়ে লাভ কী? আরেক দিক দিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তো এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শেষ জীবনে তাঁর তুলির মুখে যেদিন হঠাৎ ছবির ঝড় উঠল সেদিন আমাদের বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। এই বিচিত্র 'আকার-ফোয়ারা'র উৎসমুখটি কোথায় লুকিয়ে ছিল এতকাল? কবে তিনি শিখলেন তুলি ধরতে? তাঁর ছবি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে শিল্পী যামিনী রায় চিত্র আর বাণীশিল্পের মধ্যেকার একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্রের কথা বলেছেন। কথাটি অন্যদিক থেকে অবনীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যামিনী রায় লিখেছেন:

> রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে ··ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প-ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রে পতন প্রায় অনিবার্যই হয়, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় তা হল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝবার উপায় নেই যে তিনি এদিকে নব আগন্তুকমাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়বার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে। রেখার কথা, রঙের কথা সবই তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কল্পনার শক্তিতেই: অনভিজ্ঞতার ত্রুটি খুঁজতে যাওয়া সেখানে বিড়ম্বনামাত্র।
>
> —রবীন্দ্রনাথের ছবি: কবিতা: আষাঢ়, ১৩৪৮: পৃ ৪১

এর থেকে কয়েকটি কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে: 'কল্পনার' 'ছন্দোময় শক্তি' এমন একটি নিয়ন্ত্রিত বেগ যা চিত্র ও বাণীশিল্পের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় সব সময় কাজ ক'রে যাচ্ছে, এবং সে-শক্তি 'অসামান্য' হলে এক

শিল্পের সাধক অন্য শিল্পের ক্ষেত্রে 'নব আগন্তুকমাত্র' হয়েও সেখানে নিজের অধিকার প্রসারিত করতে পারেন, এমন-কি সে-শিল্পের উপায়-উপকরণগুলিও 'সবই তিনি আয়ত্ত' করতে পারেন,— এবং সেখানে 'অনভিজ্ঞতার' লেশতম 'ত্রুটি'ও না-ঘটতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে লেখার ছন্দই যে রেখার ছন্দে রূপান্তরিত হয়েছে স্টেলা ক্রাম্‌রিশ-ও তা স্বীকার করেছেন :

The beautiful graphs are those of a poet whose vision is in the words; their strength is also in the lines. ১

এখন রবীন্দ্রনাথের মতো কবি— 'whose vision is in the words'— যে-শক্তির বলে চিত্রশিল্পীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের মতো রূপদক্ষও অন্যদিক থেকে তার অনুরূপ শক্তির বলে বাণীশিল্পীতে পরিণত হয়েছেন। এর একটা শিল্পভিত্তিক ব্যাখ্যাও সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যায়। শিল্পমাত্রেরই মূলে যে-শক্তি মুখ্যত ক্রিয়া করছে তা চিত্তের রূপায়ণীবৃত্তি। উপাদান যতই বিভিন্ন হোক, যেখানেই সত্যিকার শিল্পসৃষ্টি হয়েছে সেখানেই শিল্পীর চিত্তগত ভাবকল্পনা একটি রূপ বা বিগ্রহ ধারণ করেছে। উপাদানগত বস্তুপদার্থে আশ্রিত এমন-কি লগ্ন থেকেও বস্তুর স্থূলতাকে সে বহুদূরে ছাড়িয়ে যায়, এবং শিল্পীর চিৎ বা সম্বিতের তড়িৎস্পর্শে তার প্রাণধর্মী ঐক্যের মধ্যে দিয়ে একটি চৈতন্যময় প্রকাশ দ্যোতিত হয়। এই চেতনার দ্যুতি, এই 'transcendental glittering of the intelligible form' সকল শিল্পেরই প্রকাশব্যঞ্জনার শেষ কথা। যামিনী রায়ের ভাষায় 'কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে'ই হোক, আর Bell-এর ভাষায় 'vision of significant form'-এর জন্যই হোক, যে-কোনো উপাদানকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টির মধ্যে এই শিল্প-আত্মার প্রত্যক্ষ প্রকাশ হওয়া চাই। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'তে সকল শিল্পের এই মূল কথাটি বার বার বলেছেন। শিল্পের আলোচনায় 'সুর সার রূপ কথা' এই শব্দ কয়টি তিনি প্রায় সব সময়ই একসঙ্গে বলতেন।

এক হিসেবে রূপশিল্প আর বাণীশিল্পের মধ্যে একটি নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে। বাণীশিল্পের চরম উৎকর্ষ কবিতা। ছবির সঙ্গে কবিতার রূপায়ণগত কয়েকটি বিষয়ে পরোক্ষ মিল লক্ষ্য করা যায়। চিত্রশিল্পের ষড়ঙ্গবিচারে বলা হয়েছে :

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্‌।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্‌॥

ছবির মতো কবিতারও যে শিল্প হিসেবে ছয়টি অনুরূপ অঙ্গ আছে, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছবির অঙ্গ' প্রবন্ধে অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ থেকে একটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি। তবে প্রথমেই বলে রাখা ভালো, ছবির ষড়ঙ্গের শুরুতেই যে 'রূপভেদে'র কথা বলা হয়েছে সেটা সকল শিল্পের তো বটেই, সমস্ত জগৎ-বৈচিত্র্যেরই গোড়ার কথা। সৃষ্টি-উৎসের মুখেই এই রূপ-ভেদের উৎপত্তি। রবীন্দ্রনাথ এর কথা আগেই অন্যত্র বলেছেন, ও পরে লিখছেন :

ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা, তেমনি কবিতার স্থূল উপাদান হইল বাণী। · বাণীর চালে একটা ওজন একটা প্রমাণ আছে— তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য। এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে

১ "The Drawings of Rabindranath": Tagore Birth-Day Number, Visva-Bharati Quarterly: May-Oct., 1941, Page 119.

মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই; তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।…তারপরে, ছবিতে যেমন বর্ণিকাভঙ্গম্‌, কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা (suggestiveness)।…কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, অনির্দিষ্ট ভঙ্গির দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

ছবির অঙ্গ : পরিচয় : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮শ খণ্ড : পৃ ৫১৯-'২০

তা হলে দেখা যাচ্ছে, কবি তাঁর বাণীসৃষ্টিতে চিত্রশিল্পের রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ— এই ছয়টি অঙ্গকেই স্বতন্ত্র উপায়ে প্রকাশ ক'রে থাকেন, কেননা কাব্যের শিল্পকৌশলের মধ্যেও এরা অন্যভাবে জড়িয়ে আছে। অবশ্যি উপায় স্বতন্ত্র হলেও শব্দের নিপুণ নির্বাচন ও বাণীর সার্থক প্রয়োগকৌশলের দ্বারা কবিতার শিল্পদেহেও রূপশিল্পের অঙ্গগুলিকে পরোক্ষভাবে দ্যোতিত করা যায়, যদিও এদের একটিকে বাণীতে প্রতিফলিত করা সবচেয়ে কঠিন মনে হয়। বাণীশিল্পের পক্ষে শব্দরুচি, অলংকার-সুষমা, এবং বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের ভাবদ্যুতির সাহায্যে চিত্রের রূপভেদ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকা-ভঙ্গকে ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়তো ততটা শক্ত নয়, যতটা দুঃসাধ্য চিত্রের প্রমাণ অর্থাৎ পরিমাণসংগতিকে বাণীর পরিমাণসংগতির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনার কাছে এরা একেবারে জাত আলাদা— একটিকে দেখি চোখ দিয়ে, অন্যটিকে শুনি কান দিয়ে; কাজেই এদের পরিমাণচেতনা ভিন্নপ্রকৃতির বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা ছাড়া এদের মধ্যে আরো একটি বড়ো তফাত এই যে এদের একটিকে আমরা দেখছি স্থানের 'সহভাবে' (process of co-existence), অন্যটিকে শুনছি কালের 'অনুক্রমে' (process of succession)। স্থান ও কালের পরিমাণের মান বাহ্যত এক হতে পারে না। এই জন্যই, রেখার ছন্দে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করলেও একমাত্র সেই কারণেই ভাষার ছন্দকে আয়ত্তে আনা যাবে, এ-কথা জোর ক'রে বলা যায় না। এই দুটি ভিন্নজগতের ছন্দকে একমাত্র তিনিই মেলাতে পারেন যিনি দৃষ্টি ও শ্রুতির, স্থান ও কালের প্রকৃতিগত বাহ্য বৈষম্যকে তাঁর অন্তরের উপলব্ধিতে গভীরতর সামঞ্জস্যে এক ক'রে নিতে পেরেছেন। তিনি যে-কোনো একটি শিল্পের পথ ধ'রে এগিয়ে গিয়েও এই উভয়বিধ ছন্দের অন্তর্নিহিত সংগতিসুষমাকে আপনার ধ্যানের আলোকে প্রত্যক্ষ করেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রামের ঊর্ধ্বে চেতনার রম্যলোকে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রাণছন্দকে আলিঙ্গন ক'রে বলতে পারেন যে, ঐ একই ছন্দ ছবির জগতে স্থানবিধৃত রূপরেখার স্থিরতরঙ্গে ও বাণীর জগতে কালপ্রবাহিত ধ্বনিকম্পনের অস্থিরতরঙ্গে অনুক্ষণ স্পন্দিত হচ্ছে। এবং তিনি এও জানেন যে রেখার ঐ স্থিরতরঙ্গই যে-কোনো মুহূর্তে চেতনার বিদ্যুৎস্পর্শে চঞ্চল হয়ে ওঠে, আবার বাণীর অস্থিরতরঙ্গও প্রবহমান অবস্থাতেই অন্তরের স্তিমিত ধ্যানলোকে এক প্রশান্ত স্তব্ধতা বিস্তার করে। এই ঊর্ধ্বতর চৈতন্যলোকের অনুভবেই এই দুই স্বতন্ত্র জগতের মধ্যে একটি নিগূঢ় একাত্মতা স্থাপিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথের গভীর শিল্পচেতনায় এই অনুভবটি সব সময়ে ক্রিয়া করেছে। তাই ভাষার ছন্দের স্বতন্ত্র রীতিপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার ক'রে নিয়ে তিনি তারই মধ্যে দিয়ে রূপরেখার ছন্দের ধ্বনিময় প্রতিস্পন্দন জাগাতে পেরেছিলেন। গোড়ার দিকে আমরা তাঁর 'রূপকথা-শোনা কান' ও তাঁর সূক্ষ্ম শ্রুতিচেতনার কথা বলেছি। যাঁরা তাঁর এসরাজ শুনেছেন তাঁরাই জানেন শ্রুতিলোকের অতি ঊর্ধ্বস্তরেও তাঁর কী স্বচ্ছন্দ বিহার ছিল। তাঁর সুরভরা মনের স্বাভাবিক সংগীতপ্রিয়তার জন্য রূপকথার ভঙ্গি ও ছড়ার ছন্দের ভাষাগত সংস্কারটি ছেলেবেলা থেকেই তাঁর চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছিল। পরে রূপদক্ষের

গভীরতর শিল্পবোধ ও সূক্ষ্মতর ছন্দোবোধের দ্বারা পরিশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে এই লৌকিক শিল্প-সংস্কারটি তাঁর রচনায় এক অনবদ্য বাণীশিল্পের জন্ম দিয়েছে।

তাঁর সাহিত্য থেকে চিত্ররূপায়ণের দৃষ্টান্ত দিতে হলে তাঁর প্রায় সব লেখাই তুলে দিতে হয়, তাই আপাতত তাঁর একেবারে প্রথম রচনার গোড়ার দিক থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি। সাধারণ বাণী-প্রধান কবিতায় অথবা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে রূপশিল্পের ছয়টি অঙ্গের পরোক্ষ আভাস স্বভাবতই কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপন ক'রে থাকে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যসাধনার শুরু থেকেই তারা যেন একেবারে স্পষ্ট ও উচ্চারিত হয়ে উঠেছে। 'শকুন্তলা' বইয়ের প্রথম পাতাটিই খোলা যাক:

> এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল— ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল বড় স্থির— আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া— সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া।

— একেবারে ছবির ভাষা,— তুলির টানে আঁকা। প্রতিটি টান অব্যর্থ, প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। আর এমন টাটকা ছবি যে মনে হয় এখনো কালি শুকোয় নি।

এবার পাতা উল্টোতেই খুলল ১৪ পৃষ্ঠা:

> অমনি হাতীশালে হাতী সাজল, ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজল, কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্শা হাতে শিকারী এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল, জাল ঘাড়ে জেলে এল। তারপর সারথি রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, সিংহদ্বারে সোনার কপাট ঝন্‌ঝনা দিয়ে খুলে গেল।

একেই বলে চলন্ত ছবি। ভাগ্যিস্ 'সোনার কপাট ঝন্‌ঝনা দিয়ে খুলে গেল', নইলে মনে হত অবাক্ ছায়াচিত্র দেখছি।

একটা পাতা উলটোতেই চোখ পড়ল ১৭ পৃষ্ঠায়: এবার আর মানুষের ছবি নয়, একপাল জন্তুর ছবি:

> মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছিল, তাড়া পেয়ে— শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতী শুঁড় তুলে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে— শুঁড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল।

— এক-একবার মনে হয় বনের এই জন্তুগুলো তুলির ছবিতে কি এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট, বেশি জীবন্ত হত? এরা শুধু জীবন্ত নয়, জ্যান্ত— নড়ছে, উঠছে, ছুটছে, তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে,— প্রতি মুহূর্তে ভঙ্গির বদল হচ্ছে। এদিকে বাঘ 'হাঁকার' দিল বনে, তো সিংহ 'গর্জন ক'রে উঠল' পর্বতে, সঙ্গে সঙ্গে 'বন' 'কেঁপে উঠে' হয়ে গেল 'অরণ্য'।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই: শুধু একটুখানি আভাস দেওয়া। এ তবু তো 'শকুন্তলা' বই— সবে তাঁর হাতে খড়ি। এর পর যত দিন গেছে ততই তো হাত এসেছে, ছবি আরো উতরেছে, বৈচিত্র্য আরো বহুগুণ বেড়েছে। আমি যা বলতে যাচ্ছি তা এই যে, তাঁর চিত্রধর্মী লেখাগুলি এতই সার্থক যে মনে হয় শুধু ছবিই দেখছি, কথাগুলি ভালো ক'রে শোনবার আগেই ছবি হয়ে উঠছে। ছবির ছন্দ আর কথার ছন্দ একসঙ্গে মিলে-যাওয়াতেই যেন এই জাদুর খেলাটি আরো বেশি ক'রে জ'মে উঠেছে। রূপকথার ঢং আর ছড়ার ছন্দ— এই দুয়ে মিলে গোড়াতেই যে মণিকাঞ্চন-যোগ ঘটেছে, ওস্তাদ শিল্পী পরিণত বয়সে তাকে

আরো নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি মেশানো 'জোড়াসাঁকোর ধারে' থেকে এর দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একেবারে প্রথম পাতাটিই খুলছি :

আমরা বর্ষাকালে রথের সময়ে তালপাতার ভেঁপু কিনে বাজাতুম; আর টিনের রথে মাটির জগন্নাথ চাপিয়ে টানতুম, রথের চাকা শব্দ দিত ঝন্‌ঝন্‌; যেন সেতার নূপুর সব একসঙ্গে বাজছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ত দেখতে পেতুম, থেকে থেকে মেঘলা আলোকে রোদ পরাত চাঁপাই শাড়ি— কি বাহার খুলত!

এ হল দিনের বেলার ছবি। তার পর—

সন্ধ্যে হতে ঝড়জল আরম্ভ হল, সে কি জল, কি ঝড়! হাওয়ার ঠেলায় জোড়াসাঁকোর তেতালা বাড়ি যেন কাঁপছে, পাকা ছাত ফুটো হয়ে জল পড়ছে সব শোবার ঘরে। পিদিম জ্বালায় দাসীরা, নিবে নিবে যায় বাতাসের জোরে। বিছানাপত্তর গুটিয়ে নিয়ে দাসীরা আমাদের কোলে করে দোতলায় নাচঘরে এনে শোয়ালে। বাবা মা, পিসি পিসে, চাকর দাসী, ছেলেপুলে সব এক ঘরে। এক কোণে আমাকে নিয়ে আমার পদ্মদাসী কটর কটর কলাই-ভাজা চিবোচ্ছে, আমাকেও দুয়েকটা দিচ্ছে আর ঘুম পাড়াচ্ছে, চুপি চুপি ছড়া কাটছে— ঘুমতা ঘুমায়; গাল চাপড়াচ্ছে আমার, পা নাচাচ্ছে নিজের ছড়া কাটার তালে তালে।

— উনিশ শতকের কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দেখতে দেখতে নেমে আসে রূপকথার রাত, রূপকথার কঙ্কাবতী আর কাঞ্চনমালা-মধুমালারা চারদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়,— ছড়ার সুর গুন্‌ গুন্‌ করছে হাওয়ায়, চোখের পাতায় একটু একটু ক'রে ফুটে উঠছে স্বপ্নের মায়াপুরী। এই পদ্মদাসীর ছড়া-কাটার ছন্দ— এই 'ঘুমতা ঘুমায়' সুর— তন্দ্রার গুঞ্জনের মতো আমাদেরও কানে ভেসে আসছে।

অবনীন্দ্রনাথের স্বভাবের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছিল ব'লেই এই রূপকথা-শোনা শিশুর জগৎ, এই ছড়ার-সুরে-গাঁথা বর্ষাসন্ধ্যা তাঁর বালক মনের উপর সম্মোহের এমন একটি মায়াজাল বিস্তার করেছিল যা শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর মনকে স্বপ্নাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। তাই তাঁর প্রতিটি কথায় রূপকথার ভঙ্গি এত অনায়াসে এমন অবিকল ফুটে উঠেছে। অথচ এই লৌকিক ভঙ্গিটিকে আশ্রয় ক'রেই তাঁর ভাষা তাঁর অসামান্য শিল্পদৃষ্টির আলোকে এক নূতন আভায় মণ্ডিত হয়েছে। তেমনি তাঁর ছন্দও খুব সাধারণ উপাদান নিয়েই অসাধারণ। খাঁটি ছড়া রচনার দক্ষতায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার, তাঁর বিচিত্র ছড়ায় এর অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। ছড়ার খেয়ালি কল্পনাকে তিনি খোশখেয়ালি রূপকথার মধ্যে দিয়ে খামখেয়ালি উদ্ভট পালাগান পর্যন্ত চারিয়ে নিয়েছেন। ছড়ার লৌকিক ছন্দ গদ্যছন্দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাণীশিল্পের জগতে যে কী অলৌকিক খেলা খেলতে পারে তাঁর রূপকথা ও আত্মকথাগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এসব রচনায় খানিকটা গদ্যের ভাঁজ, খানিকটা ছড়ার,— সব মিলিয়ে এ এক অপূর্ব সৃষ্টি। অনেকগুলি কথাই ছড়ার মতো পর্বে পর্বে ভাগ করা যায়, প্রায় প্রতি পর্বেই চারটি ক'রে 'দল' (Syllable) থাকে, আর কথার চালও অনেকটা লৌকিক 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের বা 'দলমাত্রিকে'র। উপরের 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র উদ্ধৃতি থেকেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

১.	তালপাতার	ভেঁপু কিনে	বাজাতুম;
২.	রথের চাকা	শব্দ দিত	ঝন্‌ঝন্‌;
৩.	আকাশ ভেঙে	বৃষ্টি পড়ত	দেখতে পেতুম,
৪.	পাকা ছাত	ফুটো হয়ে	জল পড়ছে
	স—ব	শোবার ঘরে।	

৫. বাবা মা,	পিসি পিসে,	চাকর দাসী,
ছেলেপুলে,	স—ব	এক ঘরে।
৬. পদ্ম দাসী	কটর কটর	কলাই ভাজা
চিবোচ্ছে,		
৭. চুপি চুপি	ছড়া কাটছে	ঘুমন্তা ঘুমায়;

আর দরকার নেই। এতেই আমার বক্তব্য বিশদ হবে। এখানে সবসুদ্ধ ২৭টি পর্বের মধ্যে ১৭টিই চার 'দলে'র পর্ব। বাকি দশটির মধ্যে ২টি পর্বই হচ্ছে 'স—ব্', এদের পুরো পর্বের ওজন দিতে হলে অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘায়িত করতে হয়, নয় তো 'উনপর্ব' ব'লে ছেড়ে দিতে হয়। বাকি ৮টি পর্ব হল 'তালপাতার' 'বাজাতুম' 'ঝন্ ঝন্' 'পাকা ছাত' 'জল পড়ছে' 'বাবা মা' 'এক ঘরে' আর 'চিবোচ্ছে'। এদের মধ্যে এক 'ঝন্ ঝন্' পর্বটির 'দল'সংখ্যা ২, বাকি প্রত্যেকটির 'দল'সংখ্যা ৩। কিন্তু কান পাতলেই বোঝা যায়, এদের 'দল'সংখ্যায় যতই কম্‌তি থাক, এদের 'মাত্রা'সংখ্যা বা ওজন চার 'দলে'র পর্বগুলির সমান। স্বাভাবিক বাক্‌ভঙ্গি অনুসারেই আমরা এই কথাগুলির একটি-না-একটি স্বরধ্বনিকে একটু টেনে উচ্চারণ করি। আর ছড়ার বেলা তো কথাই নেই, স্বরধ্বনির প্রসারণ-সংকোচনের ব্যাপারে ছড়া অনেকটা নিরঙ্কুশ। তা হলে দেখতে পাচ্ছি, 'সব' কথাটিকে পুরো এক পর্বের ওজন না দিলেও উপরের ২৭টি পর্বের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ২৫টিকেই আমরা ছড়ার 'দলমাত্রিক' রীতির 'সমমাত্রিক' পর্ব বলতে পারি। অথচ অবনীন্দ্রনাথ তো কথাগুলি আগাগোড়া গদ্যেই বলে গিয়েছেন! গোটা বইটিই তো তাঁর মুখের কথার শ্রুতিলিখন!

এ তো গেল তাঁর আত্মকাহিনী থেকে নেওয়া অংশ, আর যেখানে তিনি খাঁটি রূপকথার আসর জমিয়েছেন সেখানে ছবির আলো আর ছন্দের কাঁপনে মিলে পংক্তিগুলি কেবলি ঝিলিক দিচ্ছে, প্রতিটি ছোটো ছোটো পর্ব তারার কণার মতো ঝিকমিক করছে। বেশি খোঁজাখুঁজি না ক'রে তাঁর প্রথম রূপকথার বই 'ক্ষীরের পুতুল'-ই খুলে দেখা যাক। পাতা উলটোতেই চোখ পড়ছে ৭৩ পৃষ্ঠায়:

বানর দেখলে—	ষষ্ঠীতলা	ছেলের রাজ্য,
সেখানে	কেবল ছেলে—	ঘরে ছেলে,
বাইরে ছেলে,	জলে স্থলে,	পথে ঘাটে,
গাছের ডালে,	সবুজ ঘাসে	যেদিকে দেখে
সেইদিকেই	ছেলের পাল	মেয়ের দল।

ভাবছি, ষষ্ঠীতলার চারদিকে ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভিড়ের ছবিটি কলমের এক আঁচড়ে যেভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে রঙ-রেখায় এর কতটুকু ফুটতে পারত? এখানে কথার ভঙ্গিটি রূপকথার, কিন্তু ছন্দটি আগের মতোই 'দলমাত্রিক'। সবসুদ্ধ ১৫টি পর্বের মধ্যে ১০টিতেই 'দল'সংখ্যা চার ক'রে পড়েছে; যে-পাঁচটিতে সংখ্যার গরমিল সেগুলি হচ্ছে 'সেখানে' 'যেদিকে দেখে' 'সেইদিকেই' 'ছেলের পাল' আর 'মেয়ের দল'। প্রথমটি 'উনপর্ব' ধ'রে নিলেই চলে, আর বাক্‌ছন্দ বাঁচিয়ে একটু টেনে পড়লেই 'শেষের তিনটিকে এক-একটি পুরো পর্বের ওজন স্বচ্ছন্দে দেওয়া যেতে পারে। বাকি থাকে 'যেদিকে দেখে' পর্বটি। এটাকে একটু দ্রুত লয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই, কেননা এখানে পর্বটি যেভাবে এসে বসেছে তাতে স্বাভাবিক বাক্‌ছন্দও তাকে গা মেলে বসতে দিচ্ছে না। তা ছাড়া শুধু এই পর্বটির মধ্যে ছবিরও এমন

কিছু ইঙ্গিত নেই যে একে রসিয়ে পড়ার প্রয়োজন আছে। ছড়ার পর্ব হিসেবে তো একে দ্রুত লয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। 'যেদিকে দেখে' আর 'খুকুমণিকে' এ দুটি কথার প্রত্যেকটির 'দল'সংখ্যা ৫, অথচ :

খুকুমণিকে। বিয়ে দেব। হাটমালার। দেশে

ছড়ায় স্বচ্ছন্দে চলে এবং চমৎকার মানিয়ে যায়।

অবশ্যি অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় ছড়ার ছন্দের এতটা আধিপত্যের একটা প্রধান কারণ এই যে তিনি মুখ্যত মুখের ভাষার ভঙ্গিটিকেই আশ্রয় করেছেন। আমাদের মুখের ভাষায় অনেক সময়েই এই লৌকিক ছন্দের আভাস আসে। যদি কেউ বলেন, 'সকালবেলা উঠেই দেখি আটটা' কিংবা 'আমার এখন একটি মিনিট সময় নেই'—তা হলে তিনি যে সাদা গদ্যে কথা বলছেন এতে কোনো সন্দেহ থাকে না, কিন্তু কথা দুটির বাক্‌ছন্দই এমন যে তারা আপনা থেকে দলমাত্রিক পর্বে ভাগ হয়ে যায়। বাক্‌ছন্দের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে হুবহু মিলে যায় ব'লে এই ছন্দটিকে বলতে পারি উভচর ছন্দ— পদ্যের ঢেউয়ে দোল খায়, আবার গদ্যের ডাঙায়ও চ'লে বেড়ায়। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পলাতকা'র কবিতাগুলির জন্য এই ছন্দটি বিশেষভাবে বেছে নিয়েছিলেন, কেননা বইটির লৌকিক কাহিনীগুলিকে খাঁটি কবিতার আওতায় রেখেই একেবারে লৌকিক ঢঙে বলতে চেয়েছিলেন তিনি। কবিতাগুলির অসমপংক্তির বিন্যাস তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে আরো খানিকটা সাহায্য করেছে।

এই লৌকিক ছন্দের বহুল ব্যবহার অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও এইটিই তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। এ-কথা ভুললে চলবে না যে আসলে তিনি রূপশিল্পী। ভাষায় ছবির পর ছবি ফোটাতে গিয়ে ছড়ার ছন্দ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সাহায্য পেতে থাকেন ততক্ষণ একে তিনি বিশেষভাবে আশ্রয় করেন, কিন্তু যখনই ছন্দের অতিরিক্ত দোলায় কথার সংগীতধর্মটি প্রধান হয়ে ওঠে এবং ছবির রঙ-রেখা সুরের তলায় চাপা পড়বার সম্ভাবনা ঘটে, তখনই তিনি যথাসময়ে অতি নিপুণভাবে তালের ঢেউ ভেঙে তাকে কথার মধ্যে চারিয়ে দেন। তাতে ঐ ঢেউ-ভাঙার জায়গাটিতে কিছুক্ষণের জন্য ছন্দটি এলোমেলো হয়ে যায় কিংবা হঠাৎ কখনো অন্য কোনো ছন্দের আভাস ফুটে ওঠে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র অংশ থেকে একটি বাক্য তুলে নিই :

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ত দেখতে পেতুম ;

—এই পর্যন্ত প্রতি পর্বে ৪টি ক'রে 'দল' ঠিকই আছে, কিন্তু তারপর ?—

থেকে থেকে মেঘলা আলোকে রোদ পরাত
চাঁপাই শাড়ি— কি বাহার খুলত !

—এখানে 'থেকে থেকে' আর 'রোদ পরাত' এই দুটি 'চতুর্দল' পর্বের মাঝখানে 'মেঘলা আলোকে' কথাটিতে 'দল' সংখ্যা ৫, অথচ উচ্চারণে অস্বাভাবিক বিকৃতি না-ঘটিয়ে একে সংকুচিত করা অসম্ভব। এতে প্রথম একটি 'দল' ছাড়া বাকি ৪টিই 'মুক্তদল', পর্বের স্বরধ্বনিগুলি যথাক্রমে এ আ আ ও এ—মাঝখানে দুটি 'আ' (বিবৃত স্বর) একেবারে পাশাপাশি, তা ছাড়া দুই প্রান্তে দুটি 'এ' (অর্ধবিবৃত স্বর) রয়েছে, ৫টি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে ৩টিই অর্ধব্যঞ্জন : একটি 'ম' (অনুনাসিক) আর দুটি 'ল' (পার্শ্বিক)—এরা ব্যঞ্জনধ্বনির কোমল-তরল সুর ;—কাজেই ধ্বনিতত্ত্বের দিক বিচার করে দেখলে পর্বটিকে সঙ্কুচিত করবার অসুবিধে আছে। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো বাধা আসছে কথাটির বাণীরূপ আর চিত্রব্যঞ্জনার দিক থেকে। মাঝখানের দুটি 'আ' ধ্বনির 'সন্ধি'

করতে পারলে বৈয়াকরণ হয়তো খুশি হন, কিন্তু 'সরস্বতী যে তা হলে তাঁর বীণাখানা' আমাদের 'মাথার উপর আছড়ে ভেঙে ফেলবেন।' দ্রুত উচ্চারণের অসংগতি এখানে সইবে কেন? 'মেঘলা আলোকে'র কোমল আভাটুকু ভাষার তুলিতে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই তো শিল্পী তাঁর কথায় বর্ণধ্বনিগুলিকে এমন নিপুণ কৌশলে আলগোছে সাজিয়েছেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে পর্বটিকে তার ছবির ইশারাটুকুর মধ্যে মনে মনে ছড়িয়ে রাখা, আর সমস্ত কথাটির ভাবের মধ্যে আলতোভাবে চারিয়ে দেওয়া। ঠিক এমনি ক'রেই বলব, বাক্যটির শেষাংশের 'কি বাহার খুলত' কথাটিকেও বেঁধে রাখার চেয়ে ছেড়ে রাখাই ভালো। 'রোদ পরাত' 'চাঁপাই শাড়ি'—এই দুটি 'চতুর্দল' পর্বের পরে একটু ফাঁক রেখে তারপর কথাটিকে বসানো হয়েছে,—শিল্পী নিজেই তাকে খানিকটা সরিয়ে এবং ছড়িয়ে রেখেছেন। এখানে 'কি বাহার' কথার শব্দ দুটিকে একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে কবিতায় হয়তো সহজেই ছন্দ বাঁচানো যায় কিন্তু বাক্-ভঙ্গির দিক থেকে, এবং বিশেষ ক'রে কথাটির ভাবব্যঞ্জনার দিক থেকে বিচার করলে এখানে তা না করাই সঙ্গত, কারণ শব্দ দুটি জুড়ে নিলে কথার আসল বাহারটিই মাটি হবে। এই 'বাহার' শব্দকে আশ্রয় করেই কথাটি এখানে কলাপ বিস্তার করেছে,—চাঁপাই শাড়ির রূপের শোভা ভাঁজে ভাঁজে খুলে দিয়েছে। ময়ূরের পেখমটি মেলে-ধরার জিনিস, তাকে গুটিয়ে নিলে ঝাঁটার মতো পিছনে প'ড়ে থাকে।

তবে, রূপসৃষ্টির প্রেরণা মুখ্য হলেও, ছন্দের ঢেউ ভেঙে-দেবার ব্যাপারে তাঁর শিল্পিমনে আরো একটি চেতনা কাজ করেছে: অতিরিক্ত নিরূপিতমাত্রার তাল দীর্ঘকাল চলতে থাকলে রচনা পদ্যের চেহারা ধরে, গদ্যের রূপ একেবারেই থাকে না, কাজেই এই কারণেও একটানা ছন্দের মাঝখানে ছেদ আনতে হয়। তখন পাঁচমিশেলি ছন্দের বিচিত্র সমাবেশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ হল গদ্যের রীতি বাঁচিয়ে চলার কথা। আবার এবড়োখেবড়ো দৃশ্যের রচনায় কিংবা একসঙ্গে উত্থিত অনেকগুলি ধ্বনিঝংকারের বর্ণনায় ছন্দকে খানিকটা এলোমেলো করে দিতে হয়। শেষোক্তটির একটি ছোটো দৃষ্টান্ত দিই। উপরে উদ্ধৃত বাক্যটির ঠিক আগেই আছে:

রথের চাকা	শব্দ দিত	ঝন্ ঝন্;
যেন	সেতার নূপুর	স—ব
একসঙ্গে	বাজছে।	

এখানে 'যেন সেতার নূপুর সব একসঙ্গে বাজছে'—এই শব্দগুচ্ছের তাল ও বাণীসংগীত কান পেতে শুনলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ হবে। উপরের পর্ববিভাগ অনুসারে পড়লেও পর্বগুলির 'দল'সংখ্যার অসমতা কেবলি অসুবিধে ঘটায়: ২, ৪, ১, ৩, ২—এই 'দল'সংখ্যাগুলির পক্ষে এই অনুক্রমে কাঁধ-মেলানো সত্যি কঠিন। তা ছাড়া সাধারণ বাক্‌ছন্দে 'যেন' শব্দটাকে টেনে বাড়াবার তো উপায়ই নেই। 'সব' কথাটাকে খানিকদূর পর্যন্ত টানা যায়, কিন্তু তবু একে পুরো এক পর্বের ওজন দিতে পারি নে। অবশ্যি এর স্বরধ্বনিকে সংকুচিত ক'রে 'সেতার নূপুরে'র সঙ্গে জুড়ে দিলে বাক্‌ছন্দের দিক থেকে হয় তো তেমন বেমানান হয় না, কিন্তু ছড়ার 'দলমাত্রিকে'র তাল তাতেও কাটবে। আবার 'এক সঙ্গে' কথাটির আগের দিকে একে জুড়তে গেলে প্রমাদ ঘটবে: 'সব একসঙ্গে' দ্রুত উচ্চারণ করলে হয়ে যাবে 'সবেক সঙ্গে', বাক্‌ভঙ্গিতে এই বাণীবিকৃতি অসহ্য। কাজেই এই বাক্যাংশে ছন্দের ঢেউ কিছুটা ভাঙবেই, আর লেখকও এখানে ইচ্ছে ক'রেই তাল কেটেছেন, টিনের রথের চাকার মিশ্রিত ঝন্ ঝন্ শব্দ ভাষায় শোনাতে গিয়েই তো 'সেতার নূপুর সব'

আমদানি হল, ছন্দেও আসুক খানিকটা বিশৃঙ্খলা— তাতেই এখানকার ঠিক তালটি লাগবে, ঠিক সংগতটি জমে উঠবে।

প্রশ্ন হতে পারে, ছবির খাতিরেই হোক আর গদ্যভঙ্গির খাতিরেই হোক, নিরূপিত ছন্দের ঠাটটি মাঝে মাঝে যখন ভাঙতেই হয়, তখন অবনীন্দ্রনাথ ধীর লয়ের প্রচলিত গদ্যরীতিকে আশ্রয় করলেই পারতেন। তুলির ছবিও যখন রঙ-তুলি নিয়ে ব'সে ধীরেসুস্থেই আঁকা যায় তখন আর কথা কী? এর একটি উত্তর হল, গদ্য মূলত চিন্তার ভাষা। গদ্যের অনিরূপিত ছন্দে চিন্তার বিসর্পিল ধারা মন্থর গতিতে একটু-একটু ক'রে এগিয়ে চলে। এ-রকম অনিয়ন্ত্রিত ছন্দে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাদর্শের উপযোগী পরিমাণ-সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় উত্তর হল, রঙ-তুলির ছবি আঁকতে প্রচুর সময় ব্যয় হলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের চোখের উপর একসঙ্গে ভেসে ওঠে তার সমস্তটা, আমরা তাকে এককালেই দেখতে পাই স্থানের ব্যাপ্তিতে। এখন, কালপ্রবাহিত ভাষাকে একান্তভাবে চিত্ররূপময় ক'রে তুলতে হলে— অর্থাৎ তার প্রতিটি ছোটো ছোটো অংশে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে এক-একটি সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরতে হলে—তার অন্তর্নিহিত কালের অনুক্রমের মধ্যে স্থানের সহভাবের আভাস আনতে হবে। প্রচলিত প্রবহমান গদ্যের অনিয়ন্ত্রিত ছন্দে বাণীর বিলম্বিত প্রকাশ ঘটে বলেই তাতে কাল কেবলই দীর্ঘায়িত হতে থাকে। কাজেই ভাষার এই রীতিতে অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার ভিড়-করে-আসা ছবিগুলি অবিকল সেইভাবে ধরে রাখা অসম্ভব। ছবিগুলি হয় অস্বাভাবিকরূপে প্রলম্বিত হয়ে পরিমাণ-সঙ্গতি হারাবে, নয় তো গদ্যের দীর্ঘ প্রবহমান ধারার একটানা স্রোতে ধুয়ে-ধুয়ে গ'লে-গ'লে যাবে এবং আকারসীমা হারিয়ে অস্পষ্ট হতে থাকবে। এইজন্যই অবনীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন অতিনিরূপিত পদ্যছন্দকেও সব সময় হুবহু গ্রহণ করতে চাইলেন না, অন্যদিকে তেমনি গতিমন্থর গদ্যধারার একেবারে অনিরূপিত ছন্দকেও যথাসম্ভব পরিহার করলেন। ফলে আমরা পেলাম তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় রচিত সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এক শিল্পময় গদ্যরীতি। এ গদ্য মূলত চিত্রাত্মক, তবে এর ছন্দ মোটামুটি একটি নিয়ন্ত্রিত ঠাটে বাঁধা থাকতে চায় ব'লে, এর রীতিটিকে বলতে পারি 'গীতিচিত্ররীতি'। এর ছন্দ কতকাংশে ছড়ার মতো হলেও এ ছড়া নয়, এর ছাঁদ রূপকথার হলেও এ যত-না 'রূপকথা' তার চেয়ে ঢের বেশি 'রূপের কথা'। এর ছন্দ 'অনিরূপিত'ও নয় আবার 'অতিনিরূপিত'ও নয়, একে বলতে পারি 'অনতিনিরূপিত'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে গদ্যকবিতায় যে ছন্দটি ব্যবহার করেছেন, অবনীন্দ্রনাথ তার অনুরূপ একটি ছন্দ তাঁর গদ্যের ক্ষেত্রে যেন আগে থেকেই তাঁর নিজের ভঙ্গিতে প্রয়োগ করেছেন। তা হলেও দুজনের ছন্দে তফাৎ আছে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ রীতিমতো কবিতার কোঠায় এসে পড়েছে, আর অবনীন্দ্রনাথের ছন্দ ভাষার গীতিচিত্ররীতিকে আশ্রয় ক'রে গদ্যেরই এক নূতন ভঙ্গি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগেই বলেছি, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে লৌকিক 'দলমাত্রিক' ছন্দের বহুল প্রয়োগ ঘটলেও তাকে কোনো জায়গায় বেশিক্ষণ একটানা ব্যবহার করা হয় নি। ছন্দের ঢেউ কী ক'রে ভেঙে দেওয়া হয় তারও দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এই উদ্দেশ্যে কখনো কখনো লৌকিক ছন্দের আওতার মধ্যেই পর্বের 'দল'গুলির বিশেষ এক ধরনের বিন্যাসে, কথার ঝোঁক পালটে দিয়ে নূতন নূতন রূপকল্পের (pattern) সৃষ্টি করা হয়েছে:

১. মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে (২।৩, ২।৩);
২. পায়ে আলতা দিলে, নতুন বাকল দিলে; (২।৪, ২।৪);

৩. হাতে	মৃণালের বালা,	গলায়	কেশরের মালা,	(২।৫, ২।৫) ;
৪. হীরের বালা	কোথায়,	মতির মালা	কোথায়,	(৪।২, ৪।২) ;
৫. কেউ	জালে ধরা পড়ল,	কেউ	ফাঁদে বাঁধা পড়ল,	(১।৬, ১।৬) ;

এরকম হাজার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এখানে তো শুধু 'শকুন্তলা'র ৩৩ পৃষ্ঠার একটি অনুচ্ছেদ থেকেই বলতে গেলে প্রায় সবগুলি দৃষ্টান্ত মুঠো ক'রে এনেছি, কেবল শেষ দৃষ্টান্তটি এনেছি ১৮ পৃষ্ঠা থেকে।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক লাগে যখন দেখি নানা ছাঁদের 'অসমদল' পর্বের বিন্যাসে ছন্দকে এবড়োখেবড়ো ক'রে দিয়েও সব মিলিয়ে মোটামুটি একটা পরিমাণসংগতি রাখা হচ্ছে। এমনটি ঘটাতে হলে যে নূতন ধরনের ঘটকালি আর জোটক-মিলের প্রয়োজন, গভীরতর ছন্দোবোধ না থাকলে তা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। তাঁর যে-কোনো বইয়ের যে-কোনো পাতায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। 'বুড়ো আংলা' খুলতেই ৬০ পৃষ্ঠায় চোখ পড়ল :

কানা কুকুরটা	ঘেউ ঘেউ ক'রে	থামলে
হাঁসেরা	হাসতে হাসতে	বললে—
আরে মুখ্যু,	আমরা কি তোর	রাজার কথা,
না রাজবাড়ির কথা,	না মাটির কেল্লার কথা	শুনেছি ?

প্রথমে মনে হবে ছন্দটা একেবারেই এলোমেলো, কিন্তু খেয়াল ক'রে কান পেতে শুনলে বুঝতে পারি এখানে গদ্যের অসমতল ভূমিতে শিল্পীর প্রতি পদক্ষেপ সংযত, প্রতিটি বাক্যাংশ শব্দের ধ্বনিসঙ্গতির গভীরতর সূত্রে বিধৃত। কুকুরের ডাক শুনলে কানে একটা ধাক্কা লাগে, কুকুরটা কানা হলে চোখেও ধাক্কা লাগে। তাই এখানে 'কানা কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ ক'রে'— এই বাক্যাংশের বর্ণমালাতে চারটা 'ক' হুঁচট খেয়ে দুটো 'ঘ'-এর ঘাড়ে ধাক্কা মারছে, আর 'টা' শব্দটা মাঝখানে একটা কর্কশ কেঠো আওয়াজ ক'রে উঠেছে। কিন্তু শিল্পীর জাদুতে এর ঠিক পরের কথাটিতেই হাওয়া একেবারে পালটে গেল,—এবার কানা কুকুর নয়, হাঁস। 'হাঁসেরা হাসতে হাসতে'ই তো কথা বলবে, তারা তো হালকা হাসিই হাসে, তারা যে পাখি, তাদের পাখা হাওয়ায় ওড়ে। এখানে 'হাস্'-ধ্বনিটি পর পর তিনবারই শোনা যাচ্ছে, শব্দগুলির মধ্যে যেন হাওয়া শিস দিচ্ছে। এর পর 'হাঁসেরা' যা 'বললে' সে তো কৌতুকের কথাই হবে। কথার ছন্দে-সুরে একটি চাপা-হাসির কৌতুক ফুটে বেরুচ্ছে। বাক্‌ছন্দের দিক থেকে বিচার করলে এখানে 'থামলে' আর 'বললে' যেন তবলার দুটি অনিবার্য 'ঠেকা', আর সব শেষে তিনটি 'মুক্তদলে'র প্রশ্নাত্মক 'শুনেছি ?' কথাটিতে একদিকে যেমন উত্তরের প্রত্যাশাজনিত অসমাপ্তির আভাস আনা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তব্‌লার চাটি বলছে, 'এই তো সম।'

নানা মাপের নানা ধাঁচের হ্রস্ব-দীর্ঘ পর্ববিন্যাসে কত বিচিত্রভাবেই যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যে তাল ভেঙে তাল রেখেছেন, আবার তাল রেখে তাল ভেঙেছেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। যে-কোনো বই থেকে খানিকটা অংশ পড়লেই পর্বের অন্তত দশ রকমের নূতন ধরণের বিন্যাস চোখে পড়ে। 'ভূতপত্‌রীর দেশে'র একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখছি :

হুম্পা হুমা	পাল্‌কি চলেছে	বনগাঁ পেরিয়ে ;
ধপড় ধাঁই	পাল্‌কি চলেছে	বনের ধার দিয়ে,
মাসির ঘর ছাড়িয়ে,	ভূতপত্‌রীর মাঠ পেরিয়ে।	

এখানে 'বন্‌গাঁ পেরিয়ে' 'বনের ধার দিয়ে', 'মাসির ঘর ছাড়িয়ে', 'ভূতপত্‌রীর মাঠ পেরিয়ে',— এই বাক্‌পর্বগুলি লক্ষ্য না ক'রে উপায় নেই। শেষের তিনটি তো বাক্‌ভঙ্গির দিক থেকে যথাক্রমে দীর্ঘ, দীর্ঘতর, দীর্ঘতম। কিন্তু উপায় কী? 'হুম্পাহুমা'র সঙ্গে 'বন্‌গাঁ পেরিয়ে' যেই কাঁধ মেলাল, অম্‌নি 'বনের ধার দিয়ে' কথাটিও সেই সঙ্গে এসে কী ক'রে চমৎকার মিলে গেল। 'বনের ধার দিয়ে'-কে মেনে নিলে 'মাসির ঘর ছাড়িয়ে'-কেও মানতে হয়, আর তা হলে 'ভূতপত্‌রীর মাঠ পেরিয়ে'ই বা বাকি থাকে কেন? একেই বলে অজগর গেলা, অথচ কী সহজে লেখক আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে এলেন! আমরা জানতেই পারলাম না কখন 'হুম্পাহুমা'র মতো ছোটো একটি পর্ব থেকে এত দীর্ঘ একটি পর্বে এসে পৌছলাম। শেষের পর্ব তিনটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা একটির পর একটি কেবলি বেড়ে চলেছে, টেনে টেনে কেবলি দীর্ঘ হচ্ছে,— এ ছন্দটাকে বলতে পারি 'টেনে-চলা ছন্দ'। এখানে এরকম ছন্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলে তিনি হয় তো বলতেন, 'তা হতেই তো হবে,— কত বড়ো মাঠ, কত দূরের পথ!' এর উপরে আর কথা নেই।

এবার আমরা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের নূতন একটি রীতির উল্লেখ করছি। এতে ছড়ার ছন্দের পৌনঃপুনিকতা কিংবা অসম ছন্দের সংঘাত-সমন্বয়ের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। একে বলতে পারি 'দোলনার ছন্দ',— ঝোঁকের এক ঠেলায় একদিকে যতটা এগিয়ে যায়, ফিরতি টানে আরেক দিকে কমবেশি প্রায় ততটাই ফিরে আসে। দোলনায় দোল খাবার সময় সব ঝোঁকের ওজন এক হয় না, কখনো বেশি কখনো কম। ঠেলার বেগ যখন বেশি তখন সামনে-পিছে দুদিকেই দোলনের দূরত্ব যায় বেড়ে, আর বেগ যখন মৃদু তখন দোলনের দূরত্বও আসে ক'মে। ঠিক এমনি একটি ঘটনা ঘটতে থাকে অবনীন্দ্রনাথের এই ধরনের গদ্যছন্দে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এর স্বরূপলক্ষণটি বোঝা যাবে। ধরা যাক 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র একেবারে মুখবন্ধের প্রথম কথাটি :

যত সুখের স্মৃতি	তত দুঃখের স্মৃতি
আমার মনের	এই দুই তারে
ঘা দিয়ে দিয়ে	এই সব কথা
আমার শ্রুতিধরী	শ্রীমতী রানীচন্দ
এই লেখায়	ধ'রে নিয়েছেন,
সুতরাং	এর জন্যে
যা কিছু পাওনা	তাঁরই প্রাপ্য।

ঠিক দোলনার দোলনের আভাস আসছে। দুদিকে প্রায় সমান ঝোঁক, তাই পর্বগুলির ভাষা-পরিমাণও যেন ডাইনে-বাঁয়ে জোড়ে-জোড়ে মিল, প্রত্যেক জোড়ায় একটি পর্বের ওজন বাড়লে অন্যটিরও বাড়ছে, একটির কমলে অন্যটিরও কমছে।

এক ধরনের ছড়াতেও এই দোলনার চালটি কিছু-কিছু লক্ষ্য করা যায়। এদের জোড়া-পর্বগুলির 'দল'সংখ্যা অনেক সময়েই অসমান, তবু এরা 'মাত্রাসমকত্বে'র আভাস আনে স্বরধ্বনির ওজন বাড়িয়ে-কমিয়ে। কখনো কখনো এদের হ্রস্ব পর্বগুলির 'মুক্তদলে'র বিস্ময়করভাবে মাত্রাবৃদ্ধি ঘটে :

আমার কথাটি	ফুর—ল
নটে গাছটি	মুড়—ল

কেন রে নটে মুড়্—লি
গোরুতে কেন খা—য়

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের দোলনার ছন্দটি ঠিক এই জিনিস নয়। এখানে বাঁ দিকের পর্বগুলিকে দ্রুতভাবে ও ডানদিকের পর্বগুলিকে অত্যন্ত বিলম্বিতভাবে উচ্চারণ করে দুদিকের মাত্রাসমতা আনা হয়েছে, এবং মোটামুটি ছড়ার ছন্দের আদলটিই বজায় রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ডাইনে-বাঁয়ে উপরে-নীচে সব পর্বেরই ওজন মোটামুটি সমান ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের লেখা থেকে উদ্ধৃত উপরের বাক্যটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তাতে সব পর্বের মাত্রা সমান রাখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, শুধু ডাইনে-বাঁয়ে ঝোঁকের মোটামুটি মিল থাকলেই হল, উপরে-নীচে নয়। অবশ্যি এই 'দোলনার ছন্দে'র সঙ্গে ছড়ার ছন্দকে মিশিয়ে নিয়েও নানারকম বৈচিত্র্য এনেছেন অবনীন্দ্রনাথ। এর একটি দৃষ্টান্ত তো 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই আছে :

গাল চাপড়াচ্ছে আমার পা নাচাচ্ছে নিজের
ছড়া কাটার তালে তালে।

এতে দোলনার দোলও আছে, ছড়ার আদলও আছে। কিংবা 'শকুন্তলা'র ১৮ পৃষ্ঠা খুলতেই চোখে পড়ছে :

কেউ জালে ধরা পড়ল কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল
কেউ বা তলোয়ারে কাটা পড়ল।

এখানেও প্রথম দুটি পর্বে 'দোলনার ছন্দে'র আভাস এসেছে, কিন্তু তারপর 'কেউ বা' কথাটিতে দোলন থেমে গিয়ে শেষ দুটি পর্বে ছড়ার তাল এসে পড়েছে। আবার তাঁর গদ্যছন্দে লেখা 'পাহাড়িয়া' কবিতার প্রথমেই একটু অন্য ধরনের মিশ্রছন্দের একটি দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে :

জেগে-ওঠার কিনারায় কিনারায় সুরের পাড় বোনে
পাখি,—

এখানে শেষ কথাটিতে দোলনার দোলন একেবারে থেমে গেল। তারপর :

একটি পাখি, না-দেখা পাখি, কানে-শোনা পাখি!

এ একেবারে 'টেনে-চলা ছন্দ' : প্রথম ঝোঁকে একটু টান, তারপরে আরেকটু বেশি, তারপরে সবচেয়ে বেশি। এই টানা সুরটুকু দীর্ঘ হতে-হতে চলেছে, এতে শুধু-যে না-দেখা পাখিটির একটানা সুরের আভাস ফুটে উঠেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে একটা দূরত্বের আভাস আসছে,— পাখিটি হয়তো কাছেই কোথাও ডাকছে, তবু তাকে দেখা যাচ্ছে না— সে 'মনের মধ্যে অনেক দূর।'

লৌকিক ছন্দের 'দলমাত্রিক' পর্বকে বাক্‌পর্বের সঙ্গে মিলিয়ে ও পর্বগুলিকে নিত্যনূতন ভঙ্গিতে সাজিয়ে এক অদ্ভুত ধরনের কৌতুকরস সৃষ্টি করেছেন তিনি। তাঁর পালাগানগুলি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবু তাঁর রূপকথাগুলিও বড়ো কম যায় না। তাঁর জীবনকাহিনীর বইগুলিতেও কথা বলার এই ঢঙ অনেক জায়গাতেই ধরা পড়ে।

বেহালার এক দুই তিন চার আর
ঘোড়া মলার টপ টপ ঢপ ঢপ,

—জোড়াসাঁকোর ধারে : পৃ ১৭

কিংবা—

ব্রহ্মা ওঠেন তো পড়েন,
হাঁপাতে হাঁপাতে পবনকে এসে বলেন

—মারুতির পুঁথি : পৃ ২৮

কিংবা—

তারপরে বাসর জাগরণ,
বানরী-বীণায় তার পরং,
তালি চটপটি বানরী-নর্তন
ও ডুগডুগি বাদন ;

—মারুতির পুঁথি : পৃ ১৯

এরকম অসংখ্য কথা ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনার যেখানে-সেখানে। আর দৃষ্টান্ত নয়, শুধু একটুখানি ধরিয়ে দিলাম। পাঠক নিজে বই নিয়ে বসে রসিয়ে রসিয়ে আরো নানারকম ঢঙ আবিষ্কার করে খুশি হবেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত ধ্রুপদী চালের গম্ভীর রীতির গদ্যের কথা না বললে আলোচনার একটা দিক অসম্পূর্ণ থাকবে। এই রচনাগুলি বস্তুত প্রচলিত সাধুরীতির সমগোত্র, যদিও নিপুণ বাণীশিল্পী অনেক সময়ে এতে ক্রিয়াপদের কথ্যরূপটিও ব্যবহার করতে পারেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অল্প কয়েকটি রচনায় এই রীতি অনুসরণ করেছেন, এবং আশ্চর্যের বিষয় এটি তাঁর সাহিত্যের স্বাভাবিক ভাষাভঙ্গি না হলেও, এতেও তাঁর অসামান্য সৃষ্টিকুশলতা প্রকাশ পেয়েছে। এর একটি প্রধান কারণ এই যে তাঁর এ-রচনাগুলি মুখ্যত হয় বৃহৎ নিসর্গচিত্র-ধর্মী নয় ভাস্কর্যধর্মী, এবং এইজন্যই তাঁর শিল্পপ্রতিভা এদের এমন একটি অনবদ্য বাণীরূপ দিতে পেরেছে। শিল্পরীতির বিচারে তাঁর এ-ভাষাও গীতিচিত্রধর্মী, তবে এ-গীতি ধ্রুপদ পর্যায়ের, আর এ-চিত্র বিশাল দৃশ্যপটের। তাঁর অসামান্য রূপদৃষ্টি ও মৌলিক মনোভঙ্গি এ-ভাষাতেও এক নূতন ঐশ্বর্য এনেছে। প্রথমে ক্রিয়াপদের কথ্যরূপ-বিশিষ্ট রচনার দুটি অংশ উদ্ধৃত করছি :

একটুখানি আলোর আঘাত, নিশীথবীণায় সোনার তারের একটুখানি তীব্র কম্পন। উষার অচঞ্চল শিশির, তার মাঝখানে একটিবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি নূতন দিনের দিকে মুখ ক'রে। পৃথিবীর পূর্বপার পর্যন্ত অনেকখানি অন্ধকার এখনো রাশীকৃত দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণসার চর্মের মতো একটি কোমল অন্ধকার, তারই উপরে আলোর পদক্ষেপ ধীরে ধীরে পড়ছে। সম্মুখে দেখা যাচ্ছে একটি পদ্মের কলিকা জলের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ; যেন ভূদেবী বিশ্বদেবতাকে নমস্কার দিচ্ছেন।

—পথে বিপথে : গিরিশিখরে : পৃ ১১৪

এ-রচনার সৌন্দর্য মুখে বলা যায় না। অন্ধকার রাত্রিশেষে বিশ্বব্যাপী গম্ভীর প্রশান্তির মাঝখানে পূর্বাকাশে প্রথম আলোর কম্পনটি ভাষার সূক্ষ্ম বীণাতারে আশ্চর্যভাবে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। এ হল প্রকৃতির একটি স্থির শান্ত ছবি, এর মধ্যে সর্বত্র একটি সমাহিত ধ্যানের ভাব বিরাজ করছে। কিন্তু যেখানে স্থিতির

মাঝখানে গতির ক্ষিপ্রবেগ হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে সেখানে এই ভাষাতেই আরেক ছন্দ আরেক সুর ধ্বনিত হয় :

ঠিক যেখানটি থেকে সূর্যাস্তের নিচে সন্ধ্যার বেগুনি আঁধার চিরে নদী একটি রুপোর তারের মতো দেখা যায়, সেখানটিতে পৌঁছে পথ স্তুপাকার পাথরের উপর হঠাৎ লক্ষ দিয়ে পুবে মোড় নিয়ে পর্বতের একটা উত্তর ঢালু বেয়ে ছুটে নেমেছে।

—পথে বিপথে : বিচরণ : পৃ ১২৭

ছন্দের বেগ-পরিবর্তন ও আকস্মিক ওঠা-পড়াগুলি বন্ধুর পার্বত্যপ্রকৃতির দৃশ্যকে একেবারে জীবন্ত করে তুলেছে। এখানে আঁধার-চেরা নদীটি যেমন তরতর ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে, পাহাড়ে-পথটাও তেমনি লাফ দিয়ে পাথর ডিঙিয়ে হঠাৎ মোড় নিয়ে পাহাড়ের অন্যদিক দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে।

এবার তাঁর লেখা থেকে ক্রিয়াপদের সাধুরূপ-যুক্ত একটি বিস্ময়কর বর্ণনা উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করে আনছি। বর্ণনাটি কোণার্কমন্দিরের। ভাষার সুগম্ভীর শব্দসঙ্গীতে সিন্ধুতরঙ্গের মতো ছন্দের অবিরাম ওঠা-পড়ার তালে তালে, কোণার্কমন্দিরের প্রাচীন পাথরের ছন্দোময় রূপটি কী আশ্চর্যভাবে ধরা পড়েছে! তার গম্ভীর প্রাণস্পন্দনটি মৃদঙ্গধ্বনির মতো আমাদের হৃৎপিণ্ডে এসে বাজছে :

পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রধ্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যাম-সুন্দর আলিঙ্গনের সহস্র বন্ধে চারিদিক বেড়িয়া! ইহারই শিখরে, এই শব্দায়মান, চলায়মান উর্বরতার চিত্রবিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়, শোভা পাইতেছে কোণার্কের দ্বাদশ-শত শিল্পীর মানসশতদল— সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ।

—পথে বিপথে : সিন্ধুতীরে : গমনাগমন : পৃ ১০৯

এ একেবারে ক্লাসিক। অতি উচ্চাঙ্গের প্রাচীন শিল্পকলা। সমস্ত বাংলা সাহিত্যে বাণীর এই অপূর্ব ভাস্কর্যকর্মের তুলনা নেই। অবনীন্দ্রনাথ এখানে অদ্বিতীয় রূপদক্ষ,— ভারতশিল্পের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠকীর্তির অমর দ্বাদশ-শত শিল্পীর যোগ্যতম প্রতিনিধি। তাঁর এ-সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা স্তম্ভিত হই।

অথচ তাঁর সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের মধ্যে এই একটিবার মাত্র আমরা তাঁকে প্রাচীন স্থাপত্যলোকের গৌরবময় শিল্পচূড়ায় অমর ভাস্কর-রূপে দাঁড়াতে দেখতে পাই, তারপর আবার তিনি ফিরে এসেছেন আমাদের পরিচিত জগতে। প্রথম জীবনে একবার তিনি গিয়েছিলেন প্রাচীন 'রাজকাহিনী'র দেশে, কিন্তু সে ইতিহাসের জগৎ, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নয়। তারপরে তাঁর শেষ জীবনে তাঁর সঙ্গে কতবারই তো দেখা হয়েছে 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে, 'ঘরোয়া'য় : সেই পরিচিত মানুষটি; আলবোলার নলটি হাতে ধ'রে গল্প করছেন আসর জমিয়ে : মজলিশি মন, শৌখিন মেজাজ, কথা বলার সরস লৌকিক ঢঙ : বলছেন, 'নবাব ছেড়ে দাও, আমি নিজেও যে নবাবি করেছি এককালে।' তাঁর মনে ভেসে আসে কত স্মৃতির রেশ : জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সেই দিন-বদলের পালা, কত উৎসব-আলোর রাত, কত সুখদুঃখের মেলা, চেনা-অচেনা কত মুখের ভিড়। সেই সঙ্গে মন চ'লে যায় অনেক দূরে— ছেলেবেলার সেই দিনগুলিতে, চোখে ভাসে সাবেক কালের রূপ, একটি বর্ষাসন্ধ্যা, দাসীদের 'পিদিম' জ্বালানো, কানে ভেসে আসে পদ্ম দাসীর ছড়া-কাটার সুর। কত বড়ো শিল্পীর মন : জ্বলে ওঠে কল্পনার আলো, স্মৃতি হয়ে ওঠে ছবি, ছবি হয়ে ওঠে কথা, কথা হয়ে ওঠে হাজার-বাতি-জ্বালা অপরূপ রূপকথা।

কথক অবনীন্দ্রনাথ

অমলেন্দু বসু

কথনশিল্পের প্রবাহ কত পুরনো ইতিহাসে তার কোনো নির্ভরযোগ্য নির্দেশ পাওয়া অসাধ্য, কিন্তু কাহিনীকথনের ও কাহিনীশ্রবণের আকাঙ্ক্ষা মানুষের অতি পুরাতন আকাঙ্ক্ষা, আর বিশেষতঃ যে-কালে সাধারণ্যে পুস্তকাশ্রিত বিদ্যার প্রচলন ছিল না, বস্তুতঃ মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের এবং বহুলপ্রচলনের পূর্বে যে-কালে শ্রুতির সাহায্যেই স্মৃতিধর হওয়ার রেওয়াজ ছিল, তখন যে কথকতার প্রচলন বহুব্যাপ্ত ছিল সে-অনুমানে সংশয়ী হওয়া সম্ভব নয়। হাটে গঞ্জে বন্দরে, দূর দূরান্তরের রাস্তায়, সরাইখানায় ধর্মশালায় পিপল গাছতলায়, ব্যবসায়ীদের ও পথিকদের অন্য আর কোন্ উপায় ছিল অবসর বিনোদনের, কাহিনীশ্রবণ ছাড়া? কিন্তু যখন মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন হ'ল, অসংখ্য গল্পের বই বেরিয়ে গেল বাজারে, তখনো কাহিনী-কথনের প্রথা ক্ষীণপ্রভব হয়ে গেল বটে কিন্তু অদৃশ্য হ'ল না। হয়তো হবে ভবিষ্যতে যখন টেলিভিশন ও টেপ-রেকর্ডের প্রাধান্যে মুদ্রিত পুস্তক প্রায় বাতিল হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই অনেক দেশে— এমন কি বাঙলা দেশেও— কাহিনীকথনের আর সে প্রচলন নেই যা আমারও বাল্যবয়সে আমি দেখেছি। বর্ষামুখর রাত্রে অথবা শীতশিহরিত সন্ধ্যায়, গ্রাম্যকুটিরে, নৌকায় (বিশেযতঃ পূর্ববঙ্গে গহনার নৌকা নামে যে সব সওয়ারী নৌকা চল্‌তি ছিল) অথবা শহরের দরদালানেও আমরা কাহিনীকথকের কাছে গল্প শুনেছি ঘণ্টার পরে ঘণ্টা, রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলে। যে-বর্ষীয়সী দাসীর মুখে আমি এসব কাহিনী বেশি শুনেছি, তিনি ছিলেন শ্রীহট্ট জেলা-নিবাসী, তিনি কাহিনীগুলিকে বলতেন পরস্তাব। পরস্তাব স্পষ্টতঃ প্রস্তাব অথবা প্রস্তাবনা শব্দের প্রাকৃত রূপ, কিন্তু কেন যে কথাটি এই বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হ'ত তা জানি নে। কেউ কেউ বলতেন 'পড়ন কথা।' পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'র' ও 'ড়'য়ের প্রভেদ লুপ্ত সে কথা সবাই জানেন— অবনীন্দ্রনাথের 'একে তিন তিনে এক' গ্রন্থের ৩-৪ পৃষ্ঠায় তাড়-জাত ব্যঞ্জনধ্বনির সম্পূর্ণ অবলুপ্তির চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়— সুতরাং 'পরন কথা' না 'পড়ন কথা' তা আমি বলতে অপারগ, আর কথাটির কী মানে (বানান ও উচ্চারণ যাই হোক-না কেন) তাও আমার জানা নেই, কিন্তু বাল্যকালে অনেক 'পরস্তাব' অনেক "পড়ন কথা" শোনার পুলকিত সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

বাল্যকালে পেশাদারী কথকতাও শুনেছি। সচরাচর কোনো যাজক ব্রাহ্মণ (কখনো-সখনো অব্রাহ্মণকেও এ কার্যে আহূত হতে দেখেছি ব'লে স্মরণ হয়) মাঝারি রকমের আসরে বসে হিন্দুশাস্ত্রীয় কাহিনী ব'লে যেতেন— রামায়ণ, মহাভারত, নানা পুরাণের কাহিনী। কাহিনীকথনে নানারকম পদ্ধতি লক্ষ্য করেছি। কথকঠাকুর কখনো বা ব'লে যেতেন একটানা গদ্যছন্দে, মাঝে-মধ্যে হয়তো বাক্যাংশগুলিতে মধ্যমিলের ক্ষণিক দ্যুতি প্রকাশ পেত। কখনো বা প্রচুর কথোপকথন ঢুকিয়ে দিতেন কথনপ্রবাহের মধ্যে। কখনো বলার ভঙ্গী হত অতিশয় নাটুকে (সমসাময়িক বাঙলা দেশে যাত্রাগানের বিস্তার প্রবল ছিল), কখনো বা কথক গান গেয়ে উঠতেন অথবা পয়ার বা লাচাড়ি ছন্দে কথনকারুতে বৈচিত্র্য আনতেন। কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি, অঙ্গভঙ্গী ও করমুদ্রা, ঘূর্ণিত নয়ন ও মুখমণ্ডলপেশীর চালনা, এ সব কিছুর সাহায্যে কাহিনীকথনে বৈচিত্র্য ও উত্তেজনার সঞ্চারে কথকের ত্রুটি ছিল না। কিন্তু পুরাণকথকতা প্রধানতঃ ধর্মোদ্দেশ্যপরায়ণ ছিল ব'লে

তাতে গল্প বলার স্বাধীনতা ছিল কম। এ হেন কথকতা এখনো বাঙলা দেশে চলে, তবে আধুনিক কায়দায়— রেডিয়োর মাধ্যমে অথবা শৌখিন ধর্মার্থীদের জলসায় মাইক্-কণ্ঠ কথকতা। অপরপক্ষে যে-পরস্তাব অথবা পড়ন কথার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি, যে-কথনকারু আজ প্রায় লোপ পেয়েই গেছে তা ছিল একেবারেই উদ্দেশ্যরহিত, নিছক গল্প বলার ও গল্প শোনার তাগিদেই সে-কারু জনপ্রিয় হয়েছিল সমাজে, তা ছিল খাঁটি কাহিনীকথনের ধারা। এ ধারায় কথকের অবাধ স্বাধীনতা ছিল, গল্পের কোনো অবশ্য-পালনীয় বাঁধুনিতে তিনি আবদ্ধ থাকতেন না। যখন যেমন শ্রোতা তখন তেমন হ'ত গল্প বলার ঢং। এই সাবলীল কথনশৈলীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত অবনীন্দ্রনাথের রচনায় লক্ষ্য করুন—

> ঢুলুলী শুধোলে— "তারপর ?"
> — "পরের কথা একমাস পরে হলে শুনবা।" বলে চাঁইবুড়ো পুঁথি তুলে প্রস্থান— "ঐ শূর্পণখা এলো" বলে।
> ব্যস্ আর ঢুলুলী কোথা আছে ? কাবুলীকে জাপ্টে ধরে কান্না আর থেম্‌চুনী !'
> কাবুলীর দ্রুত পলায়ন। সভাত্যাগ 'কি হ'ল', 'কি হল' বলে আর সকলের। —চাঁইবুড়োর পুঁথি, পৃ ২৭
>
> চাঁইবুড়ো কথা আরম্ভ করতে যান, ঢুলুলী বলে উঠল— "ও আমি রাঁধুনী-ঠাকুরের রামায়ণে শুনে নিয়েছি।"
> কাবুলী তাকে দাবড়ি দিয়ে বল্লে— "সে হল জয়রামের রামায়ণ। এ হচ্চে পোড়ালঙ্কার পুঁথি। বসে' শোন্ থির হয়ে।"
> "হুম্" বলে বুড়ো আরম্ভ করলে কথা। —চাঁইবুড়োর পুঁথি, পৃ ২৭-২৮
>
> চাঁইবুড়ো পাকা কথক ; আগের দিনের আসর দেখেই বুঝেছিলেন 'মহিষ বধ' 'বালি বধ' হবে না। শুনে ভক্তগণ কিছু পাতলা হয়েছেন, তাই হনুমানকে পিতৃলোকের পঙ্ককুণ্ডে ফেলে, শেষ কি হল শ্রোতাদের বুঝতে না দিয়েই— "হনুমান কি কল্ল, শুনিবা কল্য"— বলে পাঠ বন্ধ করেছিলেন। লোকে ভাবছে কতক্ষণে কল্য আসে ; ঘড়ি যেন পা টিপে চলে, কল্য আর আসে না ; যদি বা এলো তো লোক এসে ফিরে গেল। "শনি মঙ্গল পুঁথির শয়ন, অতএব মঙ্গল উর্দ্ধে বুধে পা'র ধুলো দেবেন অনুগ্রহ করে ভক্তগণ ঐ দিন— সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় পুঁথি-জাগরণ। ১৯শে চৈত্র, ১লা এপ্রিল, চৈত্র সুদি ৮।৭।১৯ গতে গো সহস্রী যোগে শ্রবণ ফল— স্ত্রী তৈল মৎস্য মাংসাদি সম্ভোগ।"
> বুধবারে আসরে লোক আর ধরেনা। চাঁইবুড়ো মৃদুমন্দ হাস্য করে অতি নম্রস্বরে পাঠ আরম্ভ করলেন।— মারুতির পুঁথি, পৃ ৫৭-৫৮

কথনশৈলীর এই সাবলীল শক্তিতে গড়ে উঠেছে কথক ও শ্রোতার অন্তরঙ্গতা। কোনো পূর্বনির্ধারিত কাহিনীর বাঁধা সড়কে কথক চলতে রাজি নন। রাম লক্ষ্মণ রাবণ, সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান, হারুনল রসিদ্ জাফর সিন্দবাদ—এ হেন কয়েকটি সুপরিচিত নামের ব্যবহারে পাঠকচিত্তে stock response মামুলি সায় অবশ্য মিলবে সেকথা চতুর কথকের অজানা নেই। ঐটুকু সায় তাঁর পুঁজি, তারপরে সুদক্ষ বণিকের মতো ঐ পুঁজিটুকুকে নানাভাবে খাটিয়ে বাড়িয়ে তোলেন অশেষ ঐশ্বর্যে। বে-লাগাম কল্পনার আবেগে ও নিঃসংকোচ প্রাকৃতভাষার প্রয়োগে তিনি ব'লে চলেন তাঁর কাহিনী, শুদ্ধ বলার আনন্দে, শুদ্ধ শোনাবার খুশিতে।

২

কথনকারু কি আজ বাঙলা দেশ থেকে লোপ পেয়েছে ? আমি মধ্যজীবনে প্রবাসী বাঙালী, খণ্ডিত বিপর্যস্ত বাঙলায় আজো কথনকারুর ধারা অব্যাহত কিনা জানি নে। 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা।' কথকতা সে-রঙ্গের অন্যতম কী ? অক্টোপাসের মতো চারিদিকে ছড়ানো আর অক্টোপাসের মতোই কুদর্শন কলকাতা শহরে আর কথকতা নেই, "আষাঢ়ে গল্প" নেই বলে'ই মনে হচ্ছে। তবুও আশা করি সমগ্র দেশ থেকেই

অন্তর্হিত হয়নি কথকতার ধারা। আশা করি, কেননা কথকতার ধারায় বাঙালীর লৌকিক ঐতিহ্যের এক অনন্য গৌরব। আশা অন্য কারণেও করি কেননা আজকের আর ভবিষ্যতের বাঙালী ছেলেমেয়ের কাছে যদি কথকতার ধারা একেবারেই অপরিচিত হয়ে পড়ে তাহলে বাঙলা সাহিত্যের একটি অতি উজ্জ্বল ও আনন্দঘন অংশ তাদের কাছে নিষ্প্রভ ও নিষ্প্রাণ হয়ে' পড়বে—শ্রেষ্ঠ বাঙালী কথক অবন ঠাকুরের লেখার মস্ত একটা অংশ তাদের কাছে নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। লেখকে ও পাঠকে সে-অসাম্য হবে পাঠকেরই পক্ষে শোকাবহ।

অবনীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব অবশ্য কথকতার একতারাতেই নয়, বহুশিল্পপারংগমতার বিচিত্রবীণায়। যদি তাঁর অধিকখ্যাত শিল্প-নিপুণতার কথা ছেড়েও দিই (অর্থাৎ চিত্রশিল্পের প্রসঙ্গ না-ও তুলি), শুধু তাঁর রচনা শিল্পের কথাই চিন্তা করি, তা হলেও দেখতে পাব লেখক অবনীন্দ্রনাথের বিষয়বস্তু কত বহুবর্ণ, তাঁর রচনাশৈলী কত অনায়াসে বিষয়বস্তুর সহধর্মিণী! ঐতিহাসিক কাহিনীর শিল্পরূপ অনুভূতিঘন যে-সমৃদ্ধি লাভ করেছে রাজকাহিনীতে তার তুলনা বাঙলা বা উত্তর ভারতীয় কোনো সাহিত্যেই নেই, ইংরেজি সাহিত্যেও দুর্লভ। 'পথে বিপথে' সমকালীন পরিবেশে খুশ্‌খেয়ালী রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 'নালকে' পাই জাতকের কাল; 'আলোর ফুলকি'তে নিসর্গ-দর্শনের সূক্ষ্মানুভূতিশীল গদ্যকাব্য; 'বুড়ো আংলা'তে শিশুকল্পনা ও শৈশবমর্মী বয়স্ককল্পনা সমানভাবে উদ্দীপিত, তাতে হাঁস ছেলে ও শেয়ালের কাহিনীর সঙ্গে মিলেছে বিশ্বসৃষ্টির কাহিনী, পাহাড়ী উপাখ্যান, আসামী বুরুঞ্জি। 'ভূতপত্‌রীর দেশে' ফ্যান্‌টাসি বা অতি-কল্পনার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। সর্বত্রই অবন ঠাকুর উপকথাকার, গল্পবলিয়ে, অথচ তাঁর গল্পের কথাবস্তু কখনো পুনরাবৃত্ত হয় নি। অসীম ঐশ্বর্যবান কল্পনার সঙ্গে মিলেছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর তার সঙ্গে আরো মিলেছে বহুবর্ণাঢ্য রচনাশৈলী যাতে আমি ইন্দ্রধনুর মত অন্ততঃ ছয় সাতটি বিভিন্ন বর্ণ লক্ষ্য করতে পারি। ইংরেজ কবি-সমালোচক ড্রাইডেন কবি চসার্‌-এর প্রশংসায় মুখর হয়ে বলেছিলেন, Here's God's plenty!— অন্নপূর্ণার সে-ভাণ্ডার অবন ঠাকুরের রচনাবলীতে, সেখানে অফুরন্ত বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য। কিন্তু যেন এ-প্রাচুর্যও প্রচুর নয়! ঐশ্বর্যবান ও বিচিত্র এই কাহিনীর জগতে যেন অবনীন্দ্রনাথের সৃজন-প্রেরণা অবসন্ন ও ক্লান্ত হল না, প্রবীণ বয়সে নিযুক্ত হল নতুনতর কথাবস্তুর আর কল্পনার আর শৈলীর সন্ধানে। অবনীন্দ্রনাথ হলেন কথক অবন ঠাকুর। 'রাজকাহিনী' ও 'বুড়ো আংলা'র লেখক শুরু করলেন 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের বিচিত্রবীণায় এ-কথকতা একটিমাত্রই তার কিন্তু সে-তার অবজ্ঞেয় নয়, সে-তারে ও অন্যান্য তারে সুরের নিখুঁত সংগতি বিদ্যমান।

কথকতার আদর্শ অবনীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন কোথা থেকে?

শিল্পকর্মের উৎসসন্ধান সমালোচনার কিছু একটা মহৎ উদ্দেশ্য নয়, সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য শিল্পের রসাস্বাদন। যে-ঔৎসুক্য যে-তথ্যসন্ধান এই প্রধান উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয় বা সে-উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটায় অথবা এমন কি সে-উদ্দেশ্যের সহায়তা করে না, সে-ঔৎসুক্যের সে-তথ্যের অন্য যে-মূল্যই থাক না কেন কোনো শৈল্পিক সার্থকতা নেই, সৎ সমালোচকের দৃষ্টিগোচরে সে-তথ্য নির্মূল্য। তবে অবন ঠাকুরের কথনপরায়ণতা আলোচনা করতে গিয়ে এ-পরায়ণতার উৎসসন্ধান নিতান্ত অসার্থক নয়। 'পড়ন কথা' বা লৌকিক কথকতা বাঙলার শিশু সাহিত্যে স্থান পেয়েছে সম্ভবতঃ প্রায় একশো বছর যাবত। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সুকৌশলে উপকথার ভাষা ও কথনছন্দ স্বীয় কথনকারুতে আমদানি করেছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর এবং সুখলতা রাওয়ের গল্পের বইগুলিতে, শান্তা ও সীতা দেবীর হিন্দুস্থানী উপকথায়, তা ছাড়া আরো

গুটিকয়েক বইয়ে ব্যবহৃত উপকথার বাক্-ভঙ্গি কৃতিত্বময়, কিন্তু অবন ঠাকুরের উপকথায় ও কথকতায় যে-গুণ তা'কে বলব কৃতিত্বেরও অধিক কেননা সে-গুণ নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির গুণ। কিন্তু 'মারুতির পুঁথি' ও 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' কি কেবল শিশুরই জন্য ? আমি অন্ততঃ একজন বাঙালী পাঠকের কথা জানি যার শৈশব আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দীর দূরত্বে ধূসর তবুও যার প্রৌঢ় চিত্ত এই বই দুখানার দুর্জয় আহ্বানে অসংকোচে সাড়া দেয়। এমন প্রৌঢ় বাঙালী পাঠক সমাজে অবশ্যই বিরল নয়। বয়সের কোনো সীমানা নেই অবন ঠাকুরের কথকতায় আনন্দ পাবার জন্য। ছয় থেকে ষাট, আট থেকে আশী, সব বয়সেই এ-কথকতায় আনন্দ পাওয়া যেতে পারে শুধু যদি পাঠকের চিত্তে নমনীয় সংবেদনা থেকে থাকে। তা ছাড়া 'মারুতির পুঁথি' ও 'চাঁইবুড়োর পুঁথিতে' যে-অর্থঘনতা, যে-সূক্ষ্ম অর্থ-বৈচিত্র্য, যে-wit বিদ্যমান তাদের মাহাত্ম্যে এ-বইগুলি শিশুসাহিত্যের সীমানা পেরিয়ে পৌঁচেছে সার্বজনিক সাহিত্যের স্তরে, প্রাকৃত উপকথা থেকে শালীন সাহিত্যের স্তরে। অতএব অবন ঠাকুরের কথকতার উৎসসন্ধান নিরর্থক নয়। উৎসের জ্ঞানে এই কথকতা-শিল্পে আমাদের আনন্দ আরো নিবিড় হওয়া সম্ভব। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় অবনীন্দ্রনাথের কোনো তথ্যপরায়ণ জীবনী নেই, তাঁর অভিজ্ঞতার ও কর্মের কোনো বিশদ কালপঞ্জী নেই, কোন্ ধরণের বই তিনি পড়েছিলেন ও পড়তে ভালোবাসতেন, সে-সব তথ্য সম্ভবতঃ তাঁর এককালীন নিকটবর্তীরা জানেন কিন্তু সাধারণ্যে তা' অজ্ঞাত। অতএব আজকের আলোচক শুধু অনুমানেই নিরস্ত হবেন। শৈশবে যে-দাসীর হেফাজতে ছিলেন সেই পদ্মদাসীর কাছে শুনেছেন কি 'পড়ন কথা' ? অথবা মনোহর সিং দরোয়ান বা সমসের সিং কোচোয়ানের কাছে ? যাকে বলে teen-age, সেই দশের কোঠার সহজগ্রাহী বয়সকালে মিশেছেন কাদের সঙ্গে, গেছেন কোথায়, দেখেছেন কী ? গঙ্গার ঘাটে যে-সব স্টীম্‌লঞ্চ অথবা নৌকা বাঁধা থাকত (আজো থাকে), সেগুলির খালাসি ও মাল্লার সঙ্গে মিশতেন কি, শুনেছেন কি তাদের কাছে মুসলমানী কিস্‌সা, উত্তরভারতীয় দস্তান ? কোনো কোনো সময়ে তাঁর সঙ্গী ছিল কি বাবুর্চি খানশামা হুঁকোবরদার উড়ে বেহারা ? অথবা কাছারির নায়েব বরকন্দাজ লাঠিয়াল ? সিন্ধবাদ হারুনল রসিদকে জেনেছেন কি গল্পের আড্ডায় অথবা বইয়ের পাতায় ? সে বই কি বটতলার 'দোভাষী সাহিত্যের' দু-চারখানা কহানী কিস্‌সা— আমীর হমজা, গুলেবকাওলী আর ফসানা আজায়ব— যেসব উপকথা অর্ধশিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের চিত্তে আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে দীর্ঘকাল ? আর চাঁইবুড়োর নকল কি কেউ ছিলেন সত্যিকারের জীবনে, আর খাতাঞ্চি মশায়ের ?

এসব কৌতূহল চরিতার্থ না হলেও অবন ঠাকুরের কথকতায় আনন্দলাভের অসুবিধা হয় না। দায়িত্বচেতন সৎ সমালোচকের শুধু এ কথা বারংবার মনে হবে যে শালীন সাহিত্যে লৌকিক কথকতার রূপায়ণ বাঙলায় (বোধ হয় যে-কোনো ভাষাতেই) নিতান্তই অভিনব, সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের রচনার সম্পূর্ণ মূল্যায়নের পূর্বে জানা দরকার (অথচ সে কথা এখন জানা যাচ্ছে না) তাঁর কথকতা-শৈলীর পিছনে সাহিত্যিক ঐতিহ্য কোথায়, কতটুকু ?

৩

কথকতার দুনিয়ায় চাঁইবুড়ো কথকপ্রবর। তাঁর স্বনামেই একখানা বই হয়েছে—'চাঁইবুড়োর পুঁথি'। অন্য বই 'মারুতির পুঁথি'রও কথক মহামতি চাঁইবুড়ো, যদিচ মাঝে মাঝে শ্রীরামচন্দ্রের নাম স্মরণান্তর তিনি

হাওয়া হয়ে যান আর তখন চাংড়া ঠাকরুনকে শুধোলে জানা যায় যে বুড়ো গেছেন রামরাজাতলায়, সেখান থেকে রামকৃষ্ণ মঠের দিকে, সেখান থেকে শ্রীরামপুরে, অতঃপর রামপুরহাটে, অবশেষে রামকেষ্টপুর ঘুরে এসে আবার ব্যাসাসনে বসেন পুঁথিপাঠ করতে। 'রং-বেরং' নামধেয় বইয়ের তিনটে গল্পে চাঁইবুড়ো হাজির—'চাঁইদাদার গল্প' 'রতনমালার বিয়ে' 'বহিত্র'। চাঁইবুড়ো ছাড়া আর যে-খাতাঞ্চিমশায় মাঝে মাঝে দেখা দেন— চাঁইদাদারই মাসতুতো ভাই অথবা পিসতুতো সম্বন্ধী কিনা জানি নে— তিনি যখন ইচ্ছাময়ী বটিকা গালে পুরে 'ইস্‌চামই তোমারই কিরূপা' ব'লে জমিদারী সেরেস্তার ফর্দ নিয়ে বসেন তখন পড়ন কথার জগৎটা উপকথার জগৎ থেকে নেমে আসে যে-জগতে তাকে কি বলব অবকথার জগৎ? সে-জগতে কুস্‌তুন্‌তুনিয়ার এক সদাগর আশ্চর্য শকুনবিদ্যার কৃপায় আপন জরুর হাত থেকে প্রাণরক্ষা পেয়েছিল, সে-বিদ্যার মালিক ছিল এক নাম-না-জানা ফরাসী পণ্ডিত আর ভাগ্যবান ভারতবর্ষে সে-আশ্চর্য বিদ্যা অর্শেছে (খাতাঞ্চি মশায়ের প্রমুখাৎ এসব তথ্য আমরা জানতে পেরেছি) এক অবনীবাবুতে আর খাতাঞ্চির টেম্‌পোরারি নফর শ্রীখুদিরাম বিশ্বাসে! অবনীবাবুর জুটিটি ভালো! সে-আশ্চর্য বিদ্যা না আছে রবিবাবুর না আছে এমন কি তাঁর ইস্কুলমাস্টার জগদানন্দ বাবুর, আর এ-প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নামোল্লেখ মানে ধান ভানতে শিবের গীত! শকুনবিদ্যার প্রায় অনন্য মালিক খুদিরাম জেনেছে মোরগের গাওয়া গজলের ভাষাটা কী?

> শুন্। গুল্‌মুর্গা ফুল বনের বন মোরগ,
> ফজিরে উঠি, খেলাই রুটি, পালক মুঠি চুজারে রোজ্-ব-রোজ্। —রং-বেরং, পৃ ৪৯

মাত্রানির্ভর এ-ছন্দের ফার্সী শব্দগুলিতে সত্যেন দত্ত ও নজরুল ইসলামকে মনে পড়ে। শকুন বিদ্যার প্রসাদাৎ গোবেচারি খুদিরাম আবৃত্তি ক'রে দিল অনেকগুলি "উদরু" গজল, আর ইচ্ছাময়ী বটিকার কৃপায় উর্দু শায়েরী আমরা আরো জানতে পারি।

> গর্দবাদের ওর্দানশীল কোর্মা ক্ষেতের খোসবু
> জিলদে ধরা বুলবুলির গান খুঞ্চে ঢাকা বস্তু। —রং-বেরং, পৃ ৯৩

পোর্টম্যান্টো শব্দরাজির এমন নিখুঁত নন্‌সেন্‌স্ অবন ঠাকুর ছাড়া আর লিখতে পারতেন সুকুমার রায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আর অবশ্য লিউইস্ ক্যারল্। কিন্তু উর্দুবাগী গজলে নন্‌সেন্‌স্ ছাড়া অন্য সেন্‌স্‌ও আছে। সেন্‌স্ মানে যদি ইন্দ্রিয় তা হ'লে শ্রবণেন্দ্রিয় শিহরিত হয় গুণগুণানো এই গজলে আর রসনেন্দ্রিয় নিশ্চয় নিরাসক্ত থাকতে পারে না:

> নুন মরিচ গলদা চিংড়ি
> ঝোল কাবাবি দোলমা
> কোর্মাবাগের মুর্গাদারি
> পিক কাবাবি খোরমা
> সুর্মা কাজল রাতে রাতে
> গরমাগরম টুকরা
> গুল মুর্গার খুনখারাবি
> বখরেদারি বখরা। —রং-বেরং, পৃ ৯৪

এ হেন খাদ্যতালিকার জুড়ি মিলবে অন্যত্র।—

শির বিরিঞ্জি ফালুদা আর গোলাপী সরবৎ,
কালিয়া কোর্মা কোফ্‌তা কাবাব দমকৎ।
আখরোট মনাক্কা কিসমিস বাদাম,
খোরমা ও খেজুর কত ভাল ভাল আম।
শিরা ও মালাই ক্ষিরণী চৌরসের দুধ,
চিনি মিছরি নিয়মিত খাইনু বহুৎ। —একে তিন তিনে এক, পৃ ১৭

গলদা চিংড়ি কোফ্‌তা কাবাব ইত্যাদি আমিষ ভোজ্য যদি কোনো বৈষ্ণবপ্রবরের রুচিসংগত না হয় তা হলেও অবন কথকের রাজ্যে অন্য ভোজ্য সামগ্রী আছে যা আজকালকার রেলস্টেশনের হিন্দী নামধারী 'শাক-উপাহার গৃহে' মিলবে না। শ্রীমান হনুমান যখন 'সুশ্রেণ বৈদ্যপীঠে' পৌছলেন তখন 'ভাই ভাই' ব'লে ধন্বন্তরিপুত্র পবননন্দনে দেন শত চুম্বন আর ভৃত্যকে ডেকে বলেন—

ভাগ্য বলে আইলেন পবননন্দন, ভালোমত প্রস্তুত কর অন্ন ব্যঞ্জন।
লুচি মালপোয়া তেলে ঘৃতেতে ছাঁকিয়া, বার্তাকু ভাজহ তাহে তিল বড়ি দিয়া।
চোঁয়া চোঁয়া ক'রে ভাজ উচ্ছে কড়কড়ি, গুড় চিনি একত্রেতে তাহে ফুলবড়ি।
অড়হড় ডাল আর মুগের সাউলী, সুপঘন্ট মোচাঘন্ট কদলীর আউলি।
কুষ্মাণ্ডের অম্বল তাহে দোবরা চিনি, নারিকেল পুর ভাজো— পথ্য করবেন ইনি।
পাকশাল হৈতে আইল পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, হনু সঙ্গে বৈদ্যরাজ করিল ভোজন।
ভোজন করিয়া দোঁহে কৈল আচমন, কর্পূর তাম্বুল নিল মুখের শোধন। —মারুতির পুঁথি, পৃ ৩৫-৩৬

উর্দু শব্দের প্রয়োগ কেবল নন্‌সেন্স্‌ ও ভোজনবিলাসের জন্য নয়, কথকতায় একটা বিশেষ সুরসঞ্চারের জন্যও। যে-উর্দু শায়েরী উপরে উল্লেখ করেছি তার সগোত্র (কিন্তু ঈশ্বর জানেন এ-গীতের অর্থ কি) মিলবে সিন্ধবাদের গজল গীতে—

খার হাজরত্তি কররে তক দেলসে খাটকতা যায়েগা
মোরগে বেছমেল কি তারেহ লাসা তড়প্তা যায়েগা
মর্ গিয়া হোঁ মেয় দুনিয়াকি হাদ্দরাত দিদার মে
কররে তর্ক মেরাজ কী রাহ তাকতা যায়েগা! —রং-বেরং, পৃ ১১

এখানে কতকগুলি উর্দু ও ভুয়া-উর্দু শব্দের সমাবেশ ও উর্দু গজলের ঢং। অবন ঠাকুর আরবী ফারসী উর্দু জানতেন কিনা, জানলে কতটা জানতেন, সে তথ্য আমার অজ্ঞাত ; কিন্তু উর্দু-ঘেঁষা শব্দচয়ন (সর্বত্র নয়, রচনা-বিশেষে) তাঁর রচনাশৈলীর একটি প্রধান আঙ্গিক। ভারতচন্দ্রের পর থেকে বাঙলায় কবিগানের সঙ্গে যে-মুসলমানী পুঁথিসাহিত্য প্রচলিত হয়েছিল, বটতলায় ছাপা সে-সব সস্তা পুঁথি সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালী উদাসীন এবং কুঞ্চিতনাসা, অথচ সে-সব পুঁথিপাঠে ও শ্রবণে অসংখ্য মাঝি-মাল্লা-ব্যাপারী-মজুরের শ্রমহরণ হয়েছে দুই শতাব্দী যাবৎ। ইদানীং এ-সাহিত্যের নামকরণ হয়েছে 'দোভাষী সাহিত্য': 'দোভাষী পুঁথিতে বাঙলার সঙ্গে প্রচুর আরবী-পারসী শব্দ ব্যবহৃত হত বলে আমরা এই নামকরণ করেছি'

('বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ২২)। দোভাষী শব্দভাণ্ডারের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হ'ল ছহি জৈগুনের পুঁথি থেকে—

সালাম করিয়া বলে তামাম সরদার।
তক্‌ছির করহ মাফ আমা সবাকার॥
লড়িয়া তোমার সাথে না হইনু ফতে।
আখেরে হইল দায় জান বাঁচাইতে॥
এখন তোমার পানা লিয়াছি আসিয়া।
আমা সবাকার তরে রাখ নেওয়াজিয়া॥

এই দোভাষী শব্দচয়ন ও ঢিলেঢালা পয়ার অবন ঠাকুর এত সহজে আত্মসাৎ করেছেন যে মনে হয় যেন সারাজীবন তিনি এই কিস্‌সা-সাহিত্যের আবহাওয়াতেই মানুষ। নিম্নোদ্ধৃত ছত্র কয়টি যদি কোনো দোভাষী পুঁথিতে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তা হলে ওগুলিকে যে কেউ প্রক্ষিপ্ত মনে করবেন এমন আশঙ্কা হয় না—

বুড়ার খাতিরে আমি ঠাহরি কম জোর।
ছওয়ার করিয়াছিনু গর্দান উপর॥
যখন এশারা করি নামিতে এহায়।
দুই পায়ে নেপটিয়া ধরিল গলায়॥
এয়ছা গলা দেবে ধরে পাও লাগাইয়া।
আমি বলি দম বুঝি গেল নেকালিয়া॥
চাম বরাবর পাঁও আছিল এহার।
তছমার মাফিক ডালে গলেতে আমার॥
জোর করি বুড়া পাঁও লাগায়ে গর্দানে।
বেহোঁস করিয়া মোরে গেরায় জমিনে॥ —রং-বেরং, পৃ ১৪

কিস্‌সা-রচনার কিছু কিছু বিশিষ্ট আঙ্গিকও আছে যথা, 'তুড়ি', 'জুড়ি', গজল গীত, গীত, জবাব গীত ইত্যাদি। সে-সমস্তই অবন ঠাকুরে হুবহু অনুকৃত হয়েছে। গ্রীক নাটকের Stichomythiar মতো পয়ার ছন্দে কথোপকথন-আঙ্গিক অবলম্বিত হয়েছে, এক ছত্র বলছে খালাসী, পরের ছত্র কাঠুরিয়া—

১। সোনা নয় সোনা নয় মানিকের মুরতি।
২। কভু বনে পয়দা হয় মানিক আর মোতি॥
৩। শুন ভাই নির্বাস হয় বন মানুষ।
৪। দুর দুর নাই তেরা কোন হুস গুস্॥ —রং-বেরং পৃ ১২

উর্দু শব্দচয়নের সঙ্গে ছত্রগুলিতে মধ্যমিলের আমদানী হওয়ায় রচনার স্বরবৈচিত্র্য বেড়েছে—

দেখহে খালাসিগণ কইরা খুব নিরীক্ষণ
বিপদে পইরাছে জানি হবে কোন্ মোহাজন!
কিবা কোন্ ছওদাগর যেতেছিল ছপর
তুফানে পইরা ডিঙ্গা হৈল তর এইক্ষণ। —রং-বেরং, পৃ ১২

খালাসিগণ, নিরীক্ষণ, মোহাজন, ছওদাগর, ছপর, এইক্ষণ, ইত্যাদি মিল-লাগানো শব্দগুলির উচ্চারণ স্বরান্ত হবে পয়ার পাঠরীতির প্রাচীন ধারানুসারে।

অবন ঠাকুরের উর্দুশব্দবহুল শৈলী সিন্ধবাদ কাহিনীতেই প্রযুক্ত হয়েছে, আর এ-কাহিনী তাঁর লেখায় অনেক কাল থেকেই উঁকিঝুঁকি মেরেছে। পুরনো বই 'ভূতপত্রীর দেশ,' সেখানে সিন্ধবাদের আবির্ভাব খুবই নাটুকে পরিস্থিতিতে—

দেখি ছ'টা বেহারা আমার পাল্কিটি নিয়ে বসে আছে,— দেখতে কালো কিচ্‌কিন্দে!

"কে হে বাপু তোমরা আমার পাল্কিটি নিয়ে?"

"বাবুজি, আমরা তোমার পিসির চাকর— কিচ্‌কিন্দে, কাসুন্দে, বাগুন্দে, ঝালুন্দে, মালুন্দে, হারুন্দে।"

. .

"আমার নাম হারুন্দে নয়;— আমি হারুণ-আল্‌-রশীদ, বোগদাদের নবাব থাঙ্গা খাঁ জাহান্দার শা বাদশা। এখন হয়ে হারুন্দা।

"একদিন আমি আমার বসরাই গোলাপবাগ বলে যে বাগান সেখানে বসে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছি, আর গোলাপজলের ফোয়ারার ধারে বসে এই মসুর আমার পোষা বুলবুল্ বোস্তাঁর সোনার খাঁচাটা ধুয়ে-মেজে সাফ করছে, এমন সময় সিন্ধাবাদ নাবিক সাত সমুদ্দুরের জলে সাতখানা জাহাজ-ডুবি করে এসে হাজির— ভিজে কাপড়ে দু হাতে আমাকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে।

. . .

আমি সিন্ধবাদের হাত ধরে উঠিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে টুলে বসিয়ে বল্লেম— "সিন্ধবাদ, শোনো। জান আমি হারুন আল্‌-রশীদ, আমার সামনে মিথ্যে কথা বল্লে তোমার মাথা কাটা যাবে জানো!"

সিন্ধবাদ বল্লে— "জানি হুজুর, সেই জন্যেই তো আমার দুঃখু! সব সত্যি বলতে হল হুজুর, একটি মিথ্যা কথা দিয়ে এবারকার গল্প সাজাতে পারলুম না।

— ভূত-পত্রীর দেশ, পৃ ১৬-২০

ফ্যান্টাসি বা অতিকল্পনার নিদর্শন হিসাবে 'ভূতপত্রীর দেশ' অনবদ্য আর উৎকলীকৃত সিন্ধবাদ, হারুন অল্ রশীদ মসুর সে-কল্পনার তুলনাহীন প্রতিভাস, কিন্তু তবুও এ-সিন্ধবাদে মন ভরে না। এ যেন বড়ই ভদ্রভাষী সিন্ধবাদ, সর্বক্ষণ সে জানে তার শ্রোতা কলকাতাবাসী ভব্য ছেলেমেয়েরা, তার বাক্‌ভঙ্গী চলেছে শালীন সাহিত্যের ছককাটা রাস্তায় সাবধানে। সে-ছককাটা রাস্তা থেকে ছিটকে বেরিয়েছে সে 'সিন্ধবাদ-বিবরণ পদ্যে'। একদা সে কথা বলেছিল নিষ্প্রাণ মার্জিত ভাষায়:

'শুনুন, আমি এবার কি আশ্চর্য কাণ্ড দেখে এসেছি,— এবারে আমি জাহাজ নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেম'।

"সিন্ধবাদ-বিবরণ পদ্যে" সে বলতে লাগল—

আমার নাম হিন্দবাদ নয়— ছন্দবাদ জাহাজি; বোগদাদ হৈল ডেরা আমার। আমার জাহাজগুলা সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর নোনা আর মিঠা জলে চলাচল কৈরা কিঞ্চিৎ জখম হয়েছে, সেই কারণে কিছু মন-পবন কাষ্ঠের পিয়োজনে এদেশে আগমন। হঠাৎ বনের মধ্যে মশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

—রং-বেরং, পৃ ১৪-১৫

সিন্ধবাদ এখন রূপান্তরিত হয়েছে ছন্দবাদে, রক্তমাংসের জাহাজিতে, যে-রকম জাহাজি খিদিরপুরে চাটগাঁয়ে

পাইস্-হোটেলের চ্যাটাই-শয্যায় বসে হুঁকো টানে। এই রূপান্তরের কারণ তার বচনভঙ্গী। কিস্সা-সাহিত্যের দোভাষী বাক্-ভঙ্গিতে সিন্ধবাদের মুক্তি, অবন ঠাকুরের কাহিনীকথন জয়যুক্ত।

৪

কত রকমের বাক্-ভঙ্গিই না অবনীন্দ্রনাথ ধরে রেখেছেন তাঁর রচনায়! শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যের স্বচ্ছন্দগামী বাক্‌ধারায় বয়ে চলেছে কতকগুলি গল্প— 'বুড়ো আংলা', 'ভূতপতরীর দেশ', 'ক্ষীরের পুতুল', 'একে তিন তিনে এক', সর্বত্রই সে-প্রবাহের কলধ্বনি। কখনো বা মোরাদাবাদী মিনা-কারুর সূক্ষ্ম মিনিয়েচার কাজের মত ছোট কথিকায় (যথা : 'সাথী' 'খোকাখুকি') ফুটে উঠেছে অপরূপ রূপক যার তুলনা মিলতে পারে কেবল রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'য়। সাধারণ প্রবহমান বর্ণনাতেই কত কুশল কারিগরি অথচ কত সহজ—

সকাল থেকে সন্ধ্যে তিনি বেড়িয়ে বেড়ান, একলাটি। চারিদিকে বড়ো বড়ো দেবদারু আর ঝাউ, এত পুরোনো যে তাদের বয়স কেউ জানে না। ডালে ডালে সব সবুজ সেওলা জটার মতো ঝুলে পড়েছে; শিকড়গুলো তাদের পাথর আঁকড়ে কোন্ পাতালে যে নেমে গেছে তার ঠিক নেই। কোথাও ঝুর-ঝুর ক'রে পাতা ঝরছে, কোথাও ঝাউফলগুলোয় মাটি একেবারে বিছিয়ে গেছে। একটা নালার ধারে ঝরণা ঝরছে, তারি একপাশে ব্যাঙেরা ছতরি বেঁধে হাট বসিয়েছে। —আলোর ফুলকি, পৃ ৭৪

আবার কোনো সময় এই গদ্যেই পুরোপুরি লিরিক্-এর ধর্ম এসে পড়ে আবেগ ও কল্পনার ব্যঞ্জনায় :

দেখতে দেখতে দূর আর কাছের রাস্তা-ঘাট মাঠ-ময়দান ঘর-দুয়োর গ্রাম-নগর বন-উপবন সোনাময় হয়ে দেখা দিলে। কিন্তু দূরে পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে নদীর ধারে গাছগুলোর শিয়রে এখনো একটু আধটু ধুয়াশা মাকড়সার জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে, ওগুলো তো থাকলে চলবে না, কুঁকড়ো প্রথমে আস্তে বললেন, "সাফাই", সোনালী ভাবলে কুঁকড়ো বুঝি হাঁফিয়ে পড়েছেন আর বুঝি পারেন না গান করতে, কিন্তু "আরো আলো চাই" বলে কুঁকড়ো আবার গা-ঝাড়া দিয়ে এমন গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন যে মনে হল বুঝি তাঁর বুকটা ফেটে গেল, "আলোর ফুল আলোর ফুল, ফু-উ-উ-উল-কি-ই-ই আলো-র-র-র-র"। দেখতে দেখতে আকাশের শেষ তারাটি সকালের আলোর মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল, তারপর দূরে দূরে গ্রামের কুটীরের উপর জ্বলন্ত আখার সাদা ধুঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সকালের আকাশের দিকে উঠে চলল আস্তে আস্তে। কুঁকড়ো দেখলেন আলোর ঝিকিমিকি আঁচলের আড়ালে সোনালিয়ার সুন্দর মুখ। কুঁকড়ো মোহিত হলেন। আজ তার সকালের আরতি সার্থক হল, তিনি এক আলোতে তাঁর জন্মভূমিকে আর তাঁর ভালোবাসার পাখিটিকে সোনায় সোনায় সাজিয়ে দিলেন। —আলোর ফুলকি, পৃ ৪৬

আর একদিন দেখেন হনুমান— অযোধ্যার উপরে রাতের আকাশে উঠেছে চাঁদ, তারা, তার নীচে ঘুরছে, ফিরছে, জ্বলছে, নিভছে— রাশি রাশি জোনাক-পোকার ঝাঁক। বাতাসে লাগছে থেকে থেকে বাঁশীর সুর! দেখতে দেখতে চাঁদ অস্ত গেল। সকালে সূর্য্য উঠলো— কিন্তু যেন কালো একখানা লোহার তাওয়া। তার পর দশ দিন ধরে আর কিছু দেখা যায় না— কেবল ঝড় আর বৃষ্টি, আর তার মধ্যে মধ্যে বাতাসে হু হু কান্নার সুর! কি যেন একটা ঘটে গেল অযোধ্যার দিকে। দশ দিন পরে সূর্য্য উঠলো তেলের মত হলুদ গোলা আকাশে একটি বার— তার পরই লোহার কস্-ধরা কালো মেঘের রথ সূর্য্যের আলো অন্ধকার করে দক্ষিণ মুখে চলে গেল। তার পর আকাশ পরিষ্কার— নীল, হলুদ, আর সোনালী রং-এর পতাকা যেন দেখছি। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, কোথাও কিছু নেই— হঠাৎ একখানা মেঘ যেন নাক কাটা রক্তমুখী কালো বোক্‌শী পালিয়ে গেল দক্ষিণ মুখে বাতাস নাকী সুরে ভরে দিয়ে, রক্তবৃষ্টি করতে করতে। —মারুতির পুঁথি, পৃ ৪৫

গদ্য যদি স্বকীয় গদ্যধর্ম ছেড়ে কাব্যধর্ম গ্রহণ করে তা হলে সে-অবস্থা ভয়াবহ কিনা সে-বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা সম্ভব। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে সে প্রশ্ন প্রবল, আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় এতাবৎ সে-প্রশ্নের

উত্থাপন দেখেছি বলে স্মরণ হয় না, কিন্তু উত্থাপন হওয়া উচিত। আপাততঃ এ-সম্বন্ধে আলোচনায় নিযুক্ত হওয়া সম্ভব দেখছি নে, তবুও এটুকু বলা সংগত যে শিল্প হিসাবে পদ্যের চেয়ে গদ্য অনেক বেশি জটিল এবং কঠিন, তার দায়িত্ব বৃহত্তর, তার সম্ভাবনা বিস্তৃততর কেননা গদ্যের যা সহজ ধর্ম তা তো আছেই, তা ছাড়া পদ্যের কাব্যধর্মও তার আয়ত্তে। গদ্যের এই বিস্তৃত রূপদ্যুতি অবনীন্দ্রনাথে প্রকাশ পেয়েছে আশ্চর্য রকমে। উপরে যে দুটি বাক্যস্তবক উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি গদ্য অথচ লিরিক, অতীব উৎকৃষ্ট লিরিক। কাব্যের প্রাণ ও মেজাজ রচনা-সাজানোর প্রণালীর সঙ্গে (যথা, গদ্য ও পদ্য) সমাত্ম নয়। পদ্য যেমন কাব্যরসহীন হওয়া সম্ভব, অপর পক্ষে গদ্যে উদ্ভাসিত হতে পারে কাব্যের অপরূপ রূপ, যেমন হয়েছিল মোনালিসা-সংক্রান্ত পেটার-এর বিখ্যাত স্তবকটিতে। বাংলা গদ্যের ছন্দোবিচার আজো হয় নি যেভাবে ইংরেজি গদ্যের ছন্দোবিশ্লেষণ হয়েছে সেণ্টস্‌বেরির হাতে, কিন্তু অগভীর দৃষ্টিতেও অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে যে-পরিপাটি বা প্যাটার্ন, যে-তাল-ঝোঁক-মাত্রার চতুর সমাবেশ দেখতে পাই তা কাব্যধর্মী গদ্যের নিঃসংশয় লক্ষণ।

প্রগাঢ় অনুভূতি যাঁর বাক্‌ভঙ্গীতে কাব্যোজ্জ্বল তরলিত সোনার প্রবাহ বহিয়ে দিয়েছে, তাঁরই ভাষায় আবার সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও শ্লেষের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয় অথচ সে শ্লেষে নেই নির্মমতা। একটা সর্বস্পর্শী অদম্য কৌতুকপ্রিয়তা, একটা twinkling sense of fun, অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখায় ছড়িয়ে আছে। থাকবেই বা না কেন ? অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন 'আমার মনের শিশুয়ালি ছবি' (শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর : 'অবনীন্দ্র-চরিতম্', পৃ. ৭২)। লিখেছেনও নিজের শিশুয়ালি কল্পনা, সে-মন সে-কল্পনায় অনুরণিত হচ্ছে শিশুবয়সী চিত্ত আর তাদের চিত্ত যাদের বয়স বাড়লেও শৈশবের সহজ অনুভূতি শুকিয়ে যায় নি। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি', সমস্ত দৃশ্যমান ও জ্ঞানসাধ্য জগতে আনন্দ পরিব্যাপ্ত, সে-আনন্দবোধ অবনীন্দ্রনাথের লেখায় নিয়ত উপচে পড়ছে সহজ কৌতুকপ্রিয়তায়। বাংলা সাহিত্যের হিউমার বা কৌতুক রসের বিশ্লেষণবিৎ অবশ্যই অবনীন্দ্রনাথের কৌতুক উপভোগ ও অধ্যয়ন করবেন।

এই নিরন্তর কৌতুকবোধের কয়েকটি লক্ষ্যণীয় দৃষ্টান্ত 'ভূতপত্‌রীর দেশে' পাওয়া যায়। আজকাল যেসব 'সমাজ-সচেতন' সাহিত্যপাঠক চারি দিকে দেখা যাচ্ছে তাঁরা ইচ্ছা করলে অবনীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কৌতুকে সমাজব্যবস্থার মূল্যায়ন পাবেন, আমি আপাততঃ এসব দৃষ্টান্তের প্রাণচঞ্চল প্রসন্নতাতেই সন্তুষ্ট। 'ভূতপত্‌রীর দেশ' থেকে প্রায় এক পৃষ্ঠা নিচে উদ্ধৃত করছি—

কিচ্‌কিন্দে বাঁশি রেখে বলে উঠেছে—

Thank you Baboo. I earnestly hope and trust that the noble example of this most enlightened and public-spirited Kumar Krishna Kitchkinda of Orissa will be followed by all Maharajas, Rajas, Jamindars and other wealthy people – not only in India but throughout the length and breadth of Bengal, Bihar and Orissa—for the amelioration of self and friends and all the poor gentlemen at large like হারুন্দে কাসুন্দে বাসুন্দে ঝালুন্দে and মালুন্দে।

—কি বোলচো কিচ্‌কিন্দে ?

—কলির কথা !—

—ধন্যবাদ তোমাকে বাবু, আমি ব্যগ্রভাবে ভরসা এবং প্রত্যয় করিতেছি যে ঐ কুলীন উদাহরণ এই অধিকতম আলোকসম্পন্ন

সাধারণ ভূতবান উড়িষ্যার কুমারকৃষ্ণ কিচ্‌কিন্দার হইবে অনুগমিত সকল রাজা মহারাজা জমীদার ও যোত্রসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারায় নিজের বন্ধুর এবং হারুন্দে ইত্যাদির মত বেচারা গরীব এবং ছাড়া-পাওয়া ভদ্রগণের অপেক্ষাকৃত ভালো করিবার নিমিত্তে।

—এ কথার তো কিছু মাথা নেই কিচ্‌কিন্দে।

—আচ্ছা শোনো দেখি, এটার কিছু মানে পাও কি না— 'বঙ্গ-বিদর্ভনগর লৌহবর্ম্ম সমিতি।'— এটা আরো শক্ত? আচ্ছা দেখ দেখি এটা সহজ কি না— 'পূর্ণব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে পূর্ণরূপে নিষ্ঠাবিহীন জীব বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ দেখিয়া বহির্মুখী মনোবৃত্তির দ্বারা বাসনায় আবদ্ধ হইয়া সত্য হইতে বিমুখ হয় ও মিথ্যায় আশক্তি করতঃ কলির ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে—"

—ভূতপত্‌রীর দেশ, পৃ ৪১

যেমন চমৎকার 'বাবু ইংলিশ', ততোধিক চমৎকার তার বঙ্গানুবাদ! 'ব্যগ্রভাবে ভরসা এবং প্রত্যয়', 'কুলীন উদাহরণ', 'সাধারণ ভূতবান', 'ছাড়া পাওয়া ভদ্রগণ'— এমন সূক্ষ্ম তর্জমার তুলনা বিরল, ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেকার ইস্কুলের ছাত্র অথবা বাংলা সংবাদপত্রের সব্‌-এডিটারও এমন মেধাবী তর্জমা করতে পারতেন না। অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার কোণে কি এসব তর্জমাকারী উঁকি দিয়েছিল? 'বঙ্গ-বিদর্ভনগর লৌহবর্ম্ম সমিতি'— কিন্তু এ তো অনন্য নয়! আজাদী হিন্দুস্থানে এহেন গালভরা হিন্দী বুলি প্রত্যহই শ্রুতিগোচর হচ্ছে। 'পূর্ণপরব্রহ্ম'— ইত্যাদি বাঙলা ধর্মপুস্তকের অর্থহীন বাগাড়ম্বরের সুন্দর প্যারডি! তবু খেয়াল রাখতে হবে যে এসব এবং এতৎ-তুল্য উদাহরণে কথার খেলায় অবনীন্দ্রনাথের প্রাণপ্রচুর কৌতুকপ্রিয়তাই প্রমাণিত হয়, সে-কৌতুকে হুল নেই।

কথার খেলা অকৃপণভাবে ছড়িয়ে আছে তার লেখায়—

কোটাল, রাজার দপ্তরখানায় চট্ করে জাল লাগাও। আমি কি জালিয়াত? —একে তিন তিনে এক, পৃ ১০২

হুকুমও আসবে না, হাকিমও আসবে না, দরজাও খুলবে না, দর্জিও পাওয়া যাবে না? —একে তিন তিনে এক, পৃ ১১২

কৌতুকে তাদের আপত্তি নেই, যৌতুকেই আপত্তি। —মারুতির পুঁথি, পৃ ১৩

অঞ্জনা, তুমি নও অন্‌জনা; পবনের মনোরঞ্জনা হও। —মারুতির পুঁথি, পৃ ২৫

খুঁড়ে লঙ্কার ভিত্তি, তুমি রাখলে কিত্তি
বিত্তি লাভ করতে এসে পিত্তি পলো। —চাঁইবুড়োর পুঁথি, পৃ ৮০

"বলি ক' ছিলুম হয়েছে?"
আমি বল্লুম—"ছিলুম আবার কি? এই তো রয়েছি।" —চাঁইবুড়োর পুঁথি, পৃ ৬২

তাঁর উপমাতেও কৌতুকপ্রিয়তা:

হাই তুললেন— যেন একটা বোড়া সাপ মুখ ব্যাদান করে একটা খাবি গেলে। —রং-বেরং, পৃ ৮৯

ফর্দটা আগাগোড়া হিজিবিজি, যেন ফার্সিতে লেখা। কেবল কলমের খোঁচ, যেন মুরগির একরাশ ছেঁড়া পালক উড়ছে।

—রং-বেরং, পৃ ৮৯

এমন সময় মহোদর যেন লোম-পোড়া হুম্বার মতো ডাকছে। —চাঁইবুড়োর পুঁথি, পৃ ৯০

চুলোচুলিতে ঝড়ে যেন চালের খড় উড়ে নেড়া হয়ে গেল, দুই সতীনের সিঁথি ফাঁক। —চাঁইবুড়োর পুঁথি, পৃ ৬৯

যেন ভিজে মাটিতে ছুঁচোবাজির মতো ফুস্ করেই নিভলো। —একে তিন তিনে এক, পৃ ২

এলেন ময়ূরপঙ্খীতে ধুতি পরে যেন টিপু সাহেব। —মারুতির পুঁথি, পৃ ১৭

কথার মারপ্যাঁচ ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথের আশ্চর্য ক্ষমতা কত রকম মামুলি নিত্যনৈমিত্তিক ধ্বনিকে ছন্দে গেঁথে নেবার! রেলগাড়ি চলেছে, তো সে-চলার শব্দের ছন্দ হ'ল—

বড়দাড়ুলু চাড়লু নাইডু, বড়দাড়ুলু চাড়লু নাইডু, গড়্দাড়ুলু গুড়্দাড়ুলু— গাব, গুবাগুব, গাবুরগুবুর, গব্ গব্ গব্, আমতা জামতা, বুষু-মেতি হ্যঃ!

নিচে কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত হ'ল, প্রত্যেকটিতে ধ্বনি ও অর্থের নিখুঁত সাযুজ্য আর সর্বত্রই এই রঙ্গপ্রিয়তা—

দ্রম্ দদ্দড় ধ্রম্ ধদ্ধড়
কিপ্পোলো কিপ্পোলো
যমজয়ন্তীর তোপ্পোলো।
যম দণ্ড ভঙ্গ হলো
দশ খণ্ড হলো
কাল দণ্ড ফাল হলো, ফাল্লোলো। —চাঁইবুড়োর পুঁথি, পৃ ৬২

করিব খুন্— করিব খুন্
বায়ু কোণে ঐ শুন ভেঁপু বায় টাইফুং
হারিকান্ ঈশান কোণে
বিশাল বাজান বুম্ বুম্ বুবুং বুং
ঘূর্ণিৎবায়ু নৈঋত কোণে—
গম চূর্ণিৎ জাতা ফিরান— গুরু গুম্ ঘুরু ঘুম্। —মারুতির পুঁথি, পৃ ৮৯

এস করি হিড়িবিড়ি
হাঁড়ি পেট নখে চিড়ি— করি ফাঁক!
সেই পথে প্রাণপাখি বারায়ে যাক— তিড়িবিড়ি
ঝট্ হোক কাজ সাফ্,
ঢুকে যাক লাফালাফ— আড়ি ভাব, দন্ত কিড়িমিড়ি
আমরা এখানে পড়ে থাকি
দেশে উড়ে যাক প্রাণপাখি— যেখানে তার ইস্তিরী
বসে চিবোচ্ছে কাঁচা পাকা তিন্তিড়ী। —মারুতির পুঁথি, পৃ ৭০

আমার মনে হয় অবনীন্দ্রনাথের লেখা কেবল গদ্য নয় কেবল কবিতাও নয়, বরং এ-দুয়ের এক আশ্চর্য সমন্বয়। একই লেখক গদ্যকার ও কবি— এমন দৃষ্টান্ত যে-কোনো সাহিত্যে প্রচুর, সে-অর্থে আমি সমন্বয়ের উল্লেখ করছি না। একই লেখকের গদ্যে কাব্যের আভা বহমান, সে কথাও আমি ভাবছি না। অবনীন্দ্রনাথের রচনা বহুবার পড়ে' আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে অন্য লেখকদের গদ্য-সুর ও কাব্য-সুর স্বতন্ত্র, কোনো লেখার

আত্মায় গদ্য-স্বর, কোনো লেখার আত্মায় কাব্য-স্বর, অথচ অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় দুই স্বর অনায়াসে একই রচনায় একই প্রবহমান কথন-কারুতে মিশে যায়, একই রচনায় কাহিনীতে এমনকি পর পর বাক্যবন্ধে, গদ্য ও কাব্য পরস্পর-সম্পৃক্ত। উপরে মারুতির পুঁথি ৪৪ পৃষ্ঠা থেকে যে-স্তবকটি উদ্ধৃত করেছি তার সুকুমার কাব্য-কল্পনা ও বাক্‌ভঙ্গী নিঃসংশয়, অথচ তারই এক পৃষ্ঠা পিছনে নিরলংকার গদ্য স্বর—

দুবার 'ওয়াক্ থক্' করে একটা পটল তুলে বুড়ো দাদার দমবন্ধ— শিবনেত্র— অঙ্গ স্থির, অক্ষয় স্বর্গলাভ করলেন হুক্ষিয় রায়।

একই রচনায় এমন অনায়াসে এক স্বর থেকে আরেক স্বরে চলে যাওয়ার ক্ষমতা আমার কাছে বিস্ময়কর ও অনন্য মনে হয়, আর এ-ক্ষমতার কারণ, আমার ধারণায়, অবনীন্দ্রনাথের অতুলন কল্পনাশক্তি, পরম ঐশ্বর্যবান বাক্-ভাণ্ডার, যে-শক্তি ও যে-ভাণ্ডার যুগপৎ গদ্য ও কাব্য-ধর্মী। সাহিত্য-সমালোচনার কোনো বিশেষ মার্কা মেরে লেখক অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনা সম্ভব নয়, কেননা তাঁর লেখকচিত্ত একপন্থী নয়, কতকগুলি স্বতন্ত্র গুণের সমষ্টিও নয়, একাধারে একই মুহূর্তে বহু গুণের সম্মিলনক্ষেত্র। তাঁর লেখা আবেগপরায়ণ আবার বুদ্ধিদীপ্ত, শালীন ও আটপৌরে, তিনি কল্পনাচারী আবার প্রত্যক্ষনির্ভর, কৌতুকবিলাসী ও সমবেদনশীল, সব মিলিয়ে তিনি অসামান্য ভাষাশিল্পী, তাঁর লেখায় বিচিত্রের সংগতি।

৫

চাঁইবুড়ো থেকে দূরে সরে এসেছি তবুও কথকপ্রবর সারাক্ষণই অনতিদূর নেপথ্যেই আছেন। চাঁইবুড়ো কি অবন ঠাকুর স্বয়ং, না জন কয়েক আদর্শ চরিত্রের সমষ্টি যে-সমষ্টিতে তাঁর নিজ ব্যক্তিত্বও মিলেছে, পূর্ণস্ফূর্ত হয়েছে তাঁর কথন-কারু ?

'মারুতির পুঁথি' ও 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' দুইয়েরই ভিত্তি রামায়ণ-কাহিনী কিন্তু কথক ঠাকুর রচনা করেছেন নব রামায়ণ, যেমন মার্ক টোয়েন লিখেছিলেন রাজা আর্থারের নূতন কাহিনী। এ-কাহিনীতে উপস্থিত রামায়ণোক্ত অনেক চরিত্র— পবনদেব অঞ্জনা হনুমান অঙ্গদ জাম্বুবান রাবণ মন্দোদরী সূর্পনখা এবং আরো অনেকে, অথচ এ-কাহিনী সুপরিচিত রামায়ণ-কাহিনী নয়, এ-কাহিনী বাল্মীকি তুলসীদাস অদ্ভুতাচার্য কৃত্তিবাস জানেন নি। চাঁইবুড়োর পরিবেশনে পুরনো আখ্যান পেয়েছে তির্যক রূপ। বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের রাজপথ তাঁদেরই থাক, উর্বরমস্তিষ্ক চাঁইবুড়ো নতুন রাস্তা তৈরি করে নিয়েছেন, সে-রাস্তা খুব চওড়া সড়ক নয়, বরং আঁকাবাঁকা গলি ; তবুও একান্তই চাঁইবুড়োর রাস্তা। এই নতুন রামায়ণে ন্যাচরল্ এবং সুপারন্যাচরল্, লৌকিক এবং অবলৌকিক দুই স্তরের ঘটনা মিশেছে। অবলৌকিক ঘটনা যে থাকবে সেটা আশ্চর্য নয় পৌরাণিক কথার শিকড় সব সাহিত্যেই অবলৌকিকে। আজকের দিনে কেউ যদি অবলৌকিককে আষাঢ়ে গল্প বলে উড়িয়ে দিতে চান তিনি নিম্নোদ্ধৃত কথোপকথন পড়ুন :

সম্পাতি বল্লেন— "আমি চক্ষে দেখিনি, কই যেরূপ কয়েছেন অগস্ত্য মুনি।"
অঙ্গদ শুধালেন— "অগস্ত্য মুনিটি কে ?"
সম্পাতি বল্লেন— "পান করলেন যিনি এক গণ্ডূষে সমুদ্র জল।"
জাম্বুবান বল্লেন— "তার পর ?"
সম্পাতি বল্লেন— "তারপরে উদ্গার— তিমি তিমিঙ্গীল সুদ্ধ যেমন তেমনি লোনাজল।"

জাম্বুবান বল্লেন— "আশ্চর্য ব্যাপার! বিশ্বাস না হয় শুনে কানে!"
সম্পাতি বল্লেন— "ব্রহ্মতেজে কি না হয়?— বিস্ময় কি এখানে? ব্রহ্মতেজে পেলো রাবণ দশটা মুণ্ড বিশটা হাত!"

—মারুতির পুঁথি, পৃ ৯১

তা তো বটেই, ব্রহ্মতেজে কী না হয়! অতিপ্রাকৃত ঘটনা বাল্মীকিতেই প্রচুর, অবন ঠাকুরও না হয় আরো দু-চারটে অমনধারা ঘটনার অবতারণা করলেন! ভগবৎ বিশ্বাসে মূক যদি বাচাল হয়, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, তা হলে স্বরসংগত কাব্যপ্রত্যয়ে কেন অগস্ত্যের উদ্গারে তিমিঙ্গিল বেরবে না, কেন অবলৌকিক ঘটনায় ভুরু কুঁচকবো? খেয়াল রাখতে হবে যে চাঁইবুড়োকথিত জগৎ খুব মহাকাব্যোচিত বীররসের জগৎ নয় যদিচ পবন এবং গরুড় একদা তুমুল লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন আর মাস্টারমশাই মতং মুনির বন্ড়িতে যখন মত্ত হস্তীর আবির্ভাব হয়েছিল আর গুরুপত্নী ঝুলছিলেন হাতীর লেজ ধরে তখন বীর হনুমান 'মাতঙ্গের করিলেন অন্ত।" মোটের উপরে এ জগতের অনেকটাই নেহাৎ ঘরোয়া। এখানে ব্রহ্মা ঠন্ঠনের বিদ্যেসাগরী চটি পরেন, পবনদেব রাবণের হাওয়াগাড়িতে প্রমীলাসুন্দরীকে দু বেলা হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যান, ইন্দ্রাণী চন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী ঈশানীতে জটলা করেন তাঁদের ভতার। নাকি বানরীবিবাহের সংকল্পে মেতেছেন। এখানে নারদ করেন ঘটকালি (কেউ না কেউ তো এ কার্য করবেই), আর পাঁচজন শাশুড়ির মতো দেবমাতা অদিতিও বৌমাদের আচরণে ক্ষুব্ধ আর কনিষ্ঠ পুত্রের বিয়ের প্রস্তাবে জিজ্ঞেস করেন, "বলি, দেওয়া-থোওয়ার কি শুনি?" এ-জগতে পবনদেবের রোমান্টিক বায়বীয় বিয়ে ছাড়াও রাক্ষসগণযুক্তা তরুণী সূর্পণখার মাংসরসালো বিয়েও আছে। কনে দেখা হবে, 'সূর্পণখা সেজেগুজে উঁকি দিলেন পর্দার আড়াল থেকে— বাবুইবাসা-বিবিয়ানা-খোঁপা পিঠে দুলছে'। কনে আমাদের বড়ই লজ্জাবতী, কিছুতেই চোখ তুলে চাইবে না। এ-জগতে শ্বশুররা কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ। পরলোকপ্রাপ্ত হক্ষিয় রায় নূতন রাজ্যে আস্তানা গাড়ার জন্য যে-জামাইয়ের বাড়ি যান সেখানেই দেখেন অবহেলা অথবা সরাসরি প্রবেশ-নিষেধ। সত্য বটে ওঁর জামাইয়েরা সবাই দেবতা, কিন্তু দেবগৃহেও ইদানীং ইয়োরোপীয় পন্থায় in-lawগণ অর্থাৎ শ্বশুরশাশুড়িগণ মর্যাদা হারিয়েছেন। এখানে পড়ুয়া ছাত্ররা গুরুর আবির্ভাব-সূচনায় পড়তে সুরু করে—

ক'য়ে কলা, খ'য়ে খড়্গা, গ'য়ে গুঁতা, ঘ'য়ে ঘুষা, ল্যাজ গোটা পাগুড়ি বাঁধা (ঙ) উঙা অনুস্বর, বিসর্গ হক্ষিয় তৎ-সদ্গুরু দণ্ডবৎ ক্ষেমা কুরু— নাকে খৎ।

— মারুতির পুঁথি, পৃ ৩৭

হনুমান এগোচ্ছেন কিষ্কিন্ধ্যার অভিমুখে, পথ শুধোলেন জনৈক পথিক মর্কটকে (স্পষ্টতঃই সে-মর্কট উৎকলনিবাসী), উত্তর পেলেন— 'কড়কৌচী? আগবাঢ়— সহড় কিষ্কিন্ধ্যা নিন্দাড় নয়— আগবাঢ়, আগবাঢ়।' সুগ্রীবের পূর্ববঙ্গ নিবাসী জামাই "তাই তাই" (এ নাম পাওয়া যাবে না বাল্মীকিতে তুলসীদাসে কৃত্তিবাসে, এ নাম অবন কথকের নিজস্ব সৃষ্টি) স্বদেশীয় ভাষায় বলছে:

কইবো কারে দ্যেশে যাইতে প্রাণ যে কেমন করে,

..

আপন গাঁয়ে বৈসা করতে ছেলাম বাদশাই,
খাই ফুল বড়ি তিন্তিড়ি অম্বল

শ্বশুরা ধাঙ্গড় সুখে রইতে দিল না ঘরে
খোঁজ নাই এখন জামাইডা না খায়্যা মরে। —মারুতির পুঁথি, পৃ ৭২

নতুন রামায়ণের রাজ্যের বিধবা সূর্পণখাকে একাদশী করতে হয়—যাই হোক বামুনের মেয়ে তো!—ঘোর শাক্ত রাবণ বিষ্ণুর নাম সইতে পারে না, আর রাবণের ধোবা রজকদৈত্য রাজার আলখাল্লা লুঙ্গী ধোলাই করে।

এ-জগতের সঙ্গে পরিচিত নয় কোন্ বাঙালী? বাঙালীর ঘর-গেরস্তালি আচার ব্যবহার ধ্যান ধারণার সঙ্গে খাপ খাইয়ে রামায়ণোক্ত চরিত্রগুলিকে ছেঁটে নেওয়া হয়েছে। অবন ঠাকুর রামায়ণী কথাই বলছেন বটে কিন্তু বাল্মীকির মহাকাব্যে যে-জীবনাদর্শের গাঢ় নির্যাস, কৃত্তিবাসে যা তরলীকৃত, অবন ঠাকুরে সে আদর্শ আরো তরলীকৃত। কৃত্তিবাস থেকে অবন ঠাকুর অবধি একই ধারা—প্রাচীন ভারতের বীররসসঞ্জীবিত চরিত্রাদর্শ বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের সঙ্গে মাপসই ক'রে নেওয়া। এখানে শুনছি বটে রামায়ণীকথার গান, তবে নিচু পর্দার গান। সারাক্ষণ অবন কথক নিচু পর্দায় নিজকে আবদ্ধ রেখে রঙ্গ তামাশা করছেন, বর্ণনা করছেন, কথার ছবি আঁকছেন, সুরের ছকে বাঁধছেন কথাকে, কখনও তাঁর কণ্ঠস্বর পর্দা লঙ্ঘন করছে না। এ এক আশ্চর্য শিল্পসংযম!

'মারুতির পুঁথি' ও 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'তে চরিত্ররা দু রাজ্যের—একটি আখ্যানের রাজ্য, আরেকটি আখ্যানকারের রাজ্য। এক রাজ্যের অধিবাসী হনুমান-রাবণ-সূর্পণখা প্রমুখ রামায়ণী চরিত্র, আরেক রাজ্যে বাস করে আখ্যানের স্রষ্টা ও শ্রোতারা। চাঁইবুড়ো স্বয়ং তো আছেনই, তা ছাড়া আছে বেঙাচির বাপ, চাংড়াবুড়ি, কাবুলী দুলুলি, আর আছে ঢেলারাম—চাঁইবুড়োর শাকরেদ—মাঝে মাঝে গরহাজির গুরুর অ্যাকটিনি করে যায়। আখ্যানকারের রাজ্যে চাঁইবুড়ো অবশ্য একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাঁর চারিধারেই জ্যোতিশ্চক্র প্রদীপ্ততম। তাঁর সম্বন্ধে আমরা অনেক জানি। বড়ই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এই কথকঠাকুর। "আষাঢ়ারান্ত বেলায় শাস্ত্রমত তেল কালি আর লঙ্কার ধুনো দিয়ে শ্লেষ্মা শোধন ক'রে তবে চাঁইবুড়ো পোড়া লঙ্কার পুঁথি পাঠ সুরু করলেন।' আসনগ্রহণের পূর্বে বলেন, 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে', আসনত্যাগের সময় বলেন, 'মধুসূদন, মধুসূদন।' পুঁথিপাঠের পূর্বে গণ্ডূষ করতে হয় আর মন্ত্র পড়তে হয়:

হুম্ গণেশ চিৎপটাং ততঃ মারুতি চিৎপটাং
আকাশে চিৎপটাং বাতাসে চিৎপটাং
জলে জলে কাদা-মাটিতে চিৎপটাং॥ —মারুতির পুঁথি, পৃ ১

তিনবার আচমন করতে হয়, চারিদিকে শ্রোতাদের গায়ে শান্তিজল প্রক্ষেপ করে পুঁথির একখানি গরাণ-কাষ্ঠের পাটা চিং করে' রেখে পরে কথা শুরু করতে হয়। একাদশীর দিন যবের ছাতু খেয়ে বচকরণ করে' কথারম্ভ করেন, নিত্য গঙ্গাস্নান করেন। সচরাচর কথকের থালায় জমে সিকি দুয়ানি আধুলি কিন্তু একদিন মাত্র একটি হরীতকী ও একটি আমলকী দেখে 'ওল কচু মান, তিনই সমান' বলে' বুড়ো কথারম্ভ করেন কেননা মাত্র আগের দিনই তিনি মানকচুর সন্ধানে মাণিকতলার বাজারে ছুটেছিলেন। কথকতার কালে যদি কখনো পাতা উল্টে দেখেন বাকিটুকু পুড়ে গেছে, তখন উপস্থিত বুদ্ধি মতো টীকা করতে হয়। কখনো বা কথকতায় ত্রুটি হয়ে যায়: কোথায়

রামচন্দ্রের শীল আংটি নিয়ে তবে মারুতি যাবেন লঙ্কায়, না চাঁইবুড়ো আংটি ছাড়াই তাঁকে সাগরলঙ্ঘনের পথে পাঠিয়েছেন! ভুল ধরা পড়তেই ধর্মভীরু কথকঠাকুর স্বয়ং ছুটেছেন শ্রীহনুমানের পিছু পিছু তাঁকে আংটি পৌঁছে দেবার সদুদ্দেশ্যে! শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। মাঝে-মধ্যে দুয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে' যায় যেমন ঘটেছিল যখন চাঁইমশায়ের মেধাবী ভৃত্য কৃপানাথ পুঁথির কয়েক পাতা পুড়িয়ে চায়ের জল গরম করেছিল আর আরশোলা তাড়িয়েছিল বাকি পাতা পুড়িয়ে ঘরে ধোঁয়া দিয়ে। তারপরে রীতিমত শ্রাদ্ধশান্তি করতে হ'ল পুঁথির, খণ্ডিত পুঁথির শোধন করতে হ'ল "মৃগমাংসের অভাবে পাঁঠার মুড়োসমেত কচি মাংসের ঝোল এক খোরা এবং তদুপযুক্ত পলান্ন ভক্ষণ ক'রে।' মাঝে মাঝে কথকঠাকুরকে আবার একটু 'ড্রামা' করতেও হয়। মারুতির পুঁথিপাঠ যখন শুরু হবে, মারুতির নাম স্মরণান্তর—

ভাব লেগে চাঁইবুড়ো যেন মুর্ছিত হন, এমনি ভাব দেখিয়ে আকাশে চক্ষু তুলে বল্লেন— "ঐ তিনি এসে গেছেন—

'মারুতির পুঁথি পাঠ হইবে যে-স্থানে
তাঁহার উদয় হইবে সে-স্থানে ॥'

সবাই আকাশের পানে চায়— মাথার পরে চাঁদোয়া অল্প দুলছে, পেঁপে পাতার ছাতা যেমনি—হেলে না দোলে না। সকলে একটু বিচলিত দেখে চাঁইবুড়ো বল্লেন— "যদি বা তিনি এসে থাকেন তো সুক্ষ্ম শরীরে শ্রোতাদের মধ্যে নিশ্চয় এসেছেন। নিজের প্রসঙ্গ শ্রবণ করতে তো তিনি প্রকাশ্য হতে পারেন না। অতএব বিলম্বেনালম্—" —মারুতির পুঁথি, পৃ ২

চাঁইবুড়ো যে অবনীন্দ্রাংশী আমার এ ধারণার আরেক হেতু এই নাটুকেপনা। অবন ঠাকুর ছিলেন চমৎকার showman, কুশলী মঞ্চাধ্যক্ষ। তাঁর সম্বন্ধে প্রবোধেন্দুনাথ বলেছেন, 'শুধু পোটো নয়, একেবারে নাটুকে', আর 'আপন কথা'য় অবনীন্দ্রনাথ নাটুকে ঢঙে বলছেন—

শিশু-সাহিত্যসম্রাট যাঁরা এসেছেন এবং আসছেন তাঁদের জন্যে রইলো বাঁ হাতে সেলাম; আর ডান হাতের কুর্নিশ রইলো তাদেরই জন্যে যারা বসে শোনে গল্প রাজা-বাদশার মতো···ঐ তারা যারা আমার মনের সিংহাসনে আলো করে এসে বসে, তাদেরই আদাব দিয়ে বলি, গরীব পরবৎ সেলামৎ অব্ আগাজ্ কিস্সেকা করতা হুঁ, জেরা কান দিয়ে কর শুনো।

'মারুতির পুঁথি' ও 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'তে তিনি full-dress dramaর বিস্তৃত নাটকীয়তা অবলম্বন না করে আশ্রয় নিয়েছেন কথকতার যেখানে কথক হিসাবে তিনি বসেছেন মঞ্চে বা বেদীতে অথবা অন্ততঃ পিঁড়েয়, শ্রোতারা বসেছে অনতিদূরে মাদুর অথবা শতরঞ্জি বিছিয়ে, আর তিনি বাক্চাতুরী, অঙ্গভঙ্গী আর দৃষ্টির পরিবর্তনশীল উদ্দীপনার সাহায্যে সৃষ্টি করছেন নাটকীয় আবহাওয়া। নাটুকে অবনীন্দ্রনাথেরই এক অংশ কথক অবনীন্দ্রনাথে।

এ সব তো চাঁইবুড়োর নানারকম অভ্যাস বা ধরণ। তাঁর সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়ো কথা তাঁর নিয়ত-স্ফূর্ত কল্পনাশক্তি। কল্পনার বাইরে নয় তাঁর গল্পজগৎ, রিয়ালিস্টিক ব্যাপার নিয়ে তিনি ব্যস্ত নন।

'এখন গল্প শুনবে তো তল্প নাও, জল্পনা রাখ, কল্পনা কর— অল্পসল্প।'

— 'কল্পনা করতে তো আমি জানিনে চাঁইদাদা।'

— 'তা ঠিক, তুমি যে আজকালকার ছেলে— হিষ্টিরি পড়ে কথনো কেউ কল্পনা করতে পারে?'

— 'তবে?'

— 'তবে আবার? ছাখো অবুবাবু এই আমি সেকালের বুড়ো— হিষ্টিরি-পড়া মানুষ নয়, তাই কল্পনা করতে আমার ঠেকে না একেবারেই।'

— 'চাঁইদাদা, তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার ঘুম পেয়ে এল।'

— 'ঘুম পায় ঘুমোবে ; কিন্তু খবরদার হাই তুলোনা— তাহলেই আমার কল্পনা আর চলবে না, রাস্তার মাঝে পা পিছলে একদম আলুর দম হয়ে যাবে।— তখন কী করবে অবুবাবু ?'

— 'মুখে ভরে দেবো ছুট মাসির ঘরে।'

— 'বটে বটে, তুমি আমারই একজন বটে— কল্পনা করার শক্তি আছে দেখছি তোমার কিছু-কিছু।' —রং-বেরং, পৃ ২৮

এই সঙ্গে মনে পড়ে সিন্ধবাদের উক্তি : 'সব সত্যি বলতে হ'ল হুজুর, একটি মিথ্যা কথা দিয়ে এবারকার গল্পটা সাজাতে পারলুম না।' সত্যি মিথ্যে এগুলো খাঁটি শিল্পীর কাছে মূল্যবান নয়, আসল কথা হ'ল গল্প সাজানো গেল কিনা। বিষয়বস্তুতে শিল্প নয়, শিল্প সাজানোতে। কথাশিল্পের সত্য সাজাবার সত্য, গল্প সাজাবার ক্ষুণ্ণতা কথাশিল্পের মিথ্যা।— এই ধ্রুব শিল্পদর্শন সিন্ধবাদের, চাঁইবুড়োর, আর তাদের স্রষ্টা অবন কথকের।

৬

শিল্প সম্বন্ধে— শুধু কথাশিল্প নয়, তাঁর মহত্তম কর্ম চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও— অবনীন্দ্রনাথের মতামত ও প্রত্যয় হয়তো অদূর ভবিষ্যতে কোনো শ্রদ্ধাবান রসবেত্তা অধ্যয়ন করবেন। আপাততঃ তাঁর অভিমত ও উক্তিগুলি ছড়িয়ে আছে বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা ছাড়াও এখানে সেখানে। শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের 'অবনীন্দ্র-চরিতম্' এ হেন অনেক উক্তির মূল্যবান ভাণ্ডার। জানি না অবনীন্দ্রনাথের মুখের ভাষা কতটা হুবহুরকমে ধৃত হয়েছে এ-গ্রন্থে, অন্ততঃ অভিমতগুলি যে গুরু থেকে সরাসরি শিষ্যের লেখনীতে রূপ নিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ-গ্রন্থোক্ত অভিমতগুলি অবশ্য চিত্রশিল্প সংক্রান্ত কিন্তু যেহেতু শিল্পের প্রাণ অভিন্ন যদিচ তার রূপ বহুধা, আর অবনীন্দ্রনাথ যেমন চিত্রশিল্পী কথাশিল্পীও তেমনি, সেজন্য এ-অভিমতগুলি সাহিত্য পাঠকেরও প্রণিধানযোগ্য।

ভারতবর্ষের চোখ…রূপ দ্যাখে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। আমরা মডেলকে পেতে চাই রসের ঘরে, ভাবের ঘরে ; আর পশ্চিমীরা মডেলকে পেতে চান চামড়ার ঘরে, মাসলের ঘরে। —অবনীন্দ্র-চরিতম্, পৃ ৫৬

র‍্যাফেলের মা-ছেলের ছবিখানাই ধর। যীশুর মাকে কি অমনি দেখতে ছিল ? না, এই ছবিটিই মেরির পোর্ট্রেট ? অনেকেই তো মাদার এণ্ড চাইল্ডের ছবি এঁকেছেন, কিন্তু র‍্যাফেলই পারলেন মাতৃভাবটুকু ফোটাতে। —পৃ ৬১

ঐতিহাসিকের কারবার নিছক ঘটনাটি নিয়ে, ডাক্তারের কারবার নিখুঁত হাড়মাসের anatomy নিয়ে, আর আর্টিস্টের কারবার অনির্বচনীয় অখণ্ড রসটি নিয়ে। আর্টিস্টের কাছে ঘটনার ছাঁচ পায় না রস, ছাঁচ পেয়ে বদলে যায় ঘটনা ; হাড় মাসের ছাঁচ পায় না শিল্পীর মানস, কিন্তু মানসের ছাঁচ অনুসারে গড়ে ওঠে সমস্ত ছবিটার হাড়-হদ্দ, ভিতর-বাহির। —পৃ ৬২

ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক, ডাক্তারের মাপকাঠি কায়ামূলক, আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া-মূলক। —পৃ ৬৩

আমি নন্দনতাত্ত্বিক নই, শিল্পী তো নই-ই, আমার অননুশীলিত বিবেচনায় উপরোক্ত মতগুলি সিন্ধবাদ ও চাঁইবুড়োর যে-মত ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি তা থেকে পৃথক নয়। সর্বত্র আমি একই প্রত্যয়ের প্রকাশ পাচ্ছি যে শিল্পের সত্য আর লৌকিক সত্য প্রভিন্ন, প্রভিন্ন এই অর্থে যে দুই সত্যের দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা,

সুতরাং তাদের ক্ষেত্র স্তর পরিধি সবই আলাদা। 'মানুষী মূর্তির অ্যানাটমি দিয়ে মানস-মূর্তির অ্যানাটমির দোষ ধরতে যাওয়া মূর্খতা।' লৌকিক জগতের ও শিল্পসৃষ্ট জগতের সত্য এক স্তরের নয়। অবনীন্দ্রনাথের উক্তি শতবার উদ্ধৃত করলেও অত্যুক্তি হবে না: 'ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক··আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া-মূলক।' সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার কথাই সিন্ধবাদ বলেছে, সে মায়াই অবনীন্দ্রনাথের লেখায়। অত্যন্ত ঘরোয়া, অতিশয় পরিচিত বস্তু বা চরিত্র বা ঘটনা নিয়ে যে-কাহিনী তিনি রচনা করেছেন, সে-কাহিনীর ইশারা লোকাতীত। হারুণ-আল্-রশীদ্, সিন্ধবাদ, রাবণ, হনুমান, চাঁইবুড়ো, এরা কোনো লৌকিক সত্যে স্থিত কি না, ইতিহাস বলেছে কি না এদের কথা অথবা এরা কোনো নামজাদা বইয়ের পাতা থেকে নেমে এসেছে কি না সে কথা নেহাতই অবান্তর, আসল কথা তারা মানসমূর্তির অনির্বাণ প্রাণ পেয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে, তারা সাধারণ নয়, অ-সাধারণ, অদ্ভুত। প্রবোধেন্দুনাথ বলছেন ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'চিত্র' শব্দটির অর্থ 'অদ্ভুত' কিন্তু অদ্ভুত মানে উদ্ভট নয়, মহৎ, পূজনীয়। নিশ্চয় বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের অথরিটিতে অদ্ভুত মানে তা-ই, কিন্তু প্রাকৃত বাঙলার সংস্কৃতি যে-গ্রাম্যখেলা খেলেছে শব্দটি নিয়ে (অর্থাৎ মহত্ত্বজ্ঞাপক অর্থকে নামিয়েছে সৃষ্টিছাড়ায়, উদ্ভটে), সে-খেলা কি নিতান্তই ভুল, নিতান্তই দূষণীয়? কোনো শব্দের অর্থই আদি ও অকৃত্রিম নয়, প্রবহমান ভাষায় শব্দের যে নব নব সংজ্ঞার্থ সূচিত হয় তা অবজ্ঞেয় নয়। আর, আমার বিনীত বিবেচনায়, অবনীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি যেমন প্রাকৃত অর্থে অদ্ভুত তেমনি বৈয়াকরণের অর্থেও অদ্ভুত, যেমন সৃষ্টিছাড়া অলৌকিকতায় প্রদীপ্ত তেমনি মহনীয়, পূজনীয়। কবিকর্ম সম্বন্ধে আরিস্টটল বলেছিলেন—

The poet's function is to describe, not the thing that has happened, but a kind of thing that might happen, i.e., what is possible as being probable or necessary—পোয়েটিক্স, ৯ অধ্যায়।

যে কল্পনা-সম্ভব জগৎ নিয়ে কবির কারবার সে-জগৎ মহত্ত্বেরই জগৎ, যা 'সংহননীয় বা বর্দ্ধনীয়, মহনীয় বা পূজনীয়, শ্রবণীয় ও দর্শনীয়', সে-মহত্ত্বকেই গ্রীকরা বলতেন Spoudaiotes, কবি স্পেন্সার্ বলেছিলেন Magnificence, আর ম্যাথিউ আর্নল্ড বলেছেন High seriousness, সে মহত্ত্ব অবনীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্যে বিদ্যমান। তাঁর কল্পনায় আমি দেখতে পাই অদ্ভুতের আভা, কিছুটা সৃষ্টিছাড়া তো বটেই। অদ্ভুত শুধু এই অর্থে নয় যে তাঁর কোনো কাহিনীর অকুস্থলের নাম উদ্ভুট্টির চর, বরং এই অর্থে যে তাঁর লেখায় ফ্যান্টাসি বা অতিকল্পনার পরম প্রকাশ। তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন দূরবীনের উলটো পিঠ দিয়ে জগৎটাকে দেখতে। উলটো পিঠ দিয়ে দেখলে fact হয়ে যায় fantasy, মিড্ সামার নাইট্স্ ড্রিম্-এর জগৎ উদ্ভাসিত হয়। বাঙলার মহত্তম ফ্যান্টাসি-লেখক অবন ঠাকুর।

ভাষাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীঅজিত দত্ত

অবনীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট। তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। এই দশ বৎসরের কনিষ্ঠতা অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার সম্যক্ বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এত বেশি ছোট ছিলেন না যে, পূর্ণবিকশিত রবীন্দ্রপ্রতিভার দীপ্তি তাঁর স্বকীয় প্রতিভার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে ; অথচ রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করবার মত এবং তাঁর প্রতিভার তাৎপর্য হৃদয়ংগম ক'রে তার ইঙ্গিত আত্মস্থ করবার মত সশ্রদ্ধ ব্যবধান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ছিল।

অবনীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট প্রতিভা তার বিকাশের প্রধান পথটি সহজেই আবিষ্কার করতে পেরেছিল চিত্রশিল্পে। অবনীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উপযোগী বাহন ছবি আঁকা— যেখানে রেখা ও বর্ণের মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান জগতের রূপরসগন্ধস্পর্শের অন্তরালে স্থিত সৌন্দর্যের মর্মকথাটি শিল্পী-স্রষ্টার তুলিতে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যে ভাষারচনায় ও সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রায় অনুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিলেন, তার কারণ, আমার মনে হয়, অবনীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টি সৌন্দর্যের সেই মূল তত্বটি আবিষ্কার করেছিল যা সকল ললিতকলা ও শিল্পের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে। আসলে, চিত্রাঙ্কনের সূক্ষ্মতম ও অন্তরতম শিল্পকৌশলটি যখন অবনীন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন তখন ভাষারচনার মর্মকথাটিও তাঁর সহজায়ত্ত হয়ে গেল। সাহিত্য -প্রবণতা ও -প্রীতি এবং লোকোত্তর কল্পনাশক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি জন্ম থেকেই লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তিনি তাঁর চিত্রবিদ্যা-শিক্ষালব্ধ শিল্পদৃষ্টি ও শিল্পকৌশল সাহিত্যে প্রয়োগ করবার প্রেরণা পেলেন। অবনীন্দ্রনাথ যে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পস্রষ্টা এ কথা সর্বজনবিদিত ; কিন্তু তাঁর মধ্যে চিত্রশিল্প ও সাহিত্যশিল্প দ্বিবিধ সৃষ্টির প্রতিভা যে কি আশ্চর্যরূপে সমন্বয় লাভ করেছিল, ভাবলে অবাক হতে হয়।

বহুমুখী প্রতিভা জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের কথা তো বিশ্ববিদিত। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ গদ্য ও কাব্য -রচনায় প্রতিভার যে পরিচয় দিয়েছিলেন তার উপযুক্ত আলোচনা এখনো হয় নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদিও সাহিত্যচর্চাতেই অধিকাংশ মনোনিবেশ করেছিলেন, তবু তাঁর আঁকা ছবিগুলি দেখে বিলাতে শিল্পী-সমালোচকেরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রের পিতা গুণেন্দ্রনাথের শখ ছিল ছবি আঁকার, তিনি আর্ট স্কুলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গেই শিক্ষানবিশি করেছিলেন। তা ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির গান-বাজনা-অভিনয় প্রভৃতি সকল প্রকার উদ্যোগের প্রাণ ও প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "গুণুদাদা বড় বড় কল্পনায় আমোদ পাইতেন"। নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়ের যে উৎসাহ ও পরিবেশ জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে গড়ে উঠেছিল তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে চিত্রশিল্পপ্রতিভা সাহিত্য ও সৌন্দর্য -প্রীতি, অনন্যসাধারণ কল্পনাশক্তি, সুরজ্ঞান এবং নাট্যোৎসাহ লাভ করেছিলেন। এর প্রত্যেকটি গুণ তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে তাঁর রচনাকে একটি অসাধারণত্বে মণ্ডিত করেছে।

গুণেন্দ্রনাথ শৌখিন মানুষ ছিলেন। তাঁর ছিল পশুপাখির শখ, গাছ-গাছড়া-ফুলের শখ, আসবাব-পত্রের শখ। আর তাঁর শখ ছিল গানবাজনার, নাটকের, ছবি আঁকার। তিনিও শিল্পী ছিলেন, কিন্তু তিনি জীবনকে শিল্পশ্রীমণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন, শিল্পরচনার কোনো বিশেষ পদ্ধতির মধ্যে নিজের প্রতিভাকে নিবদ্ধ করতে চান নি। অবনীন্দ্রনাথেরও ছিল শিল্পের কোনো বিশেষ পদ্ধতির গতানুগতিকতার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করতে অনিচ্ছা। শিল্পসৃষ্টিকে তাই তিনি বর্ণনা করেছেন শখ বলে। প্রথাগত শিল্পচর্চা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি জানতেন স্বকীয়তাই সকল সৃষ্টির প্রাণ। যা মৌলিক নয়, যা বিশেষভাবে শিল্পীমানস, শিল্পীর দৃষ্টিকে উদ্‌ঘাটিত করে না, তাকে সৃষ্টি বলা যায় কি করে? সে তো শুধু বাঁধা পথের অনুসরণ, বাঁধা বুলির অনুকরণ। তাই তিনি বলেছেন—

শিল্প জিনিসটা কী, তা বুঝিয়ে বলা বড়ো শক্ত। শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারে শিল্প সৃষ্টি করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে, গাইতে, নাটক লিখতে— যাই বলো।· ইচ্ছে হল পাকা বাজিয়ে হব, যাকে বলে ওস্তাদ।· ·এসরাজ বাজাতে একেবারে পাকা হয়ে গেলুম। চমৎকার টিপ দিতে পারি এখন। শখ আমাকে এই পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল।· ·দেখি সেই মামুলি গৎ সেই মামুলী সুর বাজাতে হবে বারে-বারে।· ·নতুন সুর বাজাতে পারতুম না, তৈরি করবার ক্ষমতা ছিল না। অথচ বারে-বারে ধরা-বাঁধা একই জিনিসে মন ভরে না। সেই ফাঁকটা নেই যা দিয়ে গলে যেতে পারি, কিছু সৃষ্টি করে আনন্দ পেতে পারি। হবে কী করে— আমার ভিতরে নেই, তাই ভিতর থেকে এলো না সে জিনিস। ভাবলুম কী হবে ওস্তাদ হয়ে, কালোয়াতী সুর বাজিয়ে। আমার চেয়ে আরো বড় ওস্তাদ আছেন সব— যাঁরা আমার চেয়ে ভালো কালোয়াতী সুর বাজাতে পারেন। কিন্তু ছবির বেলা আমার তা হয় নি। বড়ো ওস্তাদ হয়ে গেছি এ কথা ভাবি নি— আমিও তাদের সঙ্গে পাল্লা দেব, ছবির বেলায় হয়েছিল আমার এই শখ। ছবির বেলায় এই শখ নিয়ে আমি পিছিয়ে যাই নি কখনো। —ঘরোয়া

অবনীন্দ্রনাথের এ কথাগুলি শুধু ছবি আঁকার কথা নয়, এ কথাগুলি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টির স্বরূপ প্রকাশ করে।— সে শিল্প তুলিতে আঁকা ছবিই হোক, কিংবা কলমে আঁকা ভাষাই হোক। অবনীন্দ্রনাথের আশ্চর্য বিচিত্র গদ্যরচনাগুলি যখনই পড়ি তখনই মনে পড়ে তাঁর পৈতৃক ও পারিবারিক উত্তরাধিকার, তাঁর সাহিত্য-রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা, তাঁর ভাষাশিল্প ও চিত্রশিল্পের সাদৃশ্য, এবং সর্বোপরি তাঁর সেই আশ্চর্য মুক্তপ্রাণ, যা সকল শিল্পপদ্ধতির বন্ধন খুলে, সকল শিল্পরীতির সেই দুর্লক্ষ্য 'ফাঁকটা' আবিষ্কার ক'রে তার মধ্য দিয়ে 'গলে যেতে' পারত। তাই অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনার আলোচনায় এ ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন হল।

ভূমিকা হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকায় দিব্যদৃষ্টিলাভের কাহিনী অবনীন্দ্রনাথেরই ভাষায় আর একটু বলি—

আমারও ইচ্ছে হল ছবি আঁকা শিখতে হবে।· ·গিলার্ডি আর্ট স্কুলের ভাইসপ্রিন্সিপাল, ইটালিয়ান আর্টিস্ট—।· ·ছবি আঁকার হাতে খড়ি হল সেই ইটালিয়ান মাস্টারের কাছে। কিছুদিন যায়, দেখি, তাঁর কাছে হাতে খড়ির পর বিদ্যে আর এগোয় না।· · বাঁধা গতের মত তুলি দিয়ে ধীরে ধীরে আঁকা, সে আর পোষাল না।· ·বসলুম পাকাপাকি স্টুডিয়ো ফেঁদে। রবিকা খুব উৎসাহ দিলেন।· সেই সময় চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি নিজ হাতে এঁকেছি, ট্রেস করেছি।· ·এখন অবশ্য সে সব ছবি দেখলে হাসি পায়।· ·প্যাস্টেলে হাত পাকল, মনও বেগড়াতে আরম্ভ করল, শুধু প্যাস্টেল আর ভালো লাগে না। ভাবলুম,· ·অয়েলপেন্টিং শিখতে হবে। ধরলুম এক ইংরেজ আর্টিস্টকে।· ·তেলরঙ তো হল। এবার জলরঙের কাজ শেখবার ইচ্ছে।· ·এখন ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিস্ট হয়ে, ঘাড়ে 'ইজেল' বগলে রঙের বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।· ·কিছুদিন তো চলল এমনি করে, মন আর ভরে না। ছবি তো এঁকে যাচ্ছি, কিন্তু মন ভরছে কই? —জোড়াসাঁকোর ধারে

তখন অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকায় ওস্তাদ হয়ে গেছেন, কিন্তু সে ছবি আঁকায় তাঁর মন ভরছে না। কারণ,

চিত্রাঙ্কনের সকল কৌশল বা টেকনিক তাঁর আয়ত্ত হয়ে গেছে বটে, কিন্তু তখনও তিনি শিল্পসৃষ্টির অন্তরের কথাটি খুঁজে পান নি। সেই রহস্য-প্রকোষ্ঠের দ্বার অবনীন্দ্রনাথের কাছে মুক্ত করে দিলেন হ্যাভেল সাহেব। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

তাঁকে চিরকাল গুরু বলে শ্রদ্ধা করেছি, জ্যেষ্ঠের মত ভক্তি করেছি।

ঘটনাটি সামান্য।

সাহেব বললেন,'· ·চল, তোমাকে আর্ট গ্যালারি দেখিয়ে নিয়ে আসি।· ·দু-তিনখানা মোগল ছবি আর দু-একখানা পার্শিয়ান ছবি, এই খান চার-পাঁচ ছবি নিয়ে তখন আর্ট গ্যালারি।· ·একটি বকপাখির ছবি, ছোটই ছবিখানা, মন দিয়ে দেখছি, সাহেব পিছনে দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে। আমাকে বললেন, 'এই নাও এটি দিয়ে দেখ।' বলে বুকপকেট থেকে একটি আতসী কাচ বের করে দিলেন। সেই কাচটি পরে আর আমি হাতছাড়া করি নি। বহুকাল সেটি আমার জামার বুকপকেটে ঘুরেছে। আমি নন্দলালদের বলতুম, এটি আমার দিব্যচক্ষু। সেই কাচ চোখের কাছে ধরে বকের ছবিটি দেখতে লাগলুম। ওমা কি দেখি, এ তো সামান্য একটু-খানি বকের ছবি নয়, এ যে আস্ত একটি জ্যান্ত বক এনে বসিয়ে দিয়েছে। কাচের ভিতর দিয়ে দেখি তার প্রতিটি পালকে কি কাজ। পায়ের কাছে কেমন খসখসে চামড়া, ধারালো নখ, তার গায়ের ছোট্ট ছোট্ট পালক— কি দেখি— আমি অবাক হয়ে গেলুম, মুখে কথাটি নেই।· ·তার পর আর দু-চারখানা ছবি যা ছিল দেখলুম, সবই ওই এক ব্যাপার। মাথা ঘুরে গেল। তবে তো আমাদের আর্টে এমন জিনিসও আছে, মিছে ভেবে মরছিলুম এতকাল। পুরাতন ছবিতে দেখলুম ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে দিয়েছে সোনা রূপো সব। কিন্তু একটি জায়গায় ফাঁকা, তা হচ্ছে ভাব।· ·আমি দেখলুম এইবারে আমার পালা। ঐশ্বর্য পেলুম, কি করে তার ব্যবহার তা জানলুম, এবারে ছবিতে ভাব দিতে হবে। —জোড়াসাঁকোর ধারে

এই যে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পৈশ্বর্যভাণ্ডারের চাবিকাঠিটি পেলেন, শিল্পকৌশলের মর্মস্থলের সন্ধান পেলেন, এই থেকেই তাঁর মহৎ সৃষ্টির সূত্রপাত হল। 'ভাব দেবার', শিল্পে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার উপায় তাঁর হাতেই ছিল। স্রষ্টার প্রতিভা নিয়েই অবনীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল। ভাব অন্তরে ছিল, রূপসৃষ্টির চরম কৌশলটি যখন আয়ত্ত হল তখন ভাব ও রূপের সমন্বয়ে অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এক লোকোত্তর মহিমায় মণ্ডিত হল।

অবনীন্দ্রনাথের ভাষাও ওই বকের ছবির মতন। শিল্পের সূক্ষ্ম কারুকার্য তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। আতসী কাচের 'দিব্যচক্ষু' দিয়ে দেখলে, তবেই সে ভাষাশিল্পের 'কাজ' চোখে পড়ে। অবনীন্দ্রনাথের ভাষার মত এমন সহজ সরল, অথচ এমন চিত্র ও ব্যঞ্জনাময় গদ্য বাংলায় আর লেখা হয় নি— এ কথা বোধ হয় নিঃসংশয়েই বলা যায়।

অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী। চিত্রশিল্পপ্রতিভা দ্বিমুখী শক্তিতে প্রকাশিত হয়— এক দেখার, আর দেখানোর। শুধু দেখবার নয়, অবনীন্দ্রনাথের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, ছোটবেলা থেকে তাঁর দেখা ছবিগুলিকে মনের খাতায় এঁকে রাখবার। সেইসব ছবি 'ঘরোয়া'য় 'জোড়াসাঁকের ধারে'তে 'আপন কথা'য় একের পর এক সাজিয়ে দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আমার জীবনের সব বিলুপ্ত ঘটনা যে অবনের মুখ থেকে এমন করে ফুটে উঠবে, এমন স্পষ্ট রূপ নেবে তা কখনো মনে করি নি।

রবীন্দ্রনাথ যা ভুলে গেছেন, দশ বৎসরের কনিষ্ঠ অবনীন্দ্র তা ভোলেন নি। চিত্রশিল্পীর মনের মধ্যে যে ছবি একবার আঁকা হয়ে গেছে, তা আর হারাবে কী করে? অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

সেই বাল্যকাল থেকে মন সঞ্চয় করে এসেছে। তখনই যে সে সব সঞ্চয় কাজে লাগাতে পেরেছিলেম তা নয়। ধরা ছিল মনে। কালে কালে সে সঞ্চয় কাজে এল; আবার লেখার কাজে, ছবি আঁকার কাজে, গল্প বলার কাজে, এমনি কত কি কাজে তার ঠিক নেই।· ·আমার সঞ্চয়ী মন। সঞ্চয়ী মনের কাজই এই— সঞ্চয় করে চলা, ভালোমন্দ টুকিটাকি কত কি। —জোড়াসাঁকোর ধারে

আর সঞ্চয় কি কম? শৈশব থেকে কত দেখা।

এই খড়খড়ি দেওয়া বাইরের জগতের খিড়কি, এদিকে সকাল বিকেল, যখন তখন, বাড়ির সাধারণ দিক দেখে চলতেন। অষ্টপ্রহর কিছু-না-কিছু হচ্ছে সেখানে— চলছে, বলছে, উঠছে, বসছে; কতো চরিত্রের, কতো ঢঙের, কতো সাজের মানুষ, গাড়ি, ঘোড়া— কত কি তার ঠিক নেই। মানুষ, জন্তু, কাজ-কর্ম এখানে সবই এক-একটা চরিত্র নিয়ে অবিশ্রান্ত চলন্ত ছবির মতো চোখের উপর এসে পড়তো একটার ঘাড়ে আর একটা। সব ছবিগুলো নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ, ছেদ নেই, ভেদ নেই, টানা চলেছে চোখের সামনে দিয়ে দৃশ্যের একটা অফুরন্ত স্রোত, ঘটনার বিচিত্র অশ্রান্তলীলা।· ·

এক-একদিন শাদা প্রজাপতির মতো এক ফোঁটা আলো, মাথার বালিশে ডানা বন্ধ ক'রে ঘুমোয় সে, হাত চাপা দিলে হাতের তলা থেকে হাতের উপরে-উপরে চলাচলি করে। এমন চটুল এমন ছোটো যে, বালিশ চাপা দিলেও ধরে রাখা যায় না; বালিশের উপরে চট্ করে উঠে আসে। চিৎ হয়ে তার উপর শুয়ে পড়ি তো দেখি পিঠ ফুঁড়ে এসে বসেছে আমারই নাকের ডগায়।· ·

এখনো পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘরে ঘরে কোথায় কি তা স্পষ্ট দেখছি আমি— জিনিসগুলোকে একটুও ভুলিনি। —আপন কথা

উপরের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার চোখ আর ছবি আঁকার মনটি এমনই স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে যে, অবনীন্দ্রনাথের এ রচনার শুধু রূপ ও ছন্দ নয়, তার চিত্রগুলিকেও আমরা ভুলতে পারি না। সেইজন্যই ভাষাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে জানতে হলে চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথকেও জানতে হয়।

সাহিত্যরচনার প্রতিভা অবনীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন না, কিংবা সচেতন হবার অবকাশ পান নি। চিত্রশিল্পের সাধনায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করেছিলেন। সে সাধনা যে কী তীব্র ও একাগ্র ছিল, 'জোড়াসাঁকোর ধারে' প্রভৃতি বইয়ে তিনি নিজেই তার আভাস দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যচর্চা না ক'রে যে চিত্রশিল্পে সুদক্ষ হবার পরই সাহিত্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, মনে হয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে এ পরম সৌভাগ্যের কথা। কারণ, এর ফলে ভাষারচনার গতানুগতিক শিক্ষালব্ধ পদ্ধতিকে তিনি এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। এজন্যই অবনীন্দ্রনাথের গদ্য বাংলায় সম্পূর্ণ তুলনাহীন। আর, এও সৌভাগ্যের কথা যে, চিত্রশিল্পের পথ ধরেই তিনি সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন। কেননা, যদিও সকল শিল্পেরই উদ্দেশ্য এক— সৌন্দর্যসৃষ্টি, তবু, বিভিন্ন শিল্পের টেক্‌নিক ভিন্ন, ধর্ম পৃথক্। অবনীন্দ্রনাথের রচনায় আমরা পাই চিত্রধর্মিতা— রেখার সূক্ষ্ম কারুকার্য, বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার চিত্রধর্ম, গীতিধর্ম নয়। অবশ্য, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে ছন্দ ও সুর চিত্রপ্রবাহের সঙ্গে মিলে মিশে তাকে অসাধারণ মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে। কিন্তু উৎকৃষ্ট গদ্যমাত্রেই ছন্দ ও লয়ের প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন সমন্বয় অপরিহার্য। এই ছন্দ-সুর-লয়-বোধ অবনীন্দ্রনাথের কাছে সহজেই এসেছিল। এ বিষয়ে তাঁর পিতৃপ্রভাব ও পারিবারিক প্রভাবের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া ছবি আঁকার সাধনায় ব্রতী হবার আগেই অবনীন্দ্রনাথ বাজনা শেখার পাঠ নিয়েছিলেন, এবং দক্ষতাও অর্জন করেছিলেন। এই উত্তরাধিকার ও শিক্ষা তাঁর ছবিতে সঞ্চারিত হয়ে তাঁর প্রতিটি রেখায় ও বর্ণে সুর ও লয় হয়ে ফুটে উঠেছে, আবার তাঁর সহজলব্ধ ও শিক্ষালব্ধ ছন্দ সুর তাল লয় রেখা ও বর্ণের অধিকার সকলই তাঁর ভাষা ও সাহিত্যে মিশে গিয়ে তাকে অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

অবনীন্দ্রনাথের ভাষার যে-বৈশিষ্ট্য সকল পাঠককে মুগ্ধ করে, তা তার রচনার ঋজুতা ও সরলতা। অবনীন্দ্রনাথের ভাষা অপূর্ব সুন্দর হয়েও আশ্চর্য সহজ। আর, এই সহজ হওয়ার মধ্যেই অবনীন্দ্রনাথের ভাষাসৃষ্টির সার্থকতা। কিন্তু, ছবি আঁকার মত ভাষাশিল্পকেও যে সহজ করে নেওয়া যায়, অথবা সহজ

করে নিলে তবেই তা অনায়াসে সুন্দর হয়ে ওঠে, এ কথা অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে নিজে উপলব্ধি করেন নি। সাহিত্যসৃষ্টির এই মন্ত্র তিনি লাভ করলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। শিল্পসৃষ্টির দিব্যদৃষ্টি লাভ ক'রে চিত্রাঙ্কনকে তিনি এর আগেই সহজ করে নিয়েছিলেন, সেই সহজ পথ যে সাহিত্যেরও পথ এ কথা শেখালেন রবীন্দ্রনাথ; সাহিত্যসৃষ্টির সকল উপকরণই অবনীন্দ্রনাথের ছিল। প্রতিভা, সাহিত্যপ্রীতি, শিল্পজ্ঞান, কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর—একমাত্র আত্মপ্রত্যয় ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিলেন। জগতের একজন শ্রেষ্ঠ আত্মসচেতন শিল্পী একজন শ্রেষ্ঠ আত্মভোলা শিল্পীকে পথ দেখালেন। অবনীন্দ্রনাথ গল্পরচনায় হাত দিলেন; সে কাহিনী অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বিবৃত করেছেন।—

একদিন আমায় উনি বললেন, 'তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।' আমি ভাবলুম, বাপ রে লেখা— সে আমার দ্বারা কস্মিন্ কালেও হবে না। উনি বললেন, 'তুমি লেখোই না; ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।' সেই কথাতেই মনে জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলুম এক ঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন। শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল', ওই একটিমাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, বাঃ। সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখবার ক্ষমতা আছে। —জোড়াসাঁকোর ধারে

'পল্বলের জল' কথাটিকে যে রবীন্দ্রনাথ কাটতে গিয়েও কাটেন নি, তার কারণ, ওই কথাটির ধ্বনি-সন্নিবেশে এমন-একটি ছবি ফুটে উঠেছে যা বোধ হয় আর কোনো কথা দিয়েই ফোটানো যেত না। এই রকম ছবি ফোটানো অবনীন্দ্রনাথের কাছে সহজ ছিল। দুরূহ সাধনমার্গ পার হয়ে এর আগেই তিনি নিজের ছবি আঁকাকে সহজ করে নিতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় সেই সহজমন্ত্র তিনি সাহিত্যেও প্রয়োগ করবার উৎসাহ পেলেন। আবার এই মন্ত্রসিদ্ধির প্রেরণাতেই তিনি চিত্রশিল্পকেও সহজ করে দিতে অগ্রসর হলেন। তিনি বলেছেন—

তখন আর্ট শেখা ছিল মহা ভয়ের ব্যাপার। সেটা আমার মনে লেগেছিল। তাই ভেবেছিলুম এই ভয় ঘোচাতে হবে, ছবি আঁকা এত সহজ করে দেব। কারণ এটা আমি নিজে অনুভব করেছি আমার ভাষার বেলায়। রবিকাকা আমাকে নির্ভয় করে দিয়েছিলেন।—ঘরোয়া।

রবীন্দ্রনাথ যখন অবনীন্দ্রনাথের প্রথম বাংলা রচনা 'শকুন্তলা'র একটি কথাও কাটলেন না, তখনই অবনীন্দ্রনাথ নিজেকে আবিষ্কার করলেন; জানলেন যে, শেষ পর্যন্ত সকল শিল্পেরই লক্ষ্য এক— শুধু পথ ভিন্ন। এক শিল্পের সাধনায় যাঁর সিদ্ধিলাভ হয়েছে, তাঁর পক্ষে অন্য শিল্পের পথ ধরেও সে-লক্ষ্যে পৌঁছনো সহজ। তাই জন্মগত সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারী অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পের সাধনালব্ধ দিব্যদৃষ্টি ভাষাশিল্পে প্রয়োগ করে প্রথম থেকেই সার্থকতা লাভ করলেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ যখন নিজেকে আবিষ্কার করলেন, এবং যখন তাঁর প্রথম রচনা 'শকুন্তলা' রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ অনুমোদন লাভ করল, তখনই তিনি সকল শিল্পের মূল ঐক্যটি খুঁজে পেলেন। এর পর অবনীন্দ্রনাথের বাংলা রচনার ইতিহাস ক্রমান্বিত সার্থকতার ইতিহাস।—

সেই প্রথম জানলুম আমার বাংলা বই লেখবার ক্ষমতা আছে। এত যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড় ফুর্তি হল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম—ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী ইত্যাদি। সেই যে উনি বলেছিলেন 'ভয় কি আমিই তো আছি' সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল। —জোড়াসাঁকোর ধারে

'শকুন্তলা' প্রকাশিত হয় ১৩০২ সনে বা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ বইয়ের একটু পড়লেই অবনীন্দ্রনাথের ভাষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে—

তারপর কি হল?

দুঃখের নিশি প্রভাত হল, মাধবীর পাতায় পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখি ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল।

আর কি হল?

বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল।

আর কি হল?

পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা— দুজনে মালা-বদল হল। দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

তারপর কি হল?

তার পর কতদিন পরে সোনার সাঁঝে সোনার রথ রাজাকে নিয়ে রাজ্যে গেল, আর আঁধার বনপথে দুই প্রিয়সখী শকুন্তলাকে নিয়ে ঘরে গেল।

কী আশ্চর্য সহজ ভাষা, অথচ কী অপরূপ তার চিত্রব্যঞ্জনা! মনে হয়, এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছবির পর ছবি এঁকে কালিদাসের কাব্যখানিকে সাজিয়ে তুলছেন। সে ছবি রেখায় বর্ণে ছন্দে লয়ে অনবদ্য, তবু সে ছবি কথার। আর, ঐ যে ফুল ফুটল, পাখি ডাকল, পোষা হরিণ কাছে এল, আর সোনার সাঁঝে সোনার রথে রাজা আর আঁধার বনপথে দুই সখী আর শকুন্তলা, তারই বা কী ব্যঞ্জনা!

রবীন্দ্রনাথের গদ্য অপূর্ব, তুলনাহীন। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালের ভাষারচনার ইতিহাস বাংলা গদ্যের পুষ্টি ও প্রসারের ইতিহাসের অধিকাংশই জুড়ে আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষা সাহিত্যিকের ভাষা; যেমনই তার বিস্তার ও ব্যাপ্তি, তেমনই তার অলংকরণ ও কারুকার্য। অসাহিত্যিক বা অনভিনিবিষ্ট পাঠকও সে ভাষার বৈচিত্র্যে ছন্দে শিল্পচাতুর্যে মুগ্ধ, অভিভূত না হয়ে পারে না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের গদ্য চিত্রশিল্পীর গদ্য, সাধারণ একটি বকের ছবির মত তার আটপৌরে চেহারা, প্রকৃত সহৃদয়তার আতসী কাচ চোখে দিয়ে না দেখলে তার সূক্ষ্ম কারুকার্য চোখে পড়ে না। তাই অবনীন্দ্রনাথের গদ্য এত সহজ, অথচ এর সৌন্দর্যের উপলব্ধি এত বৈদগ্ধ্যসাপেক্ষ। এই সরলতার ফলে সাধারণ পাঠক মনে করে, অবনীন্দ্রনাথের রচনা শুধু ছোটদের পড়বার, ছোটদেরই উপভোগ করবার। অধিকাংশ পাঠক উপলব্ধি করে না যে, রবীন্দ্রনাথের গদ্য যেমন এক দিকে অলংকৃত শব্দসমৃদ্ধ ধ্বনিব্যঞ্জিত ভাষার আদর্শ স্থাপন করেছে, অপর দিকে অবনীন্দ্রনাথের গদ্য সরল নিরাভরণ অন্তর্ব্যঞ্জনাময় আর-এক জাতীয় ভাষার আদর্শ উপস্থিত করেছে। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথের কোনো অনুকারীর পক্ষেই সে চিত্রময় গদ্য লেখা সম্ভব নয়, তবু এই সহজ সরল অনাড়ম্বর ও আপাত-নিরাভরণ ভাষা যে বর্ণনাত্মক রচনায় বিশেষ উপযোগী, 'রাজকাহিনী'তে অবনীন্দ্রনাথ তা নিজেই প্রমাণ করেছেন।

গদ্যরচনায় হাত দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ একই বছরে (১৩০২) পর পর দু খানি বই লেখেন, 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুল'। এর একটি কাহিনীও অবনীন্দ্রনাথের স্বকল্পিত বা মৌলিক নয়। দুখানিতেই ছবির পর ছবি, পড়ে মনে হয় নিপুণ চিত্রশিল্পী প্রচলিত কাহিনীর রূপসজ্জায় হাত দিয়েছেন। তখন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ ভাষাশিল্পের পথ পেয়েছেন সত্য। কিন্তু তখনও তিনি মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির সাহস কিংবা প্রেরণা

পান নি। তখনও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা সাহিত্যিক সত্তাকে অনেকটা ঢেকে রেখেছে। তাই 'ক্ষীরের পুতুলে'ও এই বিবিধ বিচিত্র ছবিরই সমাবেশ দেখতে পাই।—

সে দেশে রাজকন্তের উপবনে নীল মাণিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্তমণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমে গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারা রাত ছাদে বসে, আকাশের সঙ্গে রং মিলিয়ে, সেই নীল রেশমে সাড়ি বোনেন। একখানি সাড়ি বুনতে ছ'মাস যায়।

ষষ্ঠীঠাকরুণের কথায় মাসি-পিসি মায়া করলেন— দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল, মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল; ষষ্ঠীতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল, রাজার মন্ত্রী হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগনগরে দিনে দুপুরে রাত এল।

'ক্ষীরের পুতুল' পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের রচনায় চিত্রশিল্পীই প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু এর পর ভারতীতে 'রাজকাহিনী' লিখতে আরম্ভ করার পর তিনি তাঁর ভাষায় চিত্রধর্মিতাকে কিছুটা প্রচ্ছন্ন ও ব্যবহারিক গদ্যরীতির সঙ্গে সমন্বিত ক'রে এক আশ্চর্য বর্ণনাত্মক বা narrative গদ্যের সৃষ্টি করলেন। 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুলে' যে স্পষ্ট চিত্রপ্রবাহ এবং সুরলালিত্য ছিল, 'রাজকাহিনী'র ভাষায় তা সম্পূর্ণ দুর্লক্ষ্য, অথচ অনুপস্থিত নয়। 'রাজকাহিনী'তে ভাষার এ পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। 'শকুন্তলা' কাব্য, 'ক্ষীরের পুতুল' রূপকথা। এসব বইয়ে যে চিত্র ও ছন্দোময় ভাষা উপযোগী, 'রাজকাহিনী'র ঐতিহাসিক বিবরণে সে ভাষা ঠিক মানায় না। 'রাজকাহিনী'র বর্ণনাত্মক ভাষা সৃষ্টি করা অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে এ সময়ে আর শক্ত ছিল না। কেননা, প্রথমে তিনি চিত্রশিল্পীরূপেই সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম দু খানি বই লেখার পর সাহিত্যশিল্পীরূপে তাঁর আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল— ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সাহসের অভাব তখন আর অবনীন্দ্রনাথের ছিল না।

'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুলে'র কাব্য ও চিত্রময় ভাষা যে সর্বপ্রকার রচনার উপযোগী নয়, 'রাজকাহিনী' রচনায় হাত দিয়ে এ কথা অবনীন্দ্রনাথ অনুভব করে থাকাই সম্ভব। কারণ, ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধমূলক কাহিনীর উপযোগী বর্ণনাত্মক ভাষার পরীক্ষা যেমন তিনি করেছিলেন 'রাজকাহিনী'তে, তেমনি আদর্শ-মূলক গম্ভীর বিষয়ের উপযোগী ভাষা নিয়েও এ-সময়ে তিনি পরীক্ষা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাই দেখতে পাই, শ্রাবণ ১৩০৫এর রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় 'দেবীপ্রতিমা' নামে উচ্চাদর্শময় গল্পে অবনীন্দ্রনাথ অতি গম্ভীর, অনতিসরল, সাধু ও সংস্কৃতবহুল গদ্য ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাধু ও সংস্কৃত-শব্দবহুল হলেও অবনীন্দ্রনাথের সহজ চিত্ররচনার প্রতিভা এ রচনাতেও ফুটে উঠেছে।—

দেবীর চরণামৃতে পবিত্র, গুরুর আশীর্বাদে সৌরভিত, ভক্তসহস্রের প্রীতিরসে প্রফুল্ল শুভ্র বিজয়মাল্য শিরে বহন করিয়া আমি নির্জন কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। মন্দারগন্ধা সেই অমলামালা সমস্ত দেহে যেন অমৃত সিঞ্চন করিয়া— চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায়, বন্ধুর স্নেহের ন্যায় সুখস্পর্শে আমার হৃদয়পথকে পলকে পলকে বিকশিত করিল।...

আমি সেইদিন সায়াহ্নে— ভক্তের ভক্তির ন্যায় নির্মল, নারীর স্নেহের ন্যায় কোমল, সঞ্চিত পুণ্যরাশির ন্যায়, যশস্বীর সুযশের ন্যায় অমন ধবল লঘুভার বিস্তীর্ণ উত্তরীয়যুগলে শোভিত এবং গুরুর প্রসাদচন্দনে চর্চিত পবিত্র মাল্যদামে ভূষিত হইয়া গুরুদেবের পার্শ্বে লোকেশ্বরীর প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। পশ্চাতে লোকলোকেশ্বরীর মন্দিরের মহা বিস্তীর্ণ স্তম্ভশ্রেণীবেষ্টিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, জনতার কোলাহলে ভক্তি উচ্ছ্বাসে স্ফীত তরঙ্গিত পরিপূর্ণ; আকাশ কলাপীর কণ্ঠের ন্যায় নীল মসৃণ কোটিতারকায় উজ্জ্বল এবং সেই পূর্ণসন্ধ্যায় অস্ফুট চন্দ্রালোকে ঈষদুদ্ভাসিত, নিঃশব্দ গম্ভীর পাষাণ মন্দিরের গভীর অন্ধকারে, পাষাণময়ী লোকেশ্বরী-প্রতিমার চরণতলে স্বর্ণবিজড়িত রত্নখচিত আরতি প্রদীপের সহস্র শিখা, সহস্রভক্তের একাগ্রচিত্তের ন্যায়, নিষ্কম্প নিশ্চল নিষ্কলুষ জ্বলিতেছিল।

আত্মপ্রতিকৃতি
শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ রচনায় অবনীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র রচনারীতি অনুসরণ করেছিলেন কি না জানা নেই, কিন্তু এ ভাষা 'কাদম্বরী'কেই স্মরণ করায়। কিন্তু ভাষা নিয়ে এজাতীয় পরীক্ষায় অবনীন্দ্রনাথ আর অগ্রসর হন নি। সকলপ্রকার আভরণ ও কারুকার্যহীন বর্ণনার যে ভাষা তিনি 'রাজকাহিনী'তে উপস্থিত করলেন, তা এক দিক থেকে বাংলা গদ্যের আদর্শস্বরূপ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, 'রাজকাহিনী'তে অবনীন্দ্রনাথ যে সহজ সরল বর্ণনা-বিবরণের ভাষার আদর্শ উপস্থিত করেছেন তা পরবর্তী গদ্যলেখকদের প্রভাবিত করেছে এবং আধুনিক লেখকদের ঋজু তির্যক্ বিবরণ বা narrationএর ভাষা 'রাজকাহিনী'র ভাষার প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। সরল, অনলংকৃত, অথচ ছন্দোময় গদ্যের আদর্শ হিসাবে 'রাজকাহিনী'র ভাষার কোনো তুলনা নেই। এর অতি সাধারণ বিবরণের মধ্যেও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সহজ ও স্বাভাবিক চিত্রপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছেন—

সেখানে যত শিষ্ট, শান্ত, নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস, আর পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায়, হরিণ চরে বেড়ায়, যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন, দিবারাত্রি ঝরনার ঝর্ঝর, আশ্চয-আশ্চর্য ফুলের গন্ধ, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বনের ছায়া, সেখানে সেই সকল অন্ধকার বনে-বনে, ভীলরাজ মাণ্ডলিক, সাপের মতো কালো, বাঘের মতো জোরালো, সিংহের মতো তেজস্বী, অথচ ছোট একটি ছেলের মতো সত্যবাদী, বিশ্বাসী, সরলপ্রাণ ভীলের দল নিয়ে রাজত্ব করতেন।—গোহ

বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একেবারে তিনশো গজ আকাশের উপর থেকে, এক টুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শুক-শারীর মাঝে এসে পড়ল।—পদ্মিনী

একটা ঝড় অনেকখানি ঠাণ্ডা হাওয়ার ধাক্কায় গাছপালা ঘরবাড়ি জলস্থল আকাশ দুলিয়ে চলে গেল, অনেকখানি বৃষ্টির জল ঝরঝর করে চারিদিকে ঝরে পড়ল, বিদ্যুৎ বাজ খানিক চমক দিয়ে ধমক দিয়ে চলে গেল; তারপরে মেঘ আস্তে-আস্তে পাতলা হয়ে এল, রাত্রিশেষের সঙ্গে রুপোর মতো শাদা আলো ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে অন্ধকারকে ক্রমে ফিকে করে ভোরের একটি ছোট পাখির গানের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল; ঠিক সেই সময় বাদলা দিনের সকাল বেলার ফুটন্ত কচি আলোর মাঝখানে একখানি জলে ভরা মেঘ!—চণ্ড

মহৎ প্রতিভার একটা লক্ষণ এই যে, তা কখনো নিজের সৃষ্টির অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি করে না। অবনীন্দ্রনাথও নিজের সৃষ্টির পদ্ধতিতে বাঁধা পড়লেন না। 'রাজকাহিনী'র এই আশ্চর্য ভাষাকেও তিনি অতিক্রম ক'রে গেলেন।

অবনীন্দ্রনাথের ভাষার এ পরিবর্তনের কারণ এবং প্রয়োজন ছিল। এ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ পূর্বতন সাহিত্যের ঠিক অনুবাদ না হলেও নবরূপায়ণেই তাঁর বাংলা রচনাকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন। বোধ হয় নূতন সাহিত্যরচনায় ব্রতী হয়ে তিনি প্রথমে নিজের অসাধারণ কল্পনাশক্তিকে সাহিত্যে মুক্ত করতে সাহসী হন নি। কিন্তু এর পরে অবনীন্দ্রনাথ যে বইগুলি লিখেছেন, সেগুলিতে তাঁর অসাধারণ কল্পনাশক্তির সঙ্গে তাঁর শিল্পীমানসের এক অপরূপ সমন্বয় দেখতে পাই। গুণেন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রবণতার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। এই কল্পনাশক্তি আরো বহুগুণে বর্ধিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার এই অলোকসামান্যতা লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন, "এ রকম বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প আর কারো কলম থেকে বেরোবার জো নেই।" সে কল্পনা বাস্তবজগতের সীমানা ছাড়িয়ে উদ্ভট, অসম্ভব, আজগুবির রাজ্যেই বিচরণ করতে ভালোবাসত। 'রাজকাহিনী' প্রথম খণ্ড রচনার কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর এই অলৌকিক কল্পনাশক্তিকে অবনীন্দ্রনাথ মুক্ত করে দিলেন তাঁর প্রথম মৌলিক

রচনা 'ভূতপত্‌রীর দেশ'-এ। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি 'ভারতশিল্প' সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন। কিন্তু এটি এবং পরবর্তী শিল্পপ্রবন্ধের বইগুলিতে ব্যবহারের উপযোগী সাধারণ সহজ ও ঋজু বর্ণনা বিবরণের ভাষার আদর্শ তিনি নিজেই 'রাজকাহিনী'তে স্থাপন করেছিলেন। এ বইগুলিতে অবনীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যাতারূপে দেখা দিয়েছেন বলে, এখানে আর তাঁকে নূতন ভাষা সৃষ্টি ক'রে নিতে হয় নি। কিন্তু যখনই তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ কল্পনার পথ ধরে স্রষ্টারূপে আজগুবির রাজ্যে প্রবেশ করলেন, তখনই তাঁকে সেই 'নিয়মহারা হিসাবহীন' ভাব কল্পনার উপযোগী নূতন ভাষাও সৃষ্টি ক'রে নিতে হল। এই অদ্ভুত আশ্চর্য কল্পনা নূতন নূতন আজগুবি ছবি নিয়ে ফুটে উঠল অবনীন্দ্রনাথের তদুপযোগী ভাষায়।

দ্যাখো, এই পৃথিবী তখন সবে তৈরী হয়েছে, আমাদের মত দুচারিটি গাছ-ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই— নদী নেই, পাহাড় নেই, এমন কি বাতাসে শব্দটি পর্যন্ত নেই ;— কেবল বালি ধুধু করছে— ঠিক এই জায়গাটার মত। আমার তখন সবেমাত্র কচি-কচি দুটি কাঁটা বেরিয়েছে— ছোট ছেলের কচি কচি দুটি দাঁতের মত। সেই সময় তারা গান বড় ভালোবাসে, তারা দেখতে অনেকটা মানুষের মত, কিন্তু ফড়িংগুলোর মত তাদের ডানা আছে, পাখিগুলোর মত পা, ঝাঁক বেঁধে তারা আমাদের কাছে উড়ে এসে বস্‌ল আর গান গাইতে আরম্ভ করলে। আকাশ, বাতাস তাদের গানের সুরে যেন বেজে উঠল। সে যে কি চমৎকার তা তোমাকে আর কি বলব! আমরা তার আগে শব্দ শুনিনি, গানও শুনিনি— আনন্দে যেন শিউরে উঠলুম।

প্রথম সৃষ্টির যে আনন্দ, তাকে আজগুবি কল্পনার তুলিতে এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ। শিল্পীর সঙ্গে মিলেছে অদ্ভুতরাজ্যের কবি। কল্পনা এখানে চলেছে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে চোখের দেখার— ইন্দ্রিয় সীমানার বাইরে। তাই ভাষাও এখানে দীর্ঘায়িত বাক্যে, ক্রমান্বিত অন্তর্বাক্যে (parenthesis) তার বর্ণনা প্রবাহে একরূপ থেকে আরেক রূপে অসংলগ্ন ছায়াছবির মত বয়ে চলেছে। অবনীন্দ্রনাথের উদ্ভট আজগুবি কল্পনা-কাহিনীর ঐ বইটি থেকে আরো উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করা যায় না।—

দেখছি আলোটা ক্রমে এ-গাছ সে-গাছ ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগল ; তারপর আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রকাণ্ড একটা কাচের গোলা মাঠের উপর দিয়ে বোঁ বোঁ করে গড়িয়ে আসছে— যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল!· ·

গেছি পাল্কিসুদ্ধ্ গোলাটার ভিতরে ঢুকে গেছি। হাঁড়ির ভিতরে গাছের মত আর পালাবার জো নেই। একেবারে গড়িয়ে চলেছি,— বন্‌বন্ করে লাঠিমের মত ঘুরতে ঘুরতে। সে কি ঘুরুনি! মনে হল, আকাশ ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, পেটের ভিতর আমার মাসির মোয়াগুলোও যেন ঘুরতে লেগেছে। কখনো মাঠের উপর দিয়ে, কখনো গাছের মাথা ডিঙিয়ে, গোলাটা সাদা খরগোসের মত লাফিয়ে গড়িয়ে, কখন জোরে, কখন আস্তে আমাকে নিয়ে ছুটে চলেছে!

ভয়ে দুই হাতে চোখ ঢেকে চলেছি। ক্যাঁ-কোঁ চরকা কাটার শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখি এক বুড়ি সুতো কাটছে আর একটা খরগোস তার চরকা ঘুরোচ্চে। বুড়িকে দেখেই চিনেছি, সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি! যে চাঁদের ভিতরে বসে থাকে, আর ওই তার চরকা, ওই খরগোস!

অসম্ভব কল্পনার রাজ্যে গোটা চাঁদটাই তার বুড়ি আর খরগোস সুদ্ধ্ গড়িয়ে গড়িয়ে মানুষের একেবারে কাছে এসে পৌঁছয়। 'ভূতপত্‌রী'র ভাষা এই উদ্ভট কল্পনার আঁকাবাঁকা পথ-বাওয়া ভাষা ; অথচ আশ্চর্য এই যে, এখানেও অবনীন্দ্রনাথের ভাষার সেই সরলতা আর চিত্রধর্ম হারায় নি। যেমন—

আমার বাঁদিকে কেবল বালি— সাদা ধপ্‌ধপ্ করছে বালি ; আর আমার ডানদিকে রয়েছে কালি-গোলা সমুদ্দুর— কালো,— কাজলের মতো কালো, বাঁয়ে চলেছে হারুন্দে— ডাঙার খবর দিতে দিতে, ডাইনে চলেছে কিচ্‌কিন্দে— জলের আদি-অন্ত কইতে কইতে ; আমি চলেছি পাল্কিতে শুয়ে মনে মনে দুজনের দুটো গল্প সাদা একটা শেলেটের উপরে কালো পেন্‌সিল্ দিয়ে লিখে নিতে নিতে।

তার পর 'হাঙ্কন্দের গল্প' আর 'কিচ্‌কিন্দের গল্প'— বাংলা সাহিত্যে নূতন এক ধরণের সাহিত্যের অবতারণা করল, যার অনুরূপ আজ্‌গুবি কল্পনার সাহিত্য বাংলায় এর আগে বড় বেশি লেখা হয় নি; ইংরেজীতে *Alice in Wonderland* প্রভৃতিতেই যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'ভূতপত্‌রী' রচনাকালে *Alice in Wonderland* এর কিছুটা প্রভাব হয়তো অবনীন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল—'পাল্কির গান'এর বিকৃত রূপ 'Twinkle Twinkle little bat' এবং 'You are old Father William' প্রভৃতি মনে পড়ায়—কিন্তু কাহিনী-গ্রন্থনে উল্লিখিত বিশ্ববিখ্যাত বইটির কোনো প্রভাবই অবনীন্দ্রনাথের রচনায় প্রকাশ পায় নি। বরং, আরব্যোপন্যাস ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি সব কিছুকে তাঁর উদ্ভট কল্পনায় মিশিয়ে তিনি এমন আজগুবি রূপ দিয়েছেন যে, সে-সব রচনার কোনো অংশই মৌলিক না হলেও সবটা মিলে সম্পূর্ণ অভিনবত্ব ও অসাধারণ মৌলিকত্ব লাভ করেছে। বস্তুতঃ, এইটেই অবনীন্দ্রনাথের রচিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কোনো গ্রন্থের কাহিনীকেই সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা বলা যায় না, অথচ তাঁর প্রত্যেকটি রচনাই একান্তরূপে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। তাঁর প্রত্যেকটি গ্রন্থেই পুরাতন উপকরণ নিয়ে নূতন সৃষ্টির কৌতুকটি প্রচ্ছন্নরূপে উপস্থিত, কিন্তু দুনিরীক্ষ্য নয়।

নানাদিক থেকে বিচার ক'রে 'ভূতপত্‌রী দেশ' বইখানি অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্বের পরিচয়রূপে আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। অবনীন্দ্রনাথের মন যে ঠিক গতানুগতিক কল্পনা ও কাহিনীর পথ বেয়ে চলত না 'ভূতপত্রী' বইটিতে এ কথা খুব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে, এবং এর পর থেকে অবনীন্দ্রনাথ কোনো বইয়েই তাঁর এই অদ্ভুত রাজ্যের কল্পনাকে মুক্তি দিতে দ্বিধা করেন নি।

'ভূতপত্‌রী' বাংলা সাহিত্যে আবোলতাবোল জাতীয় আজগুবি কল্পনাময় কাহিনীর প্রথম রচনা, এ কথা বলা যায় না। কারণ এর আগে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় অদ্ভুত ও উদ্ভট কল্পনার পথ ধরে তাঁর সুবিখ্যাত 'কঙ্কাবতী', 'ডমরু চরিত', 'মুক্তামালা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের আজগুবি কাহিনী এবং অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপত্রী' প্রভৃতির আজগুবি খেয়ালী রচনায় অনেক প্রভেদ। ত্রৈলোক্যনাথের অদ্ভুত কাহিনীগুলি প্রায় সবই ব্যঙ্গাত্মক বা রূপকধর্মী অথবা tall tale জাতীয়—তাদের প্রকৃত আবোল-তাবোল জাতীয় নিছক আজগুবি কল্পনাময় রচনার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। ত্রৈলোক্যনাথেরও কল্পনাশক্তি প্রবল ছিল, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার প্রকৃতি ভিন্ন। সেইজন্য প্রকৃত আজগুবি কল্পনার চিত্র ও কবিত্বের আলো-আঁধারিতে মেশা phantasy হিসেবে অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপত্রী' সম্পূর্ণ তুলনাহীন।

আমার বিশ্বাস অবনীন্দ্রনাথের এই উদ্ভট কল্পনার বাঁকাচোরা ভঙ্গি বাংলা সাহিত্যের দু'জন প্রখ্যাত লেখককে প্রভাবিত করেছিল। একজন অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অপরজন 'হযবরল'-রচয়িতা সুকুমার রায়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কল্পনা যেখানে কাহিনীর পথ ত্যাগ ক'রে অসংলগ্নতার বিস্তীর্ণ আকাশে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে, সে ক্ষেত্রে এঁদের আজগুবি কল্পনা মূল কাহিনীর নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে একটি সুসম্বদ্ধ আকারে রূপ নেয় বলে পাঠকের কাছে তা বেশি চিত্তাকর্ষী মনে হয়।

এই যে আজগুবি কল্পনাময় কবিত্বের জগৎ—অবনীন্দ্রনাথের শিল্পমানসের স্বরূপ এর মধ্যেই যথার্থরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। এই হিসাবে অবনীন্দ্রনাথকে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের 'পাগল' উপাধি সার্থক। পরবর্তী প্রায় সকল বইতে অবনীন্দ্রনাথের এ 'নিয়মহারা' কল্পনা প্রাধান্য লাভ করেছে, এবং তাঁর ভাষাও তদনুযায়ী দীর্ঘায়িত হয়ে বিশেষণ-বর্ণনা অন্তর্বাক্যের প্রয়োগে তাঁর বাক্যগুলিকে টেনে টেনে নিয়ে চলেছে।

'ভূতপত্‌রীর দেশ' বইটিতে অবনীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ঘরছাড়া দিকহারা উদ্ভট ও আজগুবি কল্পনার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতাকে মুক্তি দিলেন; এবং এর পর থেকে এ-জাতীয় অর্ধেক বাস্তব অর্ধেক কল্পনায় গড়া কাহিনীতেই যেন বেশি মনোনিবেশ করলেন। ফলে তাঁর 'খাতাঞ্চির খাতা'র মত বাস্তব ও কল্পনায় মেশা বর্ণনা, কবিত্ব ও চিত্রময় কাহিনীটি শিশু বা বয়স্ক কোনো সমাজেই জনপ্রিয় হল না, এবং তাঁর ভাষাও এই উদ্ভট আজগুবির পথ ধরে এমনই আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হল, যে রাজকাহিনীর ভাষার মত এ-ভাষার সৌন্দর্য আর অত সহজে পাঠক সাধারণের কাছে ধরা দিল না। 'খাতাঞ্চির খাতা'র মত এমন অপরূপ কবিত্বপূর্ণ, চিত্রধর্মী, অসাধারণ কল্পনাময় কাহিনী বাংলা সাহিত্যে আর একখানি খুঁজে পাওয়া শক্ত। এবং ভাষাও ঠিক সেই অসাধারণত্বের সঙ্গেই তাল রেখে চলেছে বলে, তার অনুকরণ বা অনুসরণও অসম্ভব। যেমন—

> দিনের বেলায় সহরের এই যে হাজার-হাজার ইঁটের বাড়ী আর কলের চিম্‌নি দেখছ, রাত নটার তোপ যেমন পড়বে, সব অমনি বাগান আর বাজার আর মাঠ আর পুকুর হয়ে যাবে। থাকবার মধ্যে থাকবে রাজার কেল্লা, রায়-মহাশয়দের বৈঠকখানা আর এই জোড়াসাঁকো, আর এই তেতলা বাড়ী! বিশ্বাস হচ্চে না? ভাবছ আমি বাজে কথা বলছি? আচ্ছা সকালবেলা পূবদিকের আকাশে লাল রঙের একটা ফানুস দেখতে পাও— সাদা ফানুস থাকে না তো? রাত্তিরে দেখো দিকি, সেখানে সাদা একটা ফানুস ঝুলছে দেখবে— আবার সেটা কখনো দেখাবে রূপোর বাটি যেন কাৎ হয়ে পড়েছে, কখনো বা দেখবে যেন একখানি নৌকো ভাসছে। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা দিনের বেলায় আকাশে নীলরং, পাখী আর মেঘ, এ ছাড়া কিছু তো দেখ না— রাতের বেলায় আকাশে দেখো, সব তারা ফুটেছে দেখবে! এ যদি হতে পারে, তবে আর রাত হলেই সহরটা বাগান হতে পারবে না কেন? দুপুর-রাতে ভূতের ভয়ে ছাদে উঠতে পারো না, তাই বলো! না হলে দেখতে পেতে, সব বাড়ী-ঘর-দুয়োর কোথায় মিলিয়ে গেছে; কেবল চারিদিকে সব সারি-সারি আলোর নিশেন ঝুলছে— চৌকো, লম্বা, চওড়া, সরু, তরো-বেতরো; আর কেবল রাজার বাড়ীর চূড়ো, রায়মহাশয়দের বৈঠকখানার বারাণ্ডা, আর আমাদের চিলের ছাদটা একটু একটু দেখা যাচ্ছে— আর কিছু নেই।

এখানে বাস্তব জগতের দেখা ছবি আজগুবি কল্পনায় মিশে যে বাঁকাচোরা রূপ নিয়েছে, এ-ভাষাতেও সেই উদ্ভট, অদ্ভুত বাঁকাচোরা গতি। এ-ভাষায় 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুলে'র সেই কবিত্বের প্রবাহ নেই, 'রাজকাহিনী'র ঋজু, সরল বিবরণের ভাষার সঙ্গেও এ ভাষা সম্পূর্ণ এক নয়। অবনীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ভাষা পূর্বপ্রচলিত কাহিনীর ভাব ও বক্তব্য অনুসরণ ক'রে কবিত্বমণ্ডিত বা ঋজুসরলতায় বয়ে চলেছিল, কিন্তু 'খাতাঞ্চির খাতা'য় তা অবনীন্দ্রনাথের উদ্ভট কল্পনার উৎকেন্দ্রিক পথে চলেছে।

'ভূতপত্‌রী দেশ' যে বইতে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় কল্পনাকে মুক্তি দিয়ে নিজ মনোমত মৌলিক রচনায় হাত দিলেন, সেখান থেকেই তাঁর পরবর্তী মৌলিক রচনাগুলির ভাষা ও ভঙ্গির সূত্রপাত হল বলা যায়। 'খাতাঞ্চির খাতা'য়ই কেবল অবনীন্দ্রনাথ অ-লৌকিক কল্পনাপ্রবণতাকে আরো বেশি ক'রে প্রকাশ করলেন না, তাঁর শেষ জীবনের যাত্রাপালাগুলিতেও এই অসাধারণ কল্পনাজগতেই কাহিনী ও ভাষাকে নিবদ্ধ রাখলেন। এ-সব রচনার হাস্যরস, কল্পনা, ভাষা ও ভঙ্গি কোনো কিছুই গতানুগতিক পরিবেশে অভ্যস্ত সাধারণ পাঠকের অধিগম্য নয় বলে, অবনীন্দ্রনাথের এ-রচনাগুলি মুষ্টিমেয় সূক্ষ্মব্যঞ্জনাবিলাসী সাহিত্যরসিকেরই মাত্র প্রিয় হয়ে রইল।

'ভূতপত্‌রী দেশ' ও 'খাতাঞ্চির খাতা' এই দু খানি সমধর্মী বইয়ের মাঝখানে অবনীন্দ্রনাথ আর দুখানি আশ্চর্য সহজ সরল সুন্দর গদ্যগ্রন্থ রচনা করলেন—'নালক' আর 'পথে বিপথে'। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের ঋজুতা,

ছন্দোমাধুর্য আর চিত্রময় অপরূপ বর্ণনাভঙ্গি দু'খানি বইয়েই বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে। 'পথে বিপথে'তে যে স্মৃতিচিত্রময় কাহিনীকে কবিত্ব, কল্পনা ও প্রাণময় বর্ণনায় অবনীন্দ্রনাথ উপস্থিত করলেন, সেই স্মৃতিকল্পনার ছবিছন্দে জড়ানো ভাষা অনেকদিন ধরে অবনীন্দ্রনাথের হাত থেকে প্রবাহিত হয়েছে। 'আপন কথা' 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে— অবনীন্দ্রনাথের ভাষার এই সহজ সরল অন্তরঙ্গ রূপটি দেখতে পাই। এই ভাষারও আদর্শ মূলতঃ অবনীন্দ্রনাথেরই 'রাজকাহিনী'র ভাষা। কিন্তু এখানেই তা বৈঠকী ভঙ্গিতে ব্যক্তিগত স্মৃতির জগতে এসে সেই ইতিহাস-আখ্যানের বর্ণনা-বিবরণের ভাষা অতিক্রম ক'রে একান্ত অন্তরঙ্গ, হৃদয়ের সন্নিকটবর্তী মাধুর্যময় ভাষায় পরিণত হয়েছে।

যদিও 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র ভাষার তুলনা নেই, এবং বাংলাসাহিত্যে অনুরূপ অন্তরঙ্গতাময় অথচ খুঁটি-নাটি বর্ণনার চিত্রময় ভাষা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, তবু, যেহেতু এগুলি শ্রীযুক্তা রানী চন্দ-দ্বারা অনুলিখিত অবনীন্দ্রনাথের মুখের ভাষা, সেহেতু এগুলিকে অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ নাও করা যেতে পারে। কিন্তু 'পথে বিপথে' 'আপন কথা' ও 'মাসি'তে যে কল্পনার রঙে আঁকা, সহজ সরল অথচ একান্ত অন্তরঙ্গ কবিত্বময় ভাষার সাক্ষাৎ পাই বাংলাসাহিত্যে তার তুলনা কোথায়?

এর পর আর দুখানি কাহিনী অবনীন্দ্রনাথ এই গদ্যে— কিম্বা এই ঋজু সরল গদ্যের সঙ্গে 'ক্ষীরের পুতুল'এর কবিত্ব-কল্পনাকে এবং উদ্ভট কল্পনার বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে সমন্বিত করে লিখলেন,— 'বুড়ো আংলা' ও 'আলোর ফুলকি'।

সহজ অথচ কবিত্বময়, ঋজু ও সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যঞ্জনাময়, বর্ণনাত্মক অথচ কল্পনাসমৃদ্ধ, চিত্রধর্মী গদ্যের আদর্শ হিসাবে আমার মনে হয়, 'নালক' 'বুড়ো আংলা' ও 'আলোর ফুলকি'র ভাষা বাংলাসাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। 'নালক' 'আলোর ফুলকি' প্রভৃতি বইগুলির ভাষা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে, এবং এ-ভাষার পরিচয় দিতে হলে বহু উদ্ধৃতি দিয়েও তৃপ্তি পাওয়া যায় না। এ-ভাষা সম্বন্ধে শুধু এটুকু লক্ষ্য করবার যে, 'রাজকাহিনী'র সহজ সরল বর্ণনাত্মক ভাষার সকল গুণ এ-ভাষায় উপস্থিত, এবং তার সঙ্গে মিশেছে, আরো সংযতরূপে, 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুলে'র কবিত্ব এবং অবনীন্দ্রনাথের সহজ চিত্রব্যঞ্জনা। তাই এই ভাষার পরিণত রূপের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয়, কেবলমাত্র ভাষাশিল্পী হিসাবে বিচার করলে অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তুলনার যোগ্য।

অথচ আশ্চর্য এই যে, আজ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ বাংলার প্রধান গদ্যলেখকদের মধ্যে পরিগণিত হন নি। এর কয়েকটি কারণ সহজেই মনে আসে। প্রথমতঃ, তিনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র; রবীন্দ্রনাথের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার দীপ্তি তাঁর পরিবারের সকলের প্রতিভা ও কৃতিত্বকেই কিছুটা প্রচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যক্ষেত্রে যে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সৌরদীপ্তির পাশে প'ড়ে তা অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে বলেই, তদনুযায়ী খ্যাতি তাঁরা লাভ করতে পারেন নি। এঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম কৃতী-লেখকও রবীন্দ্রপরিবারভুক্ত না হয়ে এর চেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছেন। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কৃতিত্বের সমুচিত স্বীকৃতি না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ, চিত্রশিল্পে তাঁর অসামান্য খ্যাতি। চিত্রশিল্পের খ্যাতি অবনীন্দ্রনাথের ভাষাশিল্পের যথাযোগ্য খ্যাতিকে প্রচ্ছন্ন করেছে। তৃতীয় কারণ, যা আমার কাছে সবচেয়ে বড় কারণ বলে মনে হয়, তা এই যে, অবনীন্দ্রনাথ মৌলিক গল্প-উপন্যাস বা কাহিনী-উপাখ্যান লেখেন নি বললেই হয়। তাঁর অধিকাংশ রচনাই হয় প্রাচীন

বিষয়ের নবরূপায়ণ, নতুবা স্মৃতিচিত্র, অথবা উদ্ভট আজগুবি রাজ্যের আলো-আঁধারিতে মেশা কাহিনী বা যাত্রা পালা। বিষয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে শেষোক্তগুলিরও উপাদান প্রাচীন আখ্যান-উপন্যাস-পুরাণ-ইতিহাস থেকেই নেওয়া। আমাদের দেশে কবিতা-গল্প-উপন্যাস, বিশেষ করে শেষের দুটি না লিখলে সাহিত্যিকরূপে খ্যাতি অর্জন দূরে থাক, গণ্য হওয়াই শক্ত। কাজেই লেখক হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য যে অধিকাংশ পাঠকই হৃদয়ংগম করেন না, এটা আশ্চর্য নয়। বিশেষতঃ, অবনীন্দ্রনাথের ভাষার প্রকৃত অসাধারণত্বের উপলব্ধি বৈদগ্ধ্যসাপেক্ষ। পূর্বেই বলেছি, সহজ সরল নিরাভরণ এ ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য সাধারণ পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই অবনীন্দ্রনাথ, যিনি গল্পলেখক নন, ঔপন্যাসিক নন, প্রচলিত অর্থে কবিও নন, তিনি মুষ্টিমেয় অনুরাগী পাঠকের কাছেই মাত্র একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাশিল্পীরূপে শ্রদ্ধেয় হয়ে রইলেন। বয়স্করা অতিসরল, অথবা উদ্ভট-আজগুবি ব'লে তাঁর রচনাগুলিকে ছোটদের পাঠ্য বলে ধরে নিল, আর ছোটরা 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুল' 'রাজকাহিনী' 'নালক' এবং কিছু পরিমাণে 'বুড়ো আংলা' ভিন্ন আর কোনো বইয়েরই ভাষা কল্পনা কবিত্ব ও চিত্রগুলির প্রকৃত রস গ্রহণ করতে সমর্থ হল না। কারণ একমাত্র 'ভূতপত্‌রী' ভিন্ন 'খাতাঞ্চির খাতা' বা যাত্রাপালা জাতীয় বাস্তবে ও আজগুবি কল্পনায় মেশা বইগুলির প্রকৃত রস সাধারণ শিশু বা কিশোরদের পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব। এ-সব বই অধিকাংশ বালক-বালিকারই ভালো না লাগা স্বাভাবিক।

আসলে এসব বইয়ে অবনীন্দ্রনাথের যে-মনটির পরিচয় পাওয়া যায়, তা শিশুর মত সরল ও কল্পনাপ্রবণ হলেও মহৎ শিল্পীর সূক্ষ্ম কবিত্ব ও শিল্পচেতনা-সমৃদ্ধ। এ-মনটির সংস্পর্শে এলে তাকে ভালো না বেসে পারা যায় না; এবং কেবলমাত্র ভাষার সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য করলে, সে ভাষায় মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত না হওয়াও অসম্ভব মনে হয়।

অবনীন্দ্রনাথের রচনাগুলিকে প্রধানতঃ চার ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। এক, প্রাচীন সাহিত্য উপন্যাস ইতিহাস ও বিদেশী কাহিনী প্রভৃতির উপর ভিত্তি ক'রে রচিত তাঁর 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুল' 'রাজকাহিনী' 'বুড়ো আংলা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি। দুই, তাঁর শিল্প সম্বন্ধীয় বইগুলি। তিন, স্মৃতিচিত্র-জাতীয় বইগুলি। চতুর্থ, তাঁর আজগুবি কল্পনার মুক্তাকাশবিহারী 'ভূতপত্‌রীর দেশ' 'খাতাঞ্চির খাতা' এবং যাত্রাপালাজাতীয় গ্রন্থগুলি। প্রথম শ্রেণীর বইগুলিতে অবনীন্দ্রনাথ যে ভাষার অবতারণা করেছেন, সহজ সরল কবিত্ব ও চিত্রব্যঞ্জনায় ভাষার দৃষ্টান্ত হিসাবে সেগুলি তুলনাহীন। বর্ণনাত্মক ব্যবহারিক ভাষার এক আশ্চর্য আদর্শ রূপ এগুলিতে দেখতে পাই। এই ঋজু তির্যক সহজ ভাষা সাহিত্যে কবিত্ব চিত্র ও ব্যঞ্জনাময় রূপ নিলেও, এই ভাষাই যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তার কবিত্ব বর্জিত হয়ে ব্যবহার হবার যোগ্য, শিল্প-প্রবন্ধের বইগুলিতে অবনীন্দ্রনাথ তা প্রমাণ করেছেন। বস্তুতঃ রাজকাহিনীর ভাষা এবং শিল্প-প্রবন্ধাবলীর ভাষা আধুনিককালে ব্যাখ্যা ও বিবরণাত্মক ভাষার এক আদর্শ স্থাপন করেছে। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচিত্র জাতীয় 'পথে বিপথে' 'আপন কথা' 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে' 'মাসি' প্রভৃতি বইগুলিতে কবিত্ব অপেক্ষা চিত্র বেশি, এবং তা আরো অসাধারণত্ব লাভ করেছে সেই চিত্রের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের অদ্ভুত কল্পনায় মিশ্রিত হয়ে। তাই তাঁর চোখে-দেখা ঘটনার বর্ণনাগুলিও অ-লৌকিক জগতের ছায়াছবি বলে মনে হয়। চতুর্থ শ্রেণীর বইগুলি অবনীন্দ্রনাথের উদ্ভট আজগুবি লোকোত্তর কল্পনার সৃষ্ট অসম্ভব রাজ্যের কাব্য। এবং, আমার মনে হয়, এই রাজ্যে বিহার করার দিকেই অবনীন্দ্রনাথের মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। শেষজীবনে যে তিনি

পুরাণ কাহিনী ইতিহাস প্রভৃতিকে আজগুবি কল্পনায় মিশিয়ে যাত্রাপালাজাতীয় রচনাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন, এতেও এই কথারই যেন সমর্থন পাওয়া যায়।

এই যাত্রাপালাগুলি অবনীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব শিল্পলোকের সৃষ্টি। শিল্পসম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আমি তো বলি যে আর্টের তিনটে স্তর তিনটে মহল আছে—একতলা, দোতালা, তেতলা। একতলার মহলে থাকে দাসদাসী তারা সব জিনিস তৈরি করে।...তারা হচ্ছে সার্ভার, মানে ক্র্যাফ্‌ট্‌সম্যান—তারা একতলা থেকে সব-কিছু ক'রে দেয়। দোতলা হচ্ছে বৈঠকখানা। সেখানে থাকে ঝাড়লণ্ঠন, ভালো পর্দা, কিংখাবের গদি, চারদিকে সব-কিছু ভালো ভালো জিনিস, যা তৈরি হয়ে আসে একতলা থেকে, দোতলার বৈঠকখানায় সে-সব সাজানো হয়। সেখানে হয় রসের বিচার, আসেন সব বড়ো বড়ো রসিক পণ্ডিত। সেখানে সব নটীর নাচ, ওস্তাদের কালোয়াতি গান, রসের ছড়াছড়ি— শিল্পদেবতার সেই হল খাস-দরবার। তেতলা হচ্ছে অন্দরমহল, মানে অন্তরমহল। সেখানে শিল্পী বিভোর, সেখানে সে মা হয়ে শিল্পকে পালন করছে, সেখানে সে মুক্ত, ইচ্ছে-মতো শিশু-শিল্পকে সে আদর করছে, সাজাচ্ছে।

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালাগুলি অবনীন্দ্রনাথের সেই অন্দরমহলের কাজ, যেখানে তিনি আত্মবিভোর হয়ে তাঁর স্বকীয় প্রবণতাকে মুক্তি দিতে পেরেছেন। অবনীন্দ্রনাথ যে শেষ জীবনে পুতুল তৈরি করতেন সেগুলিও এই তিন তলারই কাজ। সাধারণ লোকের পক্ষে এগুলির তাৎপর্য বোঝা শক্ত। এখানে শিল্পী আত্মভোলা, আত্মবিভোর হয়ে নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে আছেন।

অবনীন্দ্রনাথের আজগুবি কল্পনার বইগুলি, এবং বিশেষ ক'রে তাঁর যাত্রাপালাগুলি নিয়ে পৃথক্‌ ভাবে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে বলে মনে করি। অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে যে স্বাভাবিক অভিনয়-ক্ষমতা এবং অভিনয়-প্রবণতা ছিল, তার সঙ্গে এ বইগুলিতে যুক্ত হয়েছে তাঁর অলৌকিক কল্পনাশক্তি, অদ্ভুত কবিত্ব ও চিত্রব্যঞ্জনাময় ভাষারচনার ক্ষমতা মনের মধ্যে জমানো চোখে-দেখা অজস্র ছবিকে ফুটিয়ে তোলার শক্তি এবং আশ্চর্যমধুর একটি শিশুসুলভ সরল মন।

তবু, ভাষার আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করলে এক দিকে অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুল' 'রাজকাহিনী' 'আলোর ফুলকি' ও শিল্প-প্রবন্ধাবলীর ভাষা ও অপর দিকে তাঁর স্মৃতিকথা-জাতীয় 'আপন কথা' 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে' 'মাসি' প্রভৃতির ভাষাই সর্বাধিক প্রবলভাবে সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী বলে স্বীকৃত হয়েছে। মনে হয়, অবনীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। এবং একজন প্রধানতম গদ্যলেখক বলে গণনা করবার সময় এসেছে।

যে দেখতে জানে

লীলা মজুমদার

সাহিত্যসমালোচনার খাতাগুলি থেকে মাঝেমাঝে এক-এক জনার নাম বাদ পড়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন। সম্ভবতঃ এর প্রধান কারণ হল যে, খ্যাতির রাজ্যে অবনীন্দ্রনাথের দু জন বড় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।—এক জনের নাম রবীন্দ্রনাথ, যাঁর সঙ্গে তুলনা করলে সেই সময়কার অপর সকলের প্রতিভাকেই খর্ব মনে হত ; অপর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন সেই অবনীন্দ্রনাথ, যিনি ছবি আঁকতেন। বিশেষ করে এই দ্বিতীয় জনের জন্যই সে সময় সাহিত্যক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের তেমন নাম হল না।

সেরকম খ্যাতি তখন পেলেন না, অথচ যেই তাঁর লেখা পড়ত সেই অবাক হয়ে যেত। কলম ধরে এক ছত্র লিখলেই সে লেখাতে আলো ঝলমল করত। কাঁচা হাতের লেখাতেও যেমন, পাকা হাতেও তেমনি। সারা জীবনেও প্রতিভা তাঁর এতটুকু ম্লান হয় নি।

'ক্ষীরের পুতুল' যখন লিখলেন, নবীন বয়স তাঁর, তবু মনে হয় মধুতে ডোবানো কলমের মুখটি। 'মাসি' লিখলেন প্রবীণকালে, তখনো লেখনী থেকে তেমনি মধু ঝরছে, তেমনি নিগূঢ় অর্থ দিয়ে ঠাসা। অথচ এই বড় আশ্চর্য যে, অনেককাল পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের বিষয় লিখতে গেলে তাঁর চিত্রকলা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হত, কিন্তু সাহিত্যের কথা বিশেষ কিছু বলা হত না।

যে মন্দ জিনিসের আদর করে তার চেয়েও অনেক বেশি অভাজন সেই মানুষ যে ভালো জিনিসের আদর করতে জানে না। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনা বাদ দিয়ে কেবল চিত্রকলার কথা বললে তাঁর পরিপূর্ণ প্রতিভার সবখানির স্বীকৃতিও হয় না, উপলব্ধিও হয় না।

রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে তাঁর ছবির কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত। বরং এ কথাই বারবার মনে হয় যেসকল জিনিস সাহিত্যে তিনি পরিহার করে চলেছিলেন, হঠাৎ একটি অসতর্ক মুহূর্তে দরজা খোলা পেয়ে হুড়মুড় করে তারা-সব মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছে। লিখতেন মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন সুখদুঃখ আশা নিরাশা ব্যথা আনন্দ বিফলতা ব্যগ্রতা ভালোবাসা নিয়ে ; আঁকতেন যত দুঃস্বপ্নে-দেখা কল্পনায়-গড়া সব মূর্তি। অবনীন্দ্রনাথের বেলা তেমনটি হয় না। তাঁর সারা জীবনের সব প্রচেষ্টা— তাঁর ছোটবেলাকার আশ্চর্য জিনিস খুঁজে বেড়ানো, তাঁর অভিনয়, তাঁর এসরাজ বাজানো, তাঁর লেখা, তাঁর ছবি আঁকা, তাঁর খেলনা তৈরি,— সবটি নিয়ে হিসেব করলে তবে তাঁর জীবনজোড়া রূপের সাধনার কতকটা ধারণা করতে পারা যায়। প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে, একটিকে বাদ দিলে অপরটির অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। যারা শুধু ছবি দেখে তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল, তারা তাঁর সবখানিকে পেল না।

আসল কথা হল অবনীন্দ্রনাথ কানে কানে খোঁজার মন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন। দুনিয়ার সব চেয়ে বড় রহস্যই হল যে যারা খুঁজতে জানে, তারা কোথাও মূল্যবান কিছু আছে মনে ভেবে খুঁজলেও, সেই একান্ত বাঞ্ছিতকে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে চায় না। পাওয়ার মধ্যে যে একটা অন্তিমভাব আছে, এ ধরণের খোঁজাতে তার ঠাঁই থাকে না। যা পাওয়ার অতীত এ তাকেই খোঁজা, তাই সবখানে না দেখা পর্যন্ত এ খোঁজার শেষও হয় না। রূপের সীমানা ছাড়িয়ে যায় যে অরূপ তাকেই খুঁজতেন নাচে গানে, রঙ্গমঞ্চে, নির্জন

একলা অন্ধকার ঘরে, কাচের মার্বেলের ভিতরে, ছবিতে, ফুলেতে, গাছের শুকনো ডালেতে, নুড়ি-পাথরের মাঝখানে। জানতেন, তাকে নয়ন ভরে দেখতে পাওয়াই বহু ভাগ্য ; তাকে কখনো হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয় না। মনের মধ্যে তাকে পেতে হয়, মুঠোর মধ্যে নয়।

রূপের সাধনা করতেন। জানতেন, ও জিনিস কেউ কাউকে দিতে পারে না, উত্তরাধিকার সূত্রেও না। ও তো থলিতে পুরে ঘরের মধ্যে পুঁজি করবার জিনিস নয় ; যতদিন-না চোখ খুলে গেল, ওকে চোখে দেখাই যাবে না। প্রত্যেককে দেখতে হবে নিজের মতন করে, নিজের চোখ দিয়ে। একজনার দেখা চুরি করে অপর জন দেখতে পায় না।

বাগেশ্বরী বক্তৃতা দিতে গিয়ে শিল্পের ছাত্রদের বলছেন—

প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্ন ধরার জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে, তার পর বসে থাকা— বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে চুপটি করে নয়— সজাগ হয়ে।

পাওয়ার কথা নিয়ে আরো বলছেন—

মনের ফুল বনের ফুলের সাথী হয়ে ফুটল, এর বেশিও তো শিল্পর দিক থেকে চাওয়ার প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার যেখানে যত শিল্পী যত সাহিত্যিক জন্মেছেন সকলের মনের গোপন কথাটাও অবনীন্দ্রনাথ বলে দিচ্ছেন—

এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে যেদিন অতিথি হলেম, রসের পূর্ণপাত্র তো কারু সঙ্গে ছিল না ; একেবারে খালি পাত্রই নিয়ে এলেম, এল কেবল সঙ্গের সাথী হয়ে একটুখানি পিপাসা।

তাই দিয়েই বিশ্বের সেরা স্রষ্টিকারদের চেনা যায়, ঐ একটুখানি পিপাসা, যা অমৃত না পেলে আর কিছুতেই মেটে না।

ছবির সঙ্গে লেখার কতই-না সাদৃশ্য। ছবিতে দেখি পটভূমি হয় সোনালি আলোতে উদ্ভাসিত, সেই আলোর আভা লেগে চিত্রিত রূপখানিও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। নয় তো পটভূমি কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে, চিত্রিত রূপখানিও তেমনি ছায়াময়, মায়াময়। সমস্ত ছবিটির অর্থের পরমার্থ হয়ে মাঝখানের মূর্তিটি যেন ফুটে উঠেছে।

সাত রঙের ছায়ায় মোড়া ঝিনুকের ভিতরে মুক্তো যেমন ঝিনুকের সমস্ত মর্যাদা নিয়ে অর্থময় হয়ে টলমল করে, তেমনি ছবিতে আঁকা পরিবেশটির সমস্ত মানে নিংড়ে নিয়ে ছবির মূর্তিটিও যেন কায়া ধরে। মূর্তি কোথায় শেষ হয়ে পটভূমি শুরু হল, পটভূমি কোথায় শেষ হয়ে চোখে দেখার বাইরে গেল—হঠাৎ যেন বুঝে ওঠা মুশকিল হয়ে পড়ে।

লেখার মধ্যেও এই রহস্যই দেখি, চোখে-দেখা আর মনে-গড়া একাকার হয়ে গেছে। যে ঘটনা ঘটছে তাকে ঘিরে রয়েছে যে পরিবেশ, সেও যেন ঐ ঘটনার মানুষদেরই যোগ্য হয়ে উঠেছে। গাছপালা ঘরদোর জন্তুজানোয়ার সবার সঙ্গে সবাইকে কেমন মানিয়েছে। এমন লেখা আর কেউ লেখে নি ; চোখে শুধু একটু রূপের নিশানা নিয়ে, যা হয় আর যা হয় নি, তার মধ্যে এমন করে কেউ আনাগোনা করে নি।

বইগুলি যে সংখ্যায় খুব বেশি, তাও নয়। আজকালকার লোকে ঐটুকু দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নাম কেনবার আশা বৃথা মনে করে। ভাবে, বিশখানি বই লিখলে তার মধ্যে থেকে যদি পাঁচখানি উতরে যায়, তবেই সার্থক সাহিত্যিক হওয়া গেল।

সেকালের শিশুসাহিত্যিক হতেন যাঁরা, তাঁরা খ্যাতির আশা লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে তবে ছোটদের জন্য কলম ধরতেন। তাঁরাই ছিলেন জাতসাহিত্যিক। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় ইত্যাদি সবাই মিলে যতগুলি ছোটদের বই লিখেছেন সবকটিকে এক সঙ্গে আঙুলে গোনা যায়। সংখ্যা দিয়ে ওসবের পরিমাপ হয় না।

ছোটদের জন্য লিখতে হলে সেকালে লোকসান দিয়ে লিখতে হত, তাই নিতান্ত ভূতে-পাওয়ারা ছাড়া ছোটদের জন্য বড়-একটা কেউ লিখতেন না। আর, ঠাকুরবাড়ির কথা তো ছেড়েই দেওয়া যেতে পারে, কারণ তাঁরা ব্যাবসাক্ষেত্রে লোকশান দিয়ে দিয়ে ও-বিষয়ে পারদর্শী হয়েছিলেন। 'ঘরোয়া'তে নিজেই বলেছেন যে, শখের তাগাদা মানুষকে যতদূর তাড়িয়ে নিয়ে যায় তেমন আর কিছুতে যায় না। কর্তব্যের জন্য একজন সর্বস্বান্ত হলেই ইতিহাসের পাতায় তার নাম সোনার অক্ষরে উঠে যায়, এতই দুর্লভ। শখের জন্য কত মানুষ যে দেউলে হয়ে গেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। এও সেই একটুখানি পিপাসারই রূপান্তর মাত্র।

আর, শুধু শিশুসাহিত্য কেন, সেকালে ছবি এঁকে, বই লিখে, গান বেঁধে, হেঁসেলে হাঁড়ি চড়ানো যে কত কঠিন ব্যাপার ছিল সে কথা কে না জানে। ওগুলোকে মানুষ হয়ে জন্মানোর দর্শনী বলেই লোকে ধরে নিত ; পয়সা দিয়ে কিনলে ওর যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয় না এ কথা জানত, এদিকে শিল্পী খ্যাতির পেত প্রচুর, ওদিকে ট্যাঁক শূন্য থাকত।

কিন্তু অবনবাবুরা ছিলেন সুখী লোক, রসের চর্চা তাঁদেরই সাজত। তাই লাভক্ষতির কথা একবারও না ভেবে প্রাণ ঢেলে দিতে পেরেছিলেন। শেষে যখন সাগরে ভাঁটা পড়ল, কিই বা তাঁর এসে গেল!

একখানি একখানি করে বইগুলির বিচার করতে গেলে কোন্‌গুলি ছোটদের বই, কোন্‌গুলি বা বড়দের জন্যে, সেই নিয়ে ধাঁধা লাগে। বহু সাহিত্যানুরাগী বলে থাকেন ছোটদের বই বড়দের বই বলে সাহিত্যে আলাদা কিছু নেই। কোনো কোনো বই ছোটদের বোঝবার বাইরে, সেগুলিকে বড়দের বই বলা চলে। ওদিকে ছোটদের বই সত্যি করে ভালো হলে বড়দেরও উপভোগ্য হবে। অবনীন্দ্রনাথের বইগুলি এসব পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

কেমন ধারা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ নামের মানুষটি? গুটিকতক প্রিয় শিষ্য ছাড়া আর বড় কেউ যে তাঁর সবটুকুকে বুঝতে পেরেছিল এমন মনে হয় না। অবিশ্যি, তাঁর শিল্পসাধনা দেশে বিদেশে বহু সম্মান পেয়েছিল।

সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ পরিচয় থাকে তার রচনাতে। সেইখানেই তাকে সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়। সেগুলিকে বাদ দিলে, তার জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাগুলি কৌতূহলোদ্দীপক হলেও অকিঞ্চিৎকর। অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা-কিছু লেখা হয়েছে তার কোনোটার মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁকে খুঁজতে হবে তাঁর বইগুলির মধ্যে, তাঁর ছবিতে। অন্ততঃ এখনকার লোকে যে বইগুলি থেকে তাঁর জীবনকথা পড়ে— তাঁর নিজের রচিত 'ঘরোয়া' কিম্বা 'জোড়াসাঁকোর ধারে'— সে বই-দুটির মধ্যেও তাঁকে ততখানি পাওয়া যায় না, যেমন পাওয়া যায় 'পথে বিপথে'তে 'আলোর ফুলকি'তে 'মাসি'তে।

'জোড়াসাঁকোর ধারে' আর 'ঘরোয়া' হল সেই ঝিনুকের খোল ; মুক্তোটি আলাদা জিনিস। ও দুখানি বইতে অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের দু বাড়ির তিন পুরুষের ঘরগৃহস্থালির কথা থেকে শুরু করে তাঁদের শখ সাধ

খেয়ালের কথা লিখলেও নিজে ধরা দেন নি। তবে পারিবারিক জীবনের দিক থেকে বই-দুটিকে বিচার করতে গেলে বলতেই হবে ওদের জুড়ি নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিয়ের কথা লিখেছেন বটে, অথচ নিজের বিয়ের উল্লেখও করেন নি। তার কারণ বই-দুটি তো ওঁর নিজের বিষয় নয়।

এ কথাও অবশ্য মানতে হবে যে, শুধু একটা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা দিয়ে তার জীবনকাহিনী লেখা হয় না, সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অনুষঙ্গ ও পরিবেশ জড়িয়ে থাকে। মনে হয় এক্ষেত্রে মুক্তোটিও নিশ্চয় ঐ ঝিনুকেরই উপযুক্ত হয়েছিল।

'ঘরোয়া'তে আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে অবনীন্দ্রনাথ ওঁদের ঐ বিশাল দুই বাড়িতে ঠাসা ঠাকুর-পরিবারকে তাদের তিন পুরুষের অনুচরবর্গ-সুদ্ধ আমাদের সামনে হাজির করেছেন। চার মহলের জীবনযাত্রাকে চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

সদরমহলের গানবাজনা, শখের থিয়েটার, সাহিত্যচর্চা, শিল্পচর্চা, পায়রা-ওড়ানো, লোক খাওয়ানো, গোটা থিয়েটার ভাড়া করে অভিনয় দেখা, স্বদেশী মেলা, স্বদেশীয়ানা— কোনো কিছুই বাদ পড়ে নি।

অন্দরমহলের বাসিন্দাদের চুলবাঁধার সরঞ্জাম, সোনারুপোর পানের ডিবে, দুপুরবেলার তাসের আসর, গুণবতীদের গানবাজনা বিদ্যাচর্চা— সব কথাই আছে।

ছোটদেরও একটা মহল ছিল, অবনীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন তার বাসিন্দা। তাঁর চোখ দিয়ে দেখা বহুদিন লুপ্ত হয়ে যাওয়া জোড়াসাঁকোর সেই পুরোনো বাড়িটা হঠাৎ যেন বেঁচে উঠে কথা কইতে শুরু করে। গোটা থিয়েটার ভাড়া করা হয়েছিল যেদিন, কাদের বাড়ির মেয়েরা ওঁকে চিমটি কেটেছিল; পার্টিতে যোগ দেবার অনুমতি আদায় করেছিলেন যেদিন, বৃষ্টি পড়ে সেদিন সব পণ্ড হয়ে গিয়েছিল; দারোয়ানজির সাদা দাড়িতে হাত দিয়ে শেষে নাস্তানাবুদের একশেষ হতে হয়েছিল; মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে মতভেদের মর্মান্তিক পরিণাম হয়েছিল— কিন্তু সেই ছোট ছেলেটি বড় হয়ে কেমন হয়েছিল?

আবার অনুচরবর্গেরও একটা আলাদা মহল ছিল। বই পড়তে পড়তে তাদের হাঁকডাকে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। চোখের সামনে যেন মহর্ষির খাসবেহারা গোছা গোছা মলমলী থান ছিঁড়ে রুমাল বানিয়ে দেয়। সেগুলি একবার মাত্র ব্যবহারের পর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। কে একটা লোক এসে রেষারেষি করে, বাজি ধরে, এক মণ তাজা রসগোল্লা খেয়ে ঘোষালের কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে চলে যায়।

অবনীন্দ্রনাথের কলমের দুই আঁচড়ে তিন পুরুষের ঠাকুরবাড়ি গমগম করতে থাকে। শুধু অবন ঠাকুরকেই পাওয়া যায় না। তাঁর আত্মীয়স্বজনের হট্টগোল তাঁকে ছাপিয়ে যায়।

'জোড়াসাঁকোর ধারে'র ভূমিকাতে লেখক নিজেই বলছেন—

> মুখের কথা লেখার টানে ধরে রাখা সহজ নয়, প্রায় বাতাসে ফাঁদ পাতার মতো কঠিন ব্যাপার।

এ তো হল মুখের কথার কথা, মনের কথার নাগাল পাওয়া আরো অনেক শক্ত ব্যাপার।

শক্ত হলেও অসম্ভব নয়; গোটা কতক বইতে অবন ঠাকুর ধরা দিয়েছেন। ঐ যে বললুম, বিশেষ করে তিনখানিতে হয়তো নিজেরই অজ্ঞাতে এমন-একটি অন্তরঙ্গতার সুর ফুটে উঠেছে যে সহসা মনে হয় এবার বুঝি ধরাছোঁয়ার মধ্যে এলেন। যথা, 'পথে-বিপথে'তে 'আলোর ফুলকি'তে 'মাসি'তে।

অবনীন্দ্রনাথ রবিকাকার গভীর ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কোনো রচনাতেই রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণের চেষ্টা নেই। অবনবাবুর ছবি ও লেখা তাঁর একান্ত নিজস্ব। তাঁর ভাষাতেও কোথাও রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি নেই। এর থেকেই তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তার বেশি বলাই বাহুল্য।

বাংলা সাহিত্যের যদি শ্রেণীবিভাগ করতে হয়, রবীন্দ্রনাথের ভক্তদের বিরাট দলকে স্বীকার করে নিতে হয় যাঁরা গোটা একটা রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে তাঁদের সাহিত্যসাধনার মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু সে দল থেকে তাঁর ভক্তদের এই সেরা ভক্তকেই বাদ দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ অবনের মনের দরজার চাবি খুলে দিয়েছিলেন নিঃসন্দেহ; তার চেয়েও বড় কাজ করেছিলেন যে, খোলা দরজা দিয়ে তাকে বেরিয়ে পড়বারও নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথও যেমন কারও অনুকরণ করেন নি, তেমনি অবনীন্দ্রনাথেরও কোনো উল্লেখযোগ্য অনুকরণ হয় নি। কেবলমাত্র তাঁর রবিকাকার 'সে' পড়লে একটা সাদৃশ্যের কথা মনে হয়। অবনীবাবুর এই অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্যকে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

মনে হয়, তাঁর দুনিয়া দেখার ঢঙটিই আলাদা রকমের। সাধারণের উপর রং না লাগিয়ে, তার ভিতরকার অসাধারণত্বটুকু প্রকাশ করে দেন। যদি তাঁর কাহিনীকে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার সম্ভাবনার কথাও মনে আসে। কোথাও যেন অস্বাভাবিক কিছু নেই। যে পড়বে তারই মনের একটা সূক্ষ্ম তারে গুঞ্জন উঠবে। ঠিক সুরটি ধরলে সেতারের তারে যেমন ওঠে। প্রত্যেকের মনের ভিতরে যেসব ছোট ছোট দুর্বলতা ব্যর্থতা শখ সাধ ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে, সেগুলি যেন হঠাৎ ভাষা পায়।

'মাসি' কিছু নাম-করা বই নয়, সাধারণ পাঠক হয়তো এর নামও শোনে নি, কিন্তু এর মধ্যে বিশাল একটা মন-কেমন-করা অতীত এসে ধরা দেয়। সে অতীত আসলে ডালপালাবহুল বিরাট ঠাকুরবাড়ির অতীত নয়, সে অবন ঠাকুরের একান্ত নিজস্ব একটা অতীত, তাঁর একান্ত আপনার প্রিয় জিনিসপত্র মানুষজন নিয়ে এসে তবু পাঠকের মনকে আকুল করে।

এই হল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা, অপরের হৃদয়ের তন্ত্রীতে সাড়া জাগে কি না। ছবি আঁকিয়ের চোখ দিয়ে দেখা এই অতীতকাল, টুকরো টুকরো মনে-রাখা কথা হয়ে স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে না, সমগ্র একখানি হারানো কাল হয়ে, তার রাশি রাশি অকিঞ্চিৎকর খুঁটিনাটি নিয়ে, যা আর ফিরে পাবার নয় তার জন্যে পাঠককে ব্যগ্রব্যাকুল করে তোলে। যা ছিল নিতান্ত অবনীন্দ্রনাথের মনের ব্যথা তা সবাকার অতি পরিচিত, অতি গোপনে বুকের মধ্যে পুষে রাখা বিরাট একটা দুঃখ হয়ে দেখা দেয়। অথচ হাসিঠাট্টা-মেশানো ছোট ছোট কয়েকটি কথা ছাড়া আর কোনো উপকরণ নেই। একটুখানি পরিচয় দিই—

এমন কাউকে দেখি না যে শুধিয়ে জানি, মাসি কোথায়। মাসি, মাসি বলে ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল। একবার মনে হল যেন অন্দরবাড়ির দিকটায় কে যেন ডাকল 'মাসি গো মাসি'। তার পরেই যে চুপ সেই চুপ, নিঃসাড়া পুরী। ছুটলুম অন্দরের দিকে, বল্লি মাসির যদি দেখা পাই সেখানে। দালান, দরদালান, গলিঘুঁজি, চাকর-দাসীদের ঘর পেরিয়ে পালকিদোরের সামনে যেয়ে দেখি, মাসি, সেই যে আমাকে সময় ভোলা ঘড়িটি দিয়েছিলে, আর আমি যেটিকে ভোলানাথের ঘড়ি নাম দিয়ে, ঠিক পালকিদোরের উপরে বসিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা ঠিক তেমনি বসে আছে— দ্যালে গাঁথা, চাঁদ-ওঠার দিকে চেয়ে। দেখে সাহস হল, তবে হয়তো মাসিও আছে। এক ছুটে দোতালায় উঠে গেলেম তোমার ঘরে, মাসি। কোথায় মাসি! খালি ঘর চুপচাপ সবুজ খড়খড়ি বন্ধ করে অঘোরে পড়ে আছে।

নিন্দুকেরা বলেন অবনীন্দ্রনাথের লেখার মাথামুণ্ডু নেই, বড় খামখেয়ালী, দুঃখের কথা বলতে গিয়েও তার মধ্যে হাসিতামাশা, এতে সাহিত্যের গাম্ভীর্য নষ্ট হয়। অবনীন্দ্র নাবালক।

সাদা চোখে দুনিয়াকে যেমন দেখা যায়, সে তো শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে দেখা নয়। সে দেখা হল হুবহু যেখানকার যেমনটি আছে, শুধু তাই দেখা। ফটো তোলে যে, সে যেমন দেখে। শিল্পীর চোখে অন্য দৃষ্টি থাকে; যা কেউ দেখে না, তাই সে প্রকাশ করে। তার শিল্প তো বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয় নিজেরাও খানিকটা সে তার সঙ্গে দেয়। সাহিত্যের বেলাতেও তাই। সত্য ঘটনার অনুবৃত্তি তার লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য সত্য। সে সত্য তার চোখে যখন যেমন ভাবে দেখা দেয়।

হাসি কান্না পৃথিবীময় জড়াজড়ি করে থাকে, যে অভিভূত হয়ে পড়ে সে শুধু হাসিটুকুই দেখে, কিম্বা কান্নাটুকুই দেখে; আর শিল্পী দেখে সব একাকার। অবনীন্দ্রনাথের সব দেখাই এই শিল্পীর দেখা। নাবালক না হলেও, এও সত্যি যে যারা ছোটদের জন্য গল্প লেখে, একটা ছোট ছেলে তাদের মনের মধ্যে নিরন্তর বাস করে। বয়স্ক বিচারে তাই মাঝেমাঝে নাবালকত্বর অভিযোগ আসে। এমনকি অনেক নব্য সাবালকও অবন ঠাকুরের ছেলেমানুষি শুনে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে! ঐ ছেলেমানুষির একটু নমুনা দিই—

মাসির শহরতলীর নতুন আস্তানায় অবু গিয়ে দেখে সাবেক বাড়ির অনেক জিনিস সেখানে গিয়েও উঠেছে, কিন্তু কাজ করবার মানুষগুলো কেউ আসে নি। আসে তো নি-ই, বরং এদিক ওদিক থেকে জিনিসপত্র কিছু কিছু সরিয়েছে। মুন্সি নিয়েছে লাঠি-গাছা; হারুন্দে-মারুন্দে নিয়েছে লণ্ঠন আর পালকি।

অবুর রাগ দেখে কে! দিয়েছে পুলিশের কাছে এক কলম ঝেড়ে। মাসি তাই শুনে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন,

'করেছিস্ কি! তারা হল পুরোনো চাকর!'

অবু বলে, 'পুরোনো চাকর তো এল না কেন তোমার সেবা করতে এখানে? তোমাকে এই বনালয়ে একা একা পাঠিয়ে, তারা কেউ গেল মামার বাড়ি, কেউ গোসাইপাড়ায় শ্বশুরবাড়ি। আরামে থাকবেন, আর দরকার হলেই লিখবেন— পত্তর পাঠ মনিঅর্ডার করিলেই যাইব।

কেউ লিখবেন, আমি বাটি আসিয়া কালাজ্বর নুমোনিয়া ইত্যাদিতে শয্যাগত। এক বোতল সালসা পাইলে এ যাত্রা রক্ষা পাই। এই পত্র টেলিগ্রাফ বলিয়া জানিবেন।

এই ব্যাভার তোমার সঙ্গে মাসি। যা এক কলম ঝেড়েছি, পুলিশের ঠেলায় তোমার পায়ে এসে পড়বার পথ পাবে না দেখো!'

মাসি তখন মনে করিয়ে দেয় এরাই-না নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে এ বাড়ির লোক হয়ে গিয়েছিল। বাসন মাজত, কাপড় কাচত, রাঁধাবাড়া করত, সেবা করত, বাঁশের আগায় আকাশী পিদুম ঝোলাত, সব সময় মাইনেও নিত না, বাড়ির ছেলেপুলে জন্তুজানোয়ারদের দেখত, বিনি পয়সায় এটা ওটা এনে হাতে দিত, কাঁধে চাপিয়ে ঘোড়া হত, চাঁদামামা চেনাত, আনন্দের ব্যাপারে ভাগ বসাত— এদের নামে কখনো হুলিয়া বের করতে আছে?

এ ধরণের ছেলেমানুষির বাসা হল বুকের নীচে। মাঝেমাঝে সেখানটা টনটন করে ওঠে।

এই অবনকে 'পথে বিপথে'ও দেখা যায়। সর্বদা কি যেন খোঁজে; চোখে কিসের ঘোর লেগে থাকে; একটা কিছুর একদিন তার সন্ধান মিলবে, এ আশা ঘোচে না। এই মানুষরা যেমন শিশুসাহিত্য লিখতে পারে তেমন আর কেউ পারে না। সদাই আশ্চর্য হবার ক্ষমতা, মুগ্ধ হবার ক্ষমতা, বিশ্বাস করবার ক্ষমতা— এ কি যেখানে সেখানে দেখবার জিনিস?

শিল্পিকারের কবি না হলে এ ক্ষমতাও থাকে না, এ চোখও থাকে না। কিন্তু যে নিদারুণ অতৃপ্তি কবিদের জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেয়, অবনীন্দ্রনাথের বেলায় কেমন করে সে কোমল স্নিগ্ধ হয়ে আসে। রূপকে যে মুঠোয় করে ধরে রাখতে হয় না, অবন ঠাকুর ছবি লেখে তাই সে জানে। প্রাণে তার প্রদীপ জ্বলে, তার আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়, পোড়ে না।

নিজের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখবার শক্তি ছিল ঋষিদের। 'পথে বিপথে'র প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে দুটি চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। একজন হল অবিন। তার কাণ্ড দেখে অন্য জন, যার নাম অবু, সে কেবলই অবাক হয়। অবাক হয় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তেমন ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে জড়ায় না। অবু আর অবিন দুজনাই পরস্পরকে বাইরে থেকে দেখে। দুজনাই নিজের মনের কথা জানে, আর দুজনাই অপরজনকে বাইরে থেকে দেখে।

এই তো হল শিল্পের নিগূঢ়তম সত্য, এই হল কবিদের অমরত্বের মূল। অবিন আর অবুর দেখা হয় বরানগরের জাহাজঘাটে, দেখা হবামাত্র দুনিয়াটা রহস্যের কুয়াসাজালে নিজেকে জড়িয়ে দেয়, সম্ভব-অসম্ভবের প্রভেদ ঘুচে যায়। যা হবার আর যা হবার নয়, তার মাঝখানকার গূঢ় যবনিকাখানি অমনি থরথর করে কাঁপতে থাকে।

জাহাজের ডেকে একদিন অবিন অবুকে একখানি পুরানো ছবি দেখালে। সবটা তার কালোয় কালো, শুধু একজোড়া সুন্দর চোখ দেখা যাচ্ছে, তাও নজর করে দেখতে হয়। ছবিখানি নাকি অবিনদের সাবেক বাড়ির অন্তরঙ্গ এক বৈঠকখানা-ঘরে পাওয়া গেছে। যার চোখ, অবিন তার নাম দিয়েছে মোহিনী। মোহিনীর ভুতুড়ে চাহনি বন্ধুরা সইতে না পেরে, অবিনকে ছেড়ে সবাই চলে গেছে। অবিন বললে—

> আমি একলা ঘরে; আর আমার মনের শিয়রে, অন্ধকারের পর্দার ওপারে, মোহিনী। যবনিকা তখনো সরে নি, চাঁদ তখনো ওঠে নি। নীল ঘেরাটোপ দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আমার শ্যামাপাখি। তার সুর আমি শুনতে পাই, তার দুখানি ডানার বাতাসে নীল আবরণ দুলছে দেখতে পাই। আমার প্রাণের কান্না সে গান দিয়ে সাজিয়ে সুর দিয়ে গেঁথে আমাকেই ফিরে দেয়। কেবল চোখে দেখা আর দুই বাহুর মধ্যে, বুকের মধ্যে এসে ধরা দেওয়া বাকি।

নানান রকম ভালোবাসার গল্পে ভরা বইখানি, ছবিকে ভালোবাসা, ছড়িকে ভালোবাসা, পাখিকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা। একজন টাকমাথা লোকের সঙ্গে দেখা হল স্টিমারে অবুর আর অবিনের, সেও বললে কিছু কিছু প্রেমের রহস্যের কথা। বললে—

> আমি প্রেমে পড়লেম। আসকের আগুন যদি মগজেই জ্বলত তবে সেটাকে টুপিচাপা দিয়ে সহজেই নেবাতে পারতেম। কিন্তু সে যে খোদার নিজের হাতে জ্বালা বাতি, টুপি দিয়ে তাকে নেবানো চলে, এমন জায়গায় তিনি তাকে রাখেন নি। দুনিয়াকে রোসনাই দিতে সে বাতি তিনি জ্বালিয়েছেন বুকের মাঝখানে, প্রাণের সঙ্গে এক শামাদানে। সেই বাতির আলোয় যাকে আমি ভালোবাসলাম, তাকে কি সুন্দরই না দেখলেম।

এমনি করে অবুর আর তার বন্ধু অবিনের কাছে দুনিয়ার সব রহস্যের কথা এসে পৌঁছয়। অবিন তাতে অবাক হয় না, কিন্তু অবু হকচকিয়ে যায়। অবিনকে দেখে অবু আশ্চর্য হয়, অবিনের কথার খেই পায় না। এমনি করে অবনীন্দ্রনাথই অবনীন্দ্রনাথকে দেখেন, একজন স্বপ্নধরার সেই জাল বোনেন, অন্যজন অবাক হন। মনে হয় এরা কি করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বনেদী কায়দায় মানুষ করা ছেলে হবে! এরাই তো সারা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ায়, ছবি এঁকে, কাব্য লিখে, গান বেঁধে, যা পাবার নয় তাকে খুঁজে। ঘরবাড়ি নামধাম দিয়ে এদের পরিচয় হয় না।

'আলোর ফুলকি'র কথাও বলতে হয়। এমন প্রেমের কাহিনী কম আছে। বিদেশী প্রভাবে লেখা গল্প, ফরাসী লেখক এদমন্দ্ রস্তাঁদের গল্পের ভাব নিয়ে রচিত। এই ধার করা কাঠামোতেও অবনীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ঝলমল করে। মুরগীদের গল্প। রূপে রসে শব্দে গন্ধে স্পর্শে ভরা অপূর্ব ভালোবাসার কাহিনী। এই বইতে প্রেমতত্ত্বের এমন-একটি মর্মান্তিক সত্য আছে যা সব পাঠক সহজে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবেন না।

প্রেম হল যৌবনের বিলাস, কিন্তু প্রৌঢ়বয়সের একমাত্র অবলম্বন। আধাবয়সী কুঁকড়োর ঘরে চার-চারটে বউ আছে, বুড়ি মা আছে, ঘরকন্নার কোনো ত্রুটি নেই, তবু তার বুকের মাঝখানটি ফাঁকা। জীবন থেকে তার কাব্য বিদায় নিয়েছে। এমনি সময় সোনালি বনমুরগী উড়ে এসে জুড়ে বসল। কুঁকড়োর প্রবল পৌরুষের সঙ্গে প্রেমের অবুঝ আবদারের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল। পাওয়া না-পাওয়ার দোলা লাগল, সুগভীর আনন্দের সঙ্গে মর্মান্তিক দুঃখ এল। অবশেষে পৌরুষের পুরস্কার প্রেম এসে কুঁকড়োর বুকে ধরা দিল।

সমস্ত পার্থিব প্রেমের প্রতীক এই গল্প। যারা স্ত্রীপুত্র-চাকরিবাকরি নিয়ে ঘরকন্না করে, অথচ মাঝেমাঝে না-পাওয়ায় স্বপ্ন দেখে দিশাহারা হয়ে যায়, তাদের কাহিনী।

এত কথা বলেও তবু মনে হয় অবনীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না। আর পাঁচ জন সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। মামুলি ধরণের কথা কোনোদিনও বলেন নি। ঘটা করে সাহিত্যসাধনা কখনো করেন নি। মনের মধ্যে ফুলগুলি যেমন পাপড়ি মেলেছিল, অমনি দু হাত ভরে তুলে এনে সবার জন্যে ধরে দিয়েছিলেন! কথা বলার ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা কখনো বড় একটা ব্যবহার করেন নি। কিন্তু কি গভীর অর্থে ভরা সেইসব ঘরোয়া কথাগুলি।

শুধু দূর থেকে দেখেছিলেম অবনীন্দ্রনাথকে, মানুষটির বেশি কাছে যাই নি কখনো; বইয়ের মধ্যে ধরা দিয়েছেন যতখানি, আর প্রিয় শিষ্যদের কাছে যতখানি নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তার বেশি জানতে পারি নি। তাদের মধ্যে একজনার একখানি চিঠি থেকে খানিকটা তুলে দিই—

> সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির অত ছেলেমেয়ে কেউ আসত না তাঁর কাছে, একলাই কাটাতেন— বাগান থেকে বেরিয়ে। এটা লক্ষ্য করে, তারপর সঙ্গে থাকতাম· ·সন্ধ্যার সময় একটা সিগার বরাদ্দ ছিল· ·সিগারটা ধরিয়ে তার পর আরম্ভ হত। সে যে কোন্ জগৎ সৃষ্টি হত তা মনের মধ্যেই রয়েছে· ·অদ্ভুত সে মনের কথা; সৃষ্টি করার জগতে এমন করে আর কাউকে বলতে শুনলাম না, জানলাম না, কি সহজ, কি সুন্দর আর কি বিস্ময়কর। অপূর্ব এক লোকের মধ্যে নিয়ে যেতেন, রং দিয়ে রং সাজিয়ে; যখন বলতেন কত টেকনিকেল বিষয় থাকত, কিন্তু একবারের জন্যেও জটিল বিষয় আর জটিল থাকত না। তখনি গভীরভাবে অনুভব করতাম কি পরিপূর্ণতা দিয়ে মানুষটি কি ভরে, কতখানি ভরে থাকলে, এত সহজ করে, সুন্দর করে বলা সম্ভব হয়।· ·ওদিকে মায়াজগৎ সামনে ফুটে উঠত— আলোছায়া দিয়ে সব। এমন Truth of White আর দেখলাম না কোথাও। এমন অন্ধকারও দেখলাম না কোথাও। আলোর পাশে অন্ধকার, অন্ধকারের পাশে আলো। এরই মাঝখানে কারা সব উঁকি মারছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।· ·

একটা মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে খানিকটা সঙ্গে নিয়ে যায়, আর খানিকটা রেখে যায়। সেটুকু রেখে যায় পরবর্তী কালের বংশধররা তাই দিয়েই তাকে বিচার করে। কেউ জীবনকালে বহু খ্যাতির অধিকারী হয়, কিন্তু অন্তরালে গেলেই সে খ্যাতি ম্লান হয়ে যায়। আবার যতই দিন যায় কারও খ্যাতি ততই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথ সেই জাতের মানুষ। তাঁর ঐসব খামখেয়ালি লেখার মধ্যে যে গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে এতদিনে সাধারণের চোখে সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তবে এ ধরণের লেখার সবখানি উপভোগ করতে হলে যে সূক্ষ্ম মন চাই, তাই বা কজনার আছে?

তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে 'পথে বিপথে' আর 'আলোর ফুলকি' ছাড়া বাকি সব বই পড়ে ছোটরা আনন্দ পাবে। কেবল ও-দুখানি বইয়ের রস এখনও তারা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারবে না।

ছোটদের জন্যে এমন বই আর কেউ কখনো লেখে নি। যে শেখাতে চেষ্টা করে না, শুধু যেখানে যায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে, সেই হল জাতসাহিত্যিক। তাদের মধ্যে যাদের নিজের শৈশব শেষ হয়ে যায় নি, আসল শিশুসাহিত্যিক তারাই। বাংলা ভাষায় এমন দুজনারই নাম করা যায়, একজন সুকুমার রায়, অপরজন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ বড়দের গুপ্তচরের জোর করে শিশুরাজ্যে শিশু সেজে ঢুকে পড়াও নয়, এ নিজের শখসাধ মিটিয়ে দাদামশায়ের দ্বিতীয় শৈশবও নয়। এ লেখা অর্থহীন ছড়াও নয়, গুরুমশায়ের প্রথম পাঠও নয়। সমস্ত শিশুজীবনের সুখদুঃখ গালিয়ে এমন লেখা তৈরি হয়; এ যার-তার কর্ম নয়।

কোথাও ন্যাকামি নেই, ভালোমানুষি ঢং নেই। কল্পনার জাদুকাঠি দিয়ে ছোঁয়া ঝরঝরে সহজে বোঝা যায় এমনি ভাষা। কিন্তু সেরকম ভাষা আর কেউ কখনো ব্যবহার করে নি। তার একটু উদাহরণ দিই—

'ক্ষীরের পুতুলে'র বাঁদরকে মা-ষষ্ঠী দিব্যদৃষ্টি দিয়েছেন, বাঁদর দেখলে—

> ষষ্টিতলা ছেলের রাজ্য— সেখানে কেবল ছেলে-ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে স্থলে, পথে ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে, যেদিকে দেখে সেইদিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা; কারো পায়ে নূপুর, কাঁকালে ছেলে, কারো গলায় সোনার দানা· সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য—সেখানে কেবল ছুটোছুটি কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই, সেখানে আছে দিঘির কালো জল, তার ধারে সর-বন, তেপান্তর মাঠ, তারপর আম-কাঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি, নদীর জলে গোলচোখ বোয়াল মাছ, কচুবনে মশার ঝাঁক· ·

এমনি দেশে বাস করতেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লোকে বলত খামখেয়ালি, মাথার ঠিক নেই; মাথা নিচু করে কিসব খুঁজে বেড়ায়; নুড়ি তোলে, গাছের শুকনো ডাল নিয়ে আসে; সেসব দিয়ে অদ্ভুত দেখতে জন্তুজানোয়ার মানুষ বানায়। সত্যি কথা বলতে কি, কবিতে আর ক্ষ্যাপাতে চুল-পরিমাণ তফাত থাকে। দুজনাই সাদা চোখে যা দেখেশোনে অন্য লোক তা পায় না। প্রভেদ এই যে, কবির ক্ষমতা থাকে অন্য লোককে দেখাবার শোনাবার, ক্ষ্যাপার রাজ্যে কারো প্রবেশ নেই।

যতই বলি ততই বুঝি কতকগুলি কথার জাল বুনে অবনীন্দ্রনাথকে ধরে দেওয়া যায় না, তাঁর রচনা না পড়লে ছবি না দেখলে, লেখা আর আঁকা একসঙ্গে না মিলালে তাঁর সম্বন্ধে কোনো ধারণাই হয় না।

'আলোর ফুলকি' ও অবনীন্দ্রনাথের গদ্য

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন হলেও, চসারের Parliament of Fowls ব'লে কাব্যরূপকখানি 'আলোর ফুলকি'র প্রসঙ্গে ভাবাসঙ্গবাহী। সেখানেও পশুপাখির হাট ব'সে গেছে, হুবহু মানবিক সংরাগের উত্তাপে কখনো তিনটে ঈগল উচ্চকথনে মত্ত, কখনো-বা মানবজাগতিক বাসনা বা বৈরাগ্যের অবিকল সাদৃশ্যে জলের পাখিদের মুখপাত্রী হিসেবে রাজহংসী নির্লিপ্ত গলায় বলছে—

But she wol love him, lat him take another !

এই আখ্যায়িকার মধ্যে প্রতীকযোজনা ছাড়া চসার আর প্রায় সব-কিছুই একাধিক পূর্বসূরীর কাছ থেকে দু হাতে নিয়েছিলেন। সেই সূত্রে সিসারো, দান্তে এবং ক্লডিয়াসের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞ হবার কারণ অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর যেখানে নিসর্গলক্ষ্মীর চারপাশে পাখিরা কাকলিরত, সেই জায়গায়, অর্থাৎ এ-বইয়ের সবচেয়ে স্মরণযোগ্য অংশটিতে, অ্যালানাস দ্য ইনমুলিসের *De Planctu Naturoe* বইটির কাছে চসার অধমর্ণ।

'আলোর ফুলকি'র দৃশ্যপট অনেকটা Parliament of Fowls-এর মতই তির্যক্ প্রাণীদের মনুষ্যত্বে চঞ্চল। যেসব পশুপাখি অভিজাত সাহিত্যে উপেক্ষিত, এবং ঈসপের উপকথা অথবা অনুরূপ কোনো-কোনো নীতিনিরুক্তির গল্পে সান্ত্বনার তাচ্ছিল্যে সমাদৃত, এই বই দুটিতে তারা উদ্দীপন-বিভাবের অবহেলিত এলাকা ছেড়ে আলম্বন-বিভাগের উচ্চাসনে উঠে এসেছে।[১] তা ছাড়া, এবং সেইটেই এই নিবন্ধের সূচনাসূত্র, 'আলোর ফুলকি'ও মৌল রচনা নয়। এদ্‌মঁ রস্তাঁর উপরে নির্ভর ক'রে ফ্লোরেন্স ইএট্স হান্ *The Story of Chanticleer* লিখেছিলেন। সে-বইটিই অবনীন্দ্রনাথের 'আলোর ফুলকি'র ভিত্তিপট। চসার আমাদের মনে যে-জিজ্ঞাসার উদ্রেক করেন, সেটি হল, একজন ক্ষমতাবান্ লেখক কেন অনুবাদকর্মে ব্যাপৃত হবার অতিরিক্ত শ্রম স্বীকার করেন? অথবা প্রশ্নটিকে আরো একটু ঘুরিয়ে নিলে এ রকম দাঁড়ায়, একজন প্রথমশ্রেণীস্থ লেখক অনুবাদ করার সময়ে কি ভাবে রচয়িতা নির্বাচন করেন? বোধ করি দুজনের প্রবণতার সারূপ্য এর অন্যতম হেতু। উপরন্তু, কবিতার ভাষান্তরীকরণ একটি কঠিন

---

১ উপনিষদের সুবিদিত দুটি পাখি অথবা বৈষ্ণব পদাবলীতে তুলনাকল্পে গৃহীত ময়ুর প্রভৃতি পাখি আর্ষ উপলব্ধি বা মানবীয় ভাবাবেগের অন্ধ সহায়ক মাত্র। বাণভট্ট তো বৈশম্পায়ন ব'লে শুকপাখিটিকে সর্বজ্ঞ বানিয়ে তার মুখ দিয়ে আমাদের রীতিমত সংস্কৃত আর্যা-ছন্দে নিবদ্ধ শ্লোক শুনিয়েছেন (দ্রষ্টব্য কাদম্বরী, পৃ. ৮-৯ : অনুবাদ শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর)। আবার লোকশ্রুত ব্যুঅসের Ornithogina-তে মানুষকে পাখিতে পরিণত করা বোধ হয় একই প্রবণতার রূপভেদমাত্র। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (Gay Neck । চিত্রগ্রীব, অনুবাদ : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), জ্যাক লণ্ডন (হোয়াইট ফ্যাং। অনুবাদ: নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) ও হেমিংওয়ের (ওল্ডম্যান অ্যাণ্ড দি সী। অনুবাদ : শ্রীমতী লীলা মজুমদার) মধ্যে একটি সাদৃশ্যসূত্র সহজেই টানা যেতে পারে। এঁদের প্রত্যেকের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা বিচিত্র ও প্রচুর, কিন্তু এঁরা তিনজনেই একদেশদর্শী। মানুষ এসব ক্ষেত্রে সক্রিয় দর্শক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ অভিভাবক ; প্রকৃতির উপরে মানুষের প্রভুত্ববিস্তার— অভিজ্ঞতা-ভারাতুর এই তথ্যটি এঁদের রোমাঞ্চ-সঞ্চারী রচনাবলী প'ড়েও কিছুতেই যেন ভোলা যাচ্ছে না।

দায়িত্ব, কেননা মূলের ধ্বনিগত আবহমণ্ডল তার পথে সবচেয়ে বড় প্রলোভন এবং প্রতিবন্ধক। কিন্তু, তবু সে-আগ্রহের যুক্তি ঐ মানসিকতার সাধর্ম্যে নিহিত। অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই কথাটাকে আরো কিছু দূর প্রসারিত ক'রে নেওয়া সম্ভব। *The Story of Chanticleer* আলোর ফুলকি'র নতুন মাটিতে শুধু পুনর্জাত নয়, পুনর্নবত্বে উজ্জ্বল। তার একটি কারণ কথাশিল্পে নয়, শিল্পকথার মধ্যে খুঁজতে হবে। 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' বা 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী'তে অবনীন্দ্রনাথ বহু বিদেশী শিল্প-সমালোচকের উক্তি সবিস্তারে উদ্ধৃত করেছেন। সেই তথ্যটি এই কাহিনীর আলোচনাকালে মনে রেখে এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর রচনার একটি বিশেষ পর্বে, অন্য কোনো গল্পগ্রন্থ বর্জন ক'রে এই বইটি বাছাই করার সময় লেখকের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য ছিল। প্রধানত, তাঁর বাক্-রীতিটির অন্তর্লীন শিল্পাদর্শ-ই সেই উদ্দেশ্য এবং এখানে তিনি উদ্দিষ্ট সেই আদর্শে উপনীত হয়ে গেছেন। শকুন্তলা (১৩০২) বা ক্ষীরের পুতুল (১৩০২) তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে লিখেছিলেন এবং সরল সুন্দর সুষ্ঠুতা ছাড়া অপর কোনো ব্যাপ্ত বিশেষত্ব সেই বই দুটিতে অনঙ্কুরিত। রাজকাহিনী (প্রথম খণ্ড, ১৯০৯) গ্রন্থে তাঁর শব্দসমীক্ষণ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। ভূতপত্রীর দেশ (১৯১৫), নালক (১৯১৬) বই দুখানিতে তারই উদ্‌বর্তন বর্ণিকাভঙ্গিতে বিচিত্রিত, বিচ্ছুরিত। পথে-বিপথে (১৯১৯) বয়স্কপাঠ্য রচনা, এর মধ্যে নানাভাবে ভাষা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ মনন কাজ ক'রে গেছে। এই মননভঙ্গিমা আলোর ফুলকিতে এসে সুসমঞ্জস একটি শীর্ষচূড় সার্থকতায় পৌঁছেছে।

'ছবির ভাষা অনেকটা সার্বজনীন ভাষা'—এই কথাটি অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিজ্ঞা। 'সার্বজনীন'—এই শব্দটির দিকে লক্ষ্য রেখেই যেন অবনীন্দ্রনাথ ভাষার উৎসসন্ধান এভাবে করেছেন—"ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মানুষ যে 'মা' শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং যে চোখের তারা ফিরিয়েছে বা যে হাত বাড়িয়েছে মায়ের দিকে, তার থেকে **কথিত, চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষার** একই দিকে সৃষ্টি হয়েছে বললে ভুল হবে না।"—শিল্প ও ভাষা, বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। বস্তুত, জন্মমুহূর্তের ঐ তিনরকম ভাষা কালক্রমে অনেকাংশে ত্রিধাবিভাজিত হয়ে গেছে এবং অবনীন্দ্রনাথ যেন তিনটিকে আবার একাধারে সমাহৃত করতে চেয়েছেন। 'চিত্র-ভাষা' শব্দটি তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে ব্যবহার করেছেন এবং তার ভাষ্য দিতে গিয়ে প্রাচীন মানুষের চিত্ররীতির প্রেরণাসূত্রটি আমাদের দেখিয়েছেন, "এ যেন মানুষের সঙ্গে চারি দিকের যারা কথা কইল তাদেরই পরিচয় আগে লিখতে বস্‌লো মানুষ: জলকে মানুষ জিজ্ঞাসা কর্‌লে জল, তুমি কেমন ক'রে চল ? জল স্রোতের রেখা ও গতিভঙ্গি দিয়ে এঁকে ইঙ্গিত ক'রে শব্দ ক'রে জানিয়ে দিলে—এমন করে ঢেউ খেলিয়ে এঁকে বেঁকে চলি। হরিণ, তুমি কেমন করে দৌড়ে যাও ? হরিণ সেটা স্পষ্ট দেখিয়ে গেল। কিন্তু গাছকে পাথরকে শুধিয়ে মানুষ পরিষ্কার সাড়া পেলে না। গাছ, তুমি নড় কেন ? এর উত্তর গাছ মর্মরধ্বনি করে' দিলে—এই এমনই নড়ি থেকে থেকে, জানিনে কেন! গাছের কথাই বোঝা গেল না, ছবিতেও তার রূপ ধরলে না মানুষ। পাহাড়, দাঁড়িয়ে কেন ? আকাশ দিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি ফিরে এল কেন!"—ঐ, বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী। বলা বাহুল্য, চিত্রভাষার প্রবর্তনা অবনীন্দ্রনাথকে তার দূরান্বয়ী সংকেতের শক্তি নিয়ে অধিকার করেছে এবং তিনি মনে করেছেন এই ভাষার অনুস্মৃতির ফলে মানুষ, নিসর্গ, পশুপাখি, জড়-চেতন সর্বত্রই ছবির ভাষার মত একটি **lingua franca** বা সার্বজনিক ভাষার আভাস আসবে।[২] তা হলে এই ভাষায় শব্দ

২ দেবমুনি ঋভুদেবের মন্ত্রোক্তি ও F. Rylandএর রচনার মত আপাতবিষম নানান উৎস থেকে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর উপপাদ্যের

ধ্বনির নিয়ন্ত্রী নয়, বরং তা অর্থবহ ধ্বনির অনুগত। ধ্বনি এখানে মূল মাধ্যম এবং বিবৃতি দ্বিতীয় উপায় মাত্র। Echo-word বা ধন্যুক্তি চিত্রোক্তির সঙ্গে যুক্ত হলে এ-ভাষার কাঠামো পাওয়া যাবে: "পায়রা রেগে গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, 'বোকো না, বোকো না, মোটে না, বোকো না।' ঠিক সেই সময় বেড়ার উপরে ঝুপ করে এসে কুঁকড়ো বসলেন। পায়রা দেখলে মানিকের মুকুট আর সোনার বুক-পাটায় সেজে যেন এক বীর-পুরুষ এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধ্যার আলো তাঁর সকল গায়ে পলকে পলকে রামধনুকের রঙ ধরে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে স্থির। মিষ্টি মধুর স্বরে তিনি ডাকলেন, 'আ-লো। আ-লো। আ-লো।' তারপর তাঁর বুকের মধ্যে থেকে যেন স্বর উঠল, 'অতু-ল ফু-উ-ল। আলোর ফুল।' আলো, প্রাণের ফুলকি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এসো ফুলের উপর দিয়ে, এসো পাতায় লতায় ফুলে ঝিক্‌মিক। আলোতে ঝিক্‌মিক—দেখা দিক, সব দেখা দিক, ভিতরে যাক তোমার প্রভা, বাইরে থাক তোমার আভা, একই আলো ঘিরে থাক্ শত দিকে শত ধারে, অনেক আলোর এক আলো, অনেক ছেলের এক মা।··বনের তলায় সোনার লিখা, সবুজ ঘাসে সোনার চুমকি, আলোর ফুলকি অ-তু-উ-ল অমুল আলো"— আলোর ফুলকি। প্রাণের স্রোতের উপরে ভাষা এখানে যেন আলোর মত নেচে চলেছে, ফ্লোরেন্স ইএট্‌স হান্ থেকে প্রাসঙ্গিক প্রাক্‌রূপটি এর পাশে রাখা যাক: "Not at all!" Cried the little Pigeon indignantly; and then held himself very straight and still, and gazed at the Cock, who had now alighted on the wall. To him, Chanticleer with his trembling crest and golden collar, seemed some magnificent knight of the summer. The evening sun shone on his lovely plumage as he stood there motionless, his head raised; he seemed to notice no one, but sighed, and his throat sounded "co···co···" soft and tender. Then he spoke in a kind of ecstacy—O Sun! O Light! I love you!···You enter into each one, and enter into every cottage; dividing yourself, you yet remain whole, like a mother's love!··"— *The Story of Chanticleer*। ইএট্‌স হান্ যেখানে কৃতী ও দক্ষ, সেখানে অবনীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর। মানুষের শব্দচয়ন আর পাখিদের ধ্বনিবিন্যাস স্বরসম্মিতির (assonance) মধ্যবর্তিতায় অভিন্ন ঐক্যে বিধৃত হয়েছে। 'An ideal language would always express the something by the same, and *similar things by similar means*'— জেস্‌পার্সনের এই কথাটা এ-উপলক্ষ্যে আবার প্রমাণিত হল। সুকুমার রায় 'আবোল তাবোলে' যেসব জোড়কলম শব্দ আর ধন্যুক্তি ছড়িয়ে গিয়েছেন, সেগুলি এই প্রেক্ষাপটে ভুলবার নয়। পার্থক্য, সুকুমার রায় দেশজ শব্দের নিঃশর্ত প্রেমিক, আর অবনীন্দ্রনাথ যদিও 'বাংলাদেশে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষার' বিরোধী, তবু প্রয়োজনবিশেষে দেশজ ও তৎসম শব্দ একান্ত পাশাপাশি বসিয়েও তিনি তাঁর ভাষণভঙ্গির গড়নের বিশেষ ঠাট বজায় রেখেছেন। ভাষা সম্বন্ধে তাঁর এই নমনীয়তার উদাহরণ আপাতত

ভিত্তিটিকে সুদৃঢ় করেছেন। প্রত্নপ্রস্তর যুগের চিত্র বা গুহায় আঁকা ছবির সংকেত-পরিধি এতদূর বাড়িয়ে নেওয়ার কথা লেওনার্দোর মত অমিতপ্রতিভাও ভাবেন নি। লেওনার্দো সেখানে বিন্দু, রেখা বা বহিরায়তনিক সমস্তার মধ্যেই চোখ রেখেছেন।

আলোর ফুলকির সমীপকালীন রচনা পথে-বিপথে থেকে উপস্থাপিত হল: "ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীলের এই দুই যবনিকার ভিতর চলেছি। দক্ষিণে বামে কিছুই দেখছি না; কেবল সম্মুখ থেকে একটার পর একটা ঝন্‌ঝনার ধাক্কা আসছে, আর মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-একটা গাছের ঝাপসা মূর্তি চোখের উপরে এসে আঘাত ক'রেই সরে যাচ্ছে।"— 'নিষ্ক্রমণ', গিরিশিখরে, পথে-বিপথে।

চিত্রভাষা এবং ধ্বনিভাষা এখানে সমীকৃত। আনুরূপ্য খুঁজতে গিয়ে অসাবধান পাঠকের একবার রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়তে পারে: "রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাঁচের জানলার উপর টিপ টিপ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে স্তরে স্তরে মেঘ করে; এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর জঙ্গমের একটা অবসন্ন মুখশ্রী।"— য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর সাদৃশ্য-সন্ধান ব্যর্থ হবে। আবার, বিবেকানন্দ ও 'চার-ইয়ারী কথা'র বীরবলকে মনে রেখে সচেতন পাঠক অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক অথচ স্বতন্ত্র ভূমিকা অনুভব করতে পারেন।

এই তথ্যটি মনে রাখলে বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না, ১৩২৬ সনের বৈশাখ মাস থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত আলোর ফুলকি ধারাবাহিকভাবে ভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ঠিক একই সময় তাঁর 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। এই যোগাযোগের তাৎপর্য লক্ষ্য করবার মত। বাংলার ব্রত বইটিতে আমাদের ব্রতের লোকায়ত মন্ত্রগুলি অবনীন্দ্রনাথ সযত্নে ধ'রে রেখেছেন। আল্‌পনার নক্‌শায় যেমন বাংলা দেশের পুরবাসিনীদের জীবনধর্মী শিল্পৈষণা (art-motif), তেমনি ব্রতকথনের মধ্যেও তাঁদের প্রাণছন্দ ধরা প'ড়ে গেছে। এই ঘরোয়া মন্ত্রগুলির মধ্যে দ্রুতগ প্রবাহের কম্পন যেভাবে অন্তঃসলিল হয়ে আছে, তার প্রাণময়তা সর্বকালের কবি বা কথককেই গভীরভাবে প্রলোভিত করতে পারে। এক সময় গোবিন্দদাস বা জ্ঞানদাসের মত ধ্রুপদী চেতনায় সুসম্পন্ন কবিও বাংলাদেশের অঙ্গনের প্রচলিত বুলি (idiom) ব্রজবুলির ক্লাসিক ভাষাবন্ধের সঙ্গে যোগ করেছেন। তাতে নিঃসন্দেহে ভাষা স্রোতোবহা ও আবেদনসমৃদ্ধ হয়েছে। 'শঙ্খমালার গল্পে'র কথাবস্তুর আলোচনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন দু'শোর চেয়েও বেশি মেয়েলি ছড়ার নজির দিয়েছেন। প্রসঙ্গের প্রয়োজনে কয়েকটি অপরূপ উদাহরণ এখানে অনুস্যূত হল—

১. সেই কপালে সেই টিপ। সাধুর ভিটায় সোনার দীপ॥
২. গহিন জলে নিয়াস কাটে। কালীসাগর ফেটে উঠে॥
৩. দহের জলে ঢেউ খেলে কিনা খেলে। কমল পাতের জল হেলে কিনা হেলে॥
৪. বেলা পড়ে বেলা উজায়। গাছের পাতা মর্মরিয়া শুকায়॥[৩]

'শঙ্খমালার গল্পের গদ্যভাগে ছড়ার মিশ্রণ'— এই পর্যায়ে দীনেশচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন— "· ·পাঠক যাহা গদ্যের মতন পড়িয়া যাইবেন, তাহার অনেকাংশই কতকগুলি মেয়েলি ছড়ার সমষ্টি। পাঠক পড়িবার সময় সেগুলি যে কবিতার অংশ তাহা একেবারেই মনে করিবেন না। কিন্তু তলাইয়া দেখিলেই এই সকল ছড়া ধরা পড়িবে।" ছড়ার এই বাক্যবয়নরীতি অবনীন্দ্রনাথ আলোর ফুলকিতেই সর্বপ্রথম প্রচুরভাবে প্রয়োগ করেছেন: "· ·পেরু সেই পেঁটরার কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'শুনছ গিন্নি, তোমার

৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃ ৪৯-৫২ দ্রষ্টব্য

কুঁকড়োর এখন খুব বাড়-বাড়ন্ত' বলতেই পেঁটরার ডালা খুলে বুড়ি মুরগি হেঁয়ালিতে জবাব দিলে, 'পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে গো ভাতে বাড়ে' জবাব দিয়েই বুড়ি পেঁটরার মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে লুকিয়ে পড়ল।"

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই দেশী ঘরানার এই সম্ভাবনা চরিতার্থ করেছেন। এর ফলে গদ্যের তটে যে-ঢেউ লাগে, তারই সাহায্যে তাঁরা গদ্য ও কবিতার রূপগত দূরত্ব অতিক্রম ক'রে গেছেন। গদ্য ও ছড়ার একাঙ্গ সন্নিবেশ বা এই ধরণের চম্পূ-রীতি তাঁদের বেশির ভাগ লেখারই বৈশিষ্ট্য। এবং যেখানে বহিরঙ্গে এই সাহচর্য নেই, সেখানে ছড়ার ছন্দ অন্তর্মিলের সুযোগ নিয়ে গদ্যের ভিতরে ঢুকে গেছে :

১. 'ফুলবনের কাছে গিয়া রাজপুত্র দেখেন, ফুলের বনে সোনার খাট, সোনার খাটের হীরার ডাঁট, হীরার ডাঁটে ফুলের মালা দোলান রহিয়াছে, সেই মালার নীচে, হীরার নালে সোনার পদ্ম, সোনার পদ্মে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা বিভোরে ঘুমাইতেছেন।' —ঘুমন্ত পুরী, ঠাকুরমা'র ঝুলি।

২. 'বর্ষাকালের কাজলমাখা পিছল রাত। নিখুঁত রাত। কালোর পরে একটি খুঁত-তারার টিপ। ভয়ংকরী নিশীথিনী, বিরূপা ঘোর, ছায়ার মায়া, থাকুন, তিনি রাখুন। নিশাচর নিশাচরী, রক্তপাত করি, আচম্বিতে নিঝুম রাতে, দুপুর রাতে, নষ্টচন্দ্র, ভ্রষ্ট তারা, ভিতর-বার অন্ধকার-রাত সারা রাত। নিঝুম দুপুর, নিখুঁৎ দুপুর, অফুর রাত।' —আলোর ফুলকি।

মনে হবে, আঁটোসাঁটো ছন্দে বাঁধা রহস্যবহ দুটি কবিতা ভুল ক'রে কম্পোজিটার যেন গদ্যে সাজিয়ে ফেলেছেন। দক্ষিণারঞ্জনের বেলায় যেন দুয়েকটা শব্দ হঠাৎ বাইরে থেকে এসে একটুখানি জায়গা জবরদখল করেছে, নইলে দুটিই যে ছন্দোবদ্ধ কবিতা, রীতিমত পর্ব বিভাগ ক'রে সেটা দেখানো যায়। এইভাবে গদ্যগন্ধোদরা স্বরবৃত্ত ছন্দকে দক্ষিণারঞ্জন এবং অবনীন্দ্রনাথ আবার গদ্যের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন।[৪]

অবনীন্দ্রনাথের কোনো এক পর্যায়ের গদ্যছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেছিলেন, 'ভাষাবাহুল্যের জন্য পরিমাণ রক্ষা' হয়নি ব'লে গদ্যকবিতার নিরীক্ষায় অবনীন্দ্রনাথ সফল হতে পারেন নি। এই অভিযোগের লক্ষ্যস্থল অবনীন্দ্রনাথ যে কখনোই হতে পারেন না, এ কথা বলছি না। কিন্তু কথাটি সমগ্রত অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রযোজ্য কি না, ভেবে দেখা দরকার। তাঁর সর্বজন-বিদিত কথকস্বভাব এই অনুযোগের দায়িত্ব বহন করছে। কথক মাত্রেই কথা বোনেন, বীজ অপেক্ষা বিস্তার, সাংবাদিক পরিমিতির চেয়ে পল্লবিত স্মৃতি-বিন্যাসেই তাঁর স্বাভাবিক ব্যগ্রতা। কিন্তু 'ঘরোয়া' বা 'জোড়াসাঁকোর ধারে', দুটি জীবনস্মৃতিবৃত্তই যখন সমাপ্তির মুখে, তখন বক্তা চুপ করেছেন, আত্মপ্লুত কবি বা স্বগত-কথক জেগে উঠেছেন। মিতবাক্ এই সব অংশে গদ্যকবিতা তার নিপুণ সংহতি প্রদর্শন করেছে বললে তথ্য-রঞ্জন করা হবে না। রবীন্দ্রনাথের দিক থেকেও সমস্যাটিকে দেখা যেতে পারে। 'লিপিকা'র রচনাগুলি-সম্পর্কে কবির 'ভীরুতা'র কারণ হয়তো একদিকে গীতি-আতুরতার (lyricism) প্রতি আকর্ষণ এবং অন্যদিকে অনাবিষ্ট,

---

৪ 'বিচিত্রা' পত্রিকার ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ বলে নির্দেশিত পাহাড়িয়া পর্যায়ের যে-তিনটি কবিতা বেরিয়েছিল, সে সব স্থলেও থেকে-থেকে স্বরবৃত্তধর্মী শ্বাসাঘাত অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথম কবিতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত—

রাত থাকতে পায় কি পায়ের পরশ
তার শিশিরে মাজা নিকষ পাষাণ?
বরফ-গলা নতুন নদী— উছ্‌লে পড়ে, উল্‌সে চলে—

নিছক গদ্যের দাবি। 'গদ্যকবিতা' ব'লে চিহ্নিত তাঁর কবিতাবলীর কোথাও কি সেই দোটানা দেখা যায় নি ? গদ্যকবিতা একাধিকবার তাঁর হাতে গীতি-কবিতার দিকে ঝুঁকেছে[৫] এবং গদ্যগীতি বললে সেই কবিতাগুলির ভুল পরিচয় দেওয়া হবে না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গদ্য কবিতায় এই গীতিময়তা নিয়ে ঈষৎ অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই রকম কবিতায় যেন কাঠখোদাই বা ভাস্কর্যধর্মিতার ফলশ্রুতি আনবার দিকে তাঁর আগ্রহ নিবদ্ধ হয়েছিল—

সুকুমার উজ্জ্বল দেহ,
দেবশিল্পী কুঁদে বার করেছে
বিদ্যুতের বাটালি দিয়ে। —শেষ সপ্তক, ৩৩

অথচ গদ্যকাব্যে এই দৃঢ়তা ছাড়াও আরেকটি দিক আছে. সে হল দ্রুতির দিক—

দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়
জলের আভাস ;
দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর
বেদনা ; —শেষ সপ্তক, ৪১

সুমিতি-চেতনায় সাংকেতিক এই ভাষার নির্ভার লালিত্য অবনীন্দ্রনাথ অনেকবার স্পর্শ করেছেন :

১. 'সদানন্দ তিনি বরফের উপর দিয়ে কুয়াশার ভিতর দিয়ে আনন্দে চলেছেন, নির্ভয়ে চলেছেন, সবাইকে অভয় দিয়ে, আনন্দ বিলিয়ে। মহাভয় তাঁর পায়ের কাছে কাঁপছে একটুখানি ছায়ার মতো ! মায়াজাল ছিঁড়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলায়— যেন খণ্ড-খণ্ড মেঘ !'—নালক।

২. '"খুলুক খুলুক", দূরে ঝাপসা পাহাড় কুয়াশার চাদর খুলে যেন কাছে এসে দাঁড়াল। দূরের কাছের সব জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠছে, অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে নতুন করে আলোছায়া দিয়ে গড়া একটুকরো পৃথিবী।'—আলোর ফুলকি।

৩. 'এমনি জায়গায়-জায়গায় জিরিয়ে-জিরিয়ে চলতে-চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল, নিচের অন্ধকার পাহাড়ের চূড়োর দিকে আস্তে-আস্তে উঠতে আরম্ভ করলে, মনে হচ্ছে কে যেন বেগুনী কম্বলে ঘেরাটোপ দিয়ে একটার পর একটা পর্বত মুড়ে রাখছে, দেখতে-দেখতে আকাশ কালো হয়ে গেল, তারি মাঝে গোলাপী এক-টুকরো ধোঁয়ার মতো দূরের পাহাড়ের চুড়ো রাত্রের রঙের সঙ্গে ক্রমে মিলিয়ে গেল।'—বুড়ো আংলা।

৪. 'চাঁদের আলো পাতার ছাওয়া মাড়িয়ে মাসি চলে গেলেন নিজের ঘরে। যেন শ্বেতপাথরের পুতুল বাগান ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে। মাসির ঘরের আজন্ম চেনা কতদিনের ঘড়ি সুর পাঠালে, যেন একটি ছোট্ট মেয়ে সোনার মন্দিরাতে ঘা দিয়ে দিয়ে থামল।'—মাসি।

খাতাঞ্চির খাতা (১৯২১) আলোর ফুলকির পরবর্তী রচনা। তাঁর অধিকাংশ বইয়ের মত, ভূতপত্রীর দেশ বা খাতাঞ্চির খাতায় রূপকথার রাজ্য আর মানুষের জগৎ কাছাকাছি এসে পড়েছে এবং তাঁর বিশেষ ভাষারীতি এ-দুয়ের যোজক। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' অনুষঙ্গে পাঠকের কাছে আসে। কিন্তু ভাষার এই ছন্দোময় সাফল্য সম্ভবত কঙ্কাবতীতে নেই। মারুতির পুঁথি বা ওইরকম আর-কয়েকটি যাত্রার ধরণে

---

৫ পত্রপুট ৫, ১৩ ; শেষ সপ্তক ১, ২৯— অন্তত এই কয়েকটি কবিতার উল্লেখ রইল।

লেখা রচনায় অবনীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর ভাষার বাঁধুনি মানতে পারেন নি। অথচ সত্তর পৃষ্ঠার খাতাঞ্চির খাতায় যে স্বাচ্ছন্দ্য, বুড়ো আংলার এক শো উননব্বই পাতা জুড়ে যে-স্বপ্নচিত্রণ, তার সার্থকতার মূলে অবনীন্দ্রনাথের স্বরচিত ঐ বাক্-রীতি। এই ভাষার পূর্বসূত্র আদি মানুষের ছবির নকশা আর বাংলা দেশের প্রাঙ্গণ। স্বভাবোক্তির সঙ্গে পরিকল্পনা, তৎসম-বিদেশীর সঙ্গে দেশী-তদ্ভবের নীরন্ধ্র মৈত্রীতেই এই রূপবন্ধের অঙ্কুর ও বিকাশ। 'পাগলামির কারুশিল্প'— বিরোধাভাসে ভাস্বর এই উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথের রূপবন্ধের এই সচল শক্তির কথাই উদ্‌ঘাটন করেছেন। আজ এই কারুশিল্পের কোনো আন্তর ধারারক্ষী নেই। এর একটি কারণ হয়তো এই যে, বীরবলের মত তিনি প্রধানত বক্রোক্তিজীবিত অথচ বন্ধুজনবৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান নন, বরং তাঁর সৃষ্টির নানারঙা বৈচিত্র্য তাঁকে mythএ পরিণত করেছে। এক দিকে তাঁর স্বভাবের বহুমুখী নম্রতা, অন্য দিকে একান্ত আপন শিল্পস্বজ্ঞা— এই বৈষম্যে তিনি দীপ্যমান। বলতে বাধা নেই যে, ভাষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উদ্‌বোধিত করলেও প্রভাবিত করেন নি। নইলে হয়তো তাঁর রচনা বলেন্দ্রনাথের মত ব্যাপক অর্থে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গত থেকেই আরেকভাবে মূল্যায়িত হত।[৬]

'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' ১৯২১ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত বক্তৃতাকারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসমস্যা ও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে যে কথা বলেছেন তার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য আছে। দুজনের সৌন্দর্যবীক্ষা ভাব ও রূপের নিজ-নিজ সেতু বেয়ে একটি অভিন্ন সমাধানের সৈকতে এসে দাঁড়িয়েছে—

১. 'মানুষ তাই মধুর করেই বললে 'আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে বাজল, হে চির সুন্দর, আমি স্বীকার করে নিলেম। আমিও তেমনি সুন্দর করে তোমায় চিঠি পাঠাব, যেমন করে তুমি পাঠালে।'— সৃষ্টি, ১৩৩০। সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্রনাথ।

২. 'সৃষ্ট যা, সৃষ্টিকর্তার কাছে ঋণী হয়ে বসে রইলো না, এইখানেই সেরাশিল্পীর গুণপনা— মহাশিল্পের মহিমা প্রকাশ পেলে…পাতার ঘরে এতটুকু পাখি, সকাল-সন্ধ্যা আলোর দিকে চেয়ে সেও বল্লে আলো পেলেম তোমার, সুর নাও আমার— নতুন নতুন আলোর ফুলকি দিকে-দিকে সকলে যুগ-যুগান্তর আগে থেকে এই কথা বলে চল্লো,— তার পর একদিন মানুষ এল।'— শিল্পের অধিকার, চৈত্র ১৩২৮। বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী।

শিল্পীসত্তার এই সাড়া দেওয়ার কথা, 'আলোর ফুলকি'র নায়কের সংলাপে এর আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে: "এই জগৎসুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা এক হয়ে যখন আমার কাছে আসে তখন আমি আর ছোটো পাখিটি থাকি নে, বুক আমার বেড়ে যায়, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে শুনি, আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে তার পর আমার গান ফোটে, 'আ-লো-র ফুল'। আর তাই শুনে পুবের আকাশ গোলাপী কুঁড়িতে ভরে উঠতে থাকে, কাকসন্ধ্যার কা কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর চেপে দিতে চায়, কিন্তু আমি গেয়ে চলি, আকাশে কাগডিমে রং লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল, তার পর হঠাৎ চমকে দেখি আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হয়ে গেছে আর আকাশে আলোর জবা ফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি পাহাড়তলির কুঁকড়ো।"

---

৬ বলেন্দ্রনাথের আয়ুসীমা এক্ষেত্রে বিস্মরণীয় নয়।

ভারতশিল্পে নবযুগের ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীনন্দলাল বসু

শ্রুতিলিখন : শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

আধুনিক ভারতশিল্পের রেনেসাঁ প্রথম আরম্ভ করেন অবনীবাবু। আরম্ভ করলেন বঙ্গভঙ্গের সময়ে। তিনি বলতেন, আরম্ভের কারণটা অবশ্য বঙ্গভঙ্গ নয়। যাই হোক, অবনীবাবু বিদেশীপনাকে দেখতেন বিষনজরে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে সকলের মন জাতীয় ভাবনায় ভরে আছে। সেই শুভক্ষণেই নবজন্ম হল, একালের ভারতকলালক্ষ্মীর।

সেই সময়ে অবনীবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের একজন মেমসাহেব বন্ধুর কাছ থেকে তাঁর একটা অ্যালবাম পেলেন, তাতে ছিল খৃষ্টের জীবনের নকশা-চিত্রাবলী। একই সময়ে তাঁর এক আত্মীয়া দেশী ছবির একটি অ্যালবাম পাঠালেন তাঁকে— সেটা ছিল পাটনা স্কুলের নকশা-করা।

এ দুটো পেয়ে তিনি লেগে গেলেন দেশী পদ্ধতিতে কৃষ্ণের জীবনচিত্র আঁকতে। সেসব মূল্যবান ছবির অধিকাংশ বর্তমানে রবীন্দ্রভারতীর সংগ্রহে আছে। সে সময়ের অনুভূতির কথা বলতেন তিনি, 'রোজই আরম্ভ করতুম ছবি ; রাত্রে স্বপনের মতো দেখে রাখতুম। আর সকালে এঁকে শেষ করতুম।' সেইসব ছবির সঙ্গে, পরিচয়ে, বৈষ্ণব পদাবলীর পদাংশ জুড়ে জুড়ে দিতেন। পরিচয়ের বাংলা হরফ লেখা হত— পার্শিয়ান কায়দায়।

অবনীবাবু বুদ্ধচরিতের উপর অনেক ছবি এঁকেছিলেন। বুদ্ধ-সুজাতা, বজ্রমুকুট— এসব আঁকলেন ঋতুসংহার থেকেও ছবি করলেন পাঁচ-ছ খানা। প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে অনেক ছবি।

এই সময়ে এসে গেলেন জাপানী শিল্পীরা। ওকাকুরার লোক সব আসতে লাগলেন। হিসীদা, টাইকান এলেন। ফলে, অবনীবাবুরও স্টাইল কিছু বদলে গেল। জাপানী পদ্ধতিতে মেঘদূতের ছবি আঁকলেন অবনীবাবু। বকের পাঁতি, গন্ধর্বের আকাশপথে গমন— এই রকম পাঁচ-ছ খানা ছবি আঁকা হল ওঁর, নূতন স্টাইলে। তবে একটা কথা জোর দিয়ে বলি, মনে রেখো, অবনীবাবু জাপানী স্টাইলে ছবি আঁকলেন বটে, কিন্তু তাঁর পদ্ধতিতে ওদের পদ্ধতি মিশিয়ে দিলেন। ফলে, ভারতশিল্পের ধারা খানিক প্রসারিত হয়ে গেল।

অবনীবাবুর হাতে ক্রমশঃ এই পদ্ধতিরও বদল হতে লাগল। স্বদেশী যুগে অবনীবাবু বঙ্গমাতার ছবি আঁকলেন। বঙ্গমাতার ছবি আঁকা হয়েছিল ওয়াশে। সেই বছর টাইকান চলে গেলেন জাপানে। আমি তখন গেছি আর্ট স্কুলে। তখনও দেখা হয় নি আমার, অবনীবাবুর সঙ্গে। আমি যখন আর্ট স্কুলে ভর্তি হই, অবনীবাবু তখন বঙ্গমাতার ছবি ফিনিশ করেছেন। কিন্তু সে ছবিখানা দু-টুকরো হয়ে গেছে।— মধ্যিখানের ভাঁজে ক্র্যাক হয়েছে। জাপানী পদ্ধতি আর তাঁর অনুসৃত আগের পদ্ধতি মিলিয়ে অবনীবাবু বঙ্গমাতার ছবি করেছিলেন।

এই পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেন ওমর খৈয়মের চিত্রাবলীতেও। সে অদ্ভুত এক স্টাইল।

সব সময়েই একটা স্ট্রাগল্ দেখেছি তাঁর মনে ; এবং বার বার তা অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে।

অবনীন্দ্রনাথ

শিল্পী শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

একঘেয়েমি তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না কিছুতেই। বিশেষ ক'রে, তাঁর আগেকার আঁকা বিলেতী স্টাইল যখন এসে পড়ত, সেটা অতিক্রম করতে গিয়ে, তিনি নানা পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন।

অবনীবাবু আগে বিলাতী স্টাইলে ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। প্যাস্টেল, ওয়াটার কলার, অয়েল পেন্‌টিং— এই সবে তাঁর হাত পেকেছিল। সেই সঙ্গে মিশল তাঁর নিজের স্টাইল। জাপানী স্টাইল, তিব্বতী স্টাইল, পার্শিয়ান স্টাইল— এইসব। সব মিলেছিল— অদ্ভুত রকমে তাঁর তুলিতে।

মাঝে মাঝে ওলোট-পালটও হয়ে যেত। এই যেমন, প্রথম আরম্ভ করলেন উনি, দেশী পদ্ধতিতে আঁকতে। অথচ কম ক'রে পাঁচ-ছ খানা ছবিতে অয়েল পেন্‌টিং প্যাস্টেল ইত্যাদি স্টাইলের আদল এসে গেল। তাঁর এক-একটা সিরিজের ছবিতে দেখা যায়, নানা ভাবের মিশ্রণ।

যাই হোক, বিলিতী চীনে জাপানী মোগল— এইসব পদ্ধতি নিয়ে হল ভারতশিল্পের রেনেসাঁর চেহারা।

আমরা মুগ্ধ হলুম ; কিন্তু অবনীবাবুর স্টাইল নিতে পারলুম না।

আমাদের ঝোঁক হল, অজন্তার দিকে। কাঙ্গড়া, রাজপুত— এইসবও করতে লাগলুম।

আমাদের ছবি জাপানে গেল এগ্‌জিবিশনে। ওরা ঐসব ছবি দেখে খুব নিন্দে করলে। জার্মানীতে গেল। ওরাও আমাদের ছবির নিন্দে করলে। জার্মানরা বললে, ছবি ভালো, তবে হাত বড় উইক ; আর মোগল বা রাজপুতের মতো রঙেরও জেল্লা নাই। বিলিতী রং দিয়ে আঁকার দরুণ ম্যাজ্‌মেজে।

এসব শুনে, তখন আমাদের সোসাইটির উডরফ, ব্লান্ট্ প্রমুখ সদস্যরাও বললেন, দিশী পদ্ধতিতে আঁকা শুরু করো। দিশী ছবি সব আমাদের গ্যালারীতে টাঙিয়ে দেওয়া হল। মোগল কাঙ্গড়ার ছবিও টাঙানো হল। আমরা কিছু কিছু কপিও করেছিলুম।

বিচিত্রায় কাম্পো আরাই জাপানী পদ্ধতিতে আমাদের শেখাতে আরম্ভ করলেন— সে কালি-তুলির কাজ। দেশী পদ্ধতিতে ঈশ্বরীপ্রসাদ শেখাতে লাগলেন আর্ট স্কুলে।

বিদেশে এই রকম বিরূপ সমালোচনার ফলে, আমরা আমাদের পুরাতন পদ্ধতিতে ফিরে গেলুম। এইভাবে আমরা সব পুরাতন পদ্ধতি শিখতে লাগলুম। তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা হল, বিদেশী ছবির অনুকরণ করব না ; মন থেকে ঝেড়ে ফেলব সেসব।

পুরাতন-পরম্পরার সঙ্গে পরিচয় না থাকায়, নিজস্ব ধারায় আমাদের ছবি হতে লাগল। তবে আমাদের ঐতিহ্যের ধারা খুঁজে পেতেও খুব একটা বেগ পেতে হয় নি। আমি আরম্ভ করলুম, আমাদের পৌরাণিক ধারায় ছবি আঁকতে। অবনীবাবু করতেন নানা পুরাণ সংস্কৃতকাব্য আর ইসলামি কাহিনী কেচ্ছা থেকে রাজা-বাদশাদের ছবি।— এসব উনি করতেন অতি অদ্ভুতভাবে। সেটা আমরা পারি নি।

অবনীবাবু বলতেন, 'তোমরা পারবে না এসব ছবি করতে।— এই রকম মোগলাই কায়দায় ছবি তোমাদের হবে না। আমাদের বংশের মধ্যে পিরিলী ধারায় আছে এই কায়দা।— তোমারা করো স্রেফ দেশী ছবি।'

অবনীবাবু নানা বিচিত্র বিষয় আত্মসাৎ করেছিলেন। আমরা তা পারি নি। কিন্তু আমরা যা পেলুম, সে হল— নিজ ধারার বৈশিষ্ট্য। আমার ধারা অবনীবাবুর মতো হল না ; সে ধারা মোগল পদ্ধতিও নয় পার্শিয়ান পদ্ধতিও নয়।— অজন্তা, রাজপুত আর দেশী পদ্ধতি মিলিয়ে এ হল আমার নিজস্ব ধারা— আমার গুরু অবনীবাবুর থেকে আলাদা।

আর রং খুঁজেছি সব সময়। মোগলদের মতো ব্রাইট্ রং করা যায় কি ক'রে, সে চিন্তা আছে বরাবর। কালি দিয়ে করেছি লাইনের ছবি, চীনেদের মতো। এটা করতে গিয়ে, চীনে আর পার্শিয়ান কালি-তুলির কাজে হাত শক্ত করতে হয়েছে। আর করা হল— ইণ্ডিয়ান স্কাল্‌প্‌চারের আদর্শে অলংকরণের ছবি।

যাই হোক্, গুরুর কথা বলতে গিয়ে নিজের কথাও এসে যাচ্ছে। আজ আর থাক্। গুরু আমার গৌরবিত— চার কাল ধরেই ॥

রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয় সম্পাদক,

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা নামে যে প্রবন্ধ 'শান্তিনিকেতনে'র গত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন সেটা পড়ে দু-চার জায়গায় আমার ঠেকলো।

ফণীবাবু বলছেন— প্রথমে কলিকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব এ বিষয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। হ্যাভেল সাহেবকে আমি গুরুতুল্য মনে করি, কিন্তু ব্যাপারটার আন্দোলন তিনি শুরু করেন না বলতে আমি একটুও ইতস্তত করব না, কেননা আমি জানি কোথা থেকে কি হল।

হ্যাভেল সাহেব কলিকাতা আর্ট স্কুলে আসার পূর্বের কথা হচ্ছে তিনি মান্দ্রাজে আর্ট স্কুলটাকে দেশী শিল্প-শিক্ষার উপযুক্ত করে তুলেছেন। কলিকাতার সে সময়ের কথা রবিকাকা মহাশয়ের 'বালক' বলে পত্র 'সাধনা' বলে পত্র এবং চিত্রাঙ্গদা বলে কাব্য তিনি চিত্র দিয়ে সাজিয়ে তোলার কল্পনা করে আমাকে ডাক দিয়েছেন। আমাদের আর্ট স্কুল ও আর্ট স্টুডিও দুই স্থান থেকেই ইঙ্গ বঙ্গ ছবি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যেত না। আর্ট গ্যালারিতে বিলাতী ছবিই দেখা যায়, দেশীয় ছবি একটি নেই। সেই সময়ে স্বপ্নপ্রয়াণের ছবি ঈশ্বরীপ্রসাদ বলে এক হিন্দুস্থানী কারিগরের দ্বারায় লিথোগ্রাম করে সাধনাতে দেওয়া হল। এবং রবিকাকার উপদেশ-মত বৈষ্ণব কবিতা সমস্ত পড়ে আমি দেশীয় ভাবে কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকা শুরু করে দিলেম। সেই সময় রবি বর্মার এক সেট ছবি সবপ্রথম রবিকাকার কাছে দেখি এবং সেই সময়েই ঘটনাচক্রে আমার হাতে বিলাত থেকে ওদের সাবেক প্রথায় আঁকা একটা আলবম এবং দেশী শিল্পীদের আঁকা আর একটা ঐরূপ আলবম আমার হাতে পড়ে। এই শেষোক্ত দেশীয় চিত্রসংগ্রহ দেখে ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর দিল্লীর চিত্রশালা একটি প্রবন্ধ লেখেন ও রবিকাকা সেটি সাধনাতে প্রকাশ করেন, সাধারণের সঙ্গে আমাদের আর্টের পরিচয় বাংলায় সূত্রপাত এইভাবে হল। তোমরা শুনে অবাক হবে কৃষ্ণলীলার কুড়িখানা ছবি শেষ করতে তখন আমার পুরো এক বৎসর খাটতে হয়েছিল এবং তখন সারাদিন ছবি, সন্ধ্যার সময় রবিকাকার খামখেয়ালী মজলিশে সংগীত সাহিত্য কাব্য ও নাটক -এরই চর্চা, এই যখন চলেছে নিয়মিতভাবে বলতে পার অনিয়মিতভাবে তখন এলেন হ্যাভেল সাহেব কলিকাতায়। হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে আর্ট স্কুলের ছাত্র হিসেবে আমার পরিচয় নয়, আমি কোনো কালেই আর্ট স্কুলে ভর্তি হই নি, আমার সঙ্গে হ্যাভেল সাহেবের পরিচয় আমার কৃষ্ণলীলার ছবি নিয়ে এবং সেই সূত্রে মোগলশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে পরিচয় বিশেষ করে তাঁরই সাহায্যে আমার ঘটল। সেইজন্যই আমি তাঁকে বলি আমার গুরু কিন্তু হ্যাভেল সাহেব আমাকে ডাকতেন collaborator বলেই, স্নেহ করে কখনো বা বলতেন chela। বাংলার কবি আর্টের সূত্রপাত করলেন বাংলার আর্টিস্ট সেই সূত্র ধরে একলা একলা কাজ করে চলল কতদিন— তার পর ভারতশিল্পের নন্দলাল, সুরেন্দ্র গাঙ্গুলি, অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলি, কুমারস্বামী, উডরফ সাহেব, হ্যাভেল সাহেব এবং Indian Society of Oriental Art দেখা

দিলেন পরে পরে। হ্যাভেল সাহেব অসুস্থ হয়ে চলে যাবার পরে যখন একা আমি ছাত্রদের এবং আমার জনকতক ইংরাজ বন্ধুদের নিয়ে আমাদের আর্টের সঙ্গে আর্টিস্টদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় ফিরছি এবং গভর্নমেণ্টের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আর্ট স্কুলের বাহিরে এসে পড়েছি সে সময়ে শান্তিনিকেতন এতটুকু একটি টোল বা পাঠশালা মাত্র। আমি এক দিকে চলেছি, রবীন্দ্রনাথ অন্য দিকে। Oriental Art Societyকে সম্বল করে চলতে চলতে একটা দিন এমন এল যে, দেখলেম আমি যে ভয়ে আর্ট স্কুল ছেড়ে বার হলেম সেই ভয়ই গভর্নমেণ্টের অনুগ্রহ হয়ে এককালের স্বাধীন Art Society আর্টিস্ট-পাখি পোষার একটা খাঁচারূপে পরিণত করে দিয়ে গেল।

ঠিক এই অবস্থায় পৌঁছবার পূর্বে রবিকাকার অভয় এল, আর্টিস্টদের জন্য 'বিচিত্রাভবন' সৃষ্টি হল কলিকাতায়। তার পরের কথা শান্তিনিকেতনের আলো আর বাতাসে ঘেরা আর্টিস্টদের জন্যে দেশের বুকে ছোট্টবাসা বাসা— রবীন্দ্রনাথের দান ভারতীয় শিল্পশিক্ষার্থীদের জন্য! তাঁহার পঞ্চষষ্টিতম বৎসরের উৎসব শুধু তো ছবি নিয়ে নয়— কবিতা নাটক আর্টের যে আর-তিনটে দিক সংগীত তাও নিয়ে। এটা ফণীবাবু কেমন করে ভুলে বসলেন তা তো বুঝলেম না।

শান্তিনিকেতন পত্র, জন্মোৎসব সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক উল্লিখিত প্রবন্ধটির প্রকাশ : শান্তিনিকেতন পত্র, চৈত্র ১৩৩২

অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁর ছবি। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথকে জানতে হলে, তাঁর ছবি দেখা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ইতিহাসে চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের আর-একটি পরিচয় নূতন আদর্শের প্রবর্তক রূপে, এ দিক দিয়ে তাঁর একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে, ভারতীয় চিত্রের পুনরুদ্ধারকারী এবং নবযুগের প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি কোনো অংশে কম নয়। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার ঐতিহাসিক মূল্য তথ্যের দ্বারা বিচার করা সম্ভব। তথ্যের সাহায্যে বা যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁর সৃষ্টির জগতে আমরা প্রবেশ করতে পারব না, কিন্তু এই আলোচনার দ্বারা তাঁর প্রতিভার একটা মূল্য বিচার করা সম্ভব হবে। এবং তাঁর ছবি একটা ঐতিহাসিক পটভূমি পাবে, এই মাত্র।

অবনীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার প্রথম পরিচয় তাঁর অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে (১৮৯৪-৯৬)। তাঁর নিজের জীবনে এবং আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের এই ছবিগুলি নূতন যুগের সূচনা করেছে। সে সময়ের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং এই ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আমরা বুঝতে পারব।

এক দিকে দিল্লী-কলম পাটনা-কলম ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত দেশী চিত্রের যে গতানুগতিক ধারা চলে আসছিল তার সংস্কারগত শিক্ষার বাঁধাবাঁধি নিয়ম, কিছুটা কারিগর-সুলভ ওস্তাদি এবং দেশীয় চিত্রের আলংকারিক কাঠামো তখনও বজায় ছিল; উত্তরে কাংড়া-কলম তথা রাজপুত ঢঙের কাজ অন্যান্য ধারার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সতেজ ছিল সত্য, কিন্তু সবশুদ্ধ এ-সময়ে ভারতীয় চিত্র অলংকারবহুল শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়েছে বলা অন্যায় হবে না। চিত্রের প্রাণ ও রসের দিক দিয়ে ভারতীয় চিত্র এ-সময়ে অতি দরিদ্র।

অন্য দিকে দেখি নবাগত য়ুরোপীয় চিত্রের আদর্শ, বা য়ুরোপীয় চিত্রের আদর্শ নামে তখন আমরা যে বস্তু গ্রহণ করেছিলাম, তার সাহায্যে য়ুরোপীয় রূপকলার প্রাণের সন্ধান আমরা পাই নি, পরিবর্তে পেয়েছিলাম বিলাতি শিল্পসংস্কার (technical convention), বস্তুরূপকে অনুকরণ করবার কৌশল; ভিন্ন প্রকৃতির হলেও দেশী বিদেশী দুই ছবিতেই ছিল কৌশলের বিস্তার। আমাদের বিকৃত রুচির প্রতি লক্ষ করে হ্যাভেল সাহেব বলেছিলেন—

Nowhere does art suffer more from Charlatanism than in India....There is no respect for art in the millionaire who invests his surplus wealth in pictures and costliest furniture so that his taste may be admired or his wealth envied by his poor brethren.[1]

অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রথম আমরা এমন-এক রসবস্তুর প্রকাশ দেখি যে-রস সমকালীন কোনো চিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তখনকার নব্য শিক্ষিতসমাজ কারিগরী কাজ দেখেই অভ্যস্ত। শিল্পবস্তু ও

---

1. *The Basis for Artistic and Industrial Revival in India* by E. B. Havell.

রসবস্তুর মধ্যে পার্থক্য করবার শিক্ষাও ছিল না, এবং সে শিক্ষা পাবার সুযোগও ছিল না। এইজন্য অবনীন্দ্রনাথের ছবি যখন সাধারণের সামনে প্রকাশিত হল, তখন বিদ্যার যাচাই করতেই একদল রসিক বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

এতে অ্যানাটমি নেই, প্রক্ষিপ্ত ছায়া (cast shadow) নেই, পরিপ্রেক্ষিত (perspective) নেই কেন? এই প্রশ্নই প্রধান হয়ে উঠেছিল। এই শ্রেণীর সমালোচকেরা অবনীন্দ্রনাথের ছবি ও নূতন পদ্ধতিকে কি চোখে দেখেছিলেন একটা উদাহরণ দিই—

'ভারতীয় চিত্রকলার মূলসূত্র বোধ হয় এই যে, এমন বস্তু আঁকিবে বা এমন বিকৃত করিয়া আঁকিবে যে স্বাভাবিক বস্তুর সহিত তাহার কোনো সৌসাদৃশ্য না থাকে, লোকে চিনিতে না পারে, অর্থাৎ স্বভাবের বিরুদ্ধতাই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ। স্বাভাবিকতার শ্রাদ্ধই প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার একমাত্র উদ্দেশ্য। পানের দোকানে ও পুরাতন পঞ্জিকায় ভারতীয় চিত্রকলার যে আদর্শ দেখা যায়, ভারতীয় চিত্রের নূতন পন্থীগণের চিত্র সৌন্দর্যকল্পনায় বা বমনোদ্দীপক বর্ণবিন্যাসে তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহে। ভারতীয় চিত্রকলার অনুশাসনে আঙুল ও হাত-পা অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত লম্বা করা হয়। অ্যানাটমির বিরুদ্ধ হইলেই যে-কোনো চিত্র ভারতীয় চিত্রশালার যোগ্য হয়। যে স্বাধীন কল্পনায় মানুষের হাত-পা যোজন বিস্তৃত আকারে পরিণত হয়, তাহা কল্পনার অভিধানের যোগ্য নয়। ভারতীয় চিত্রকলা অনুসারে চিত্রিত চিত্রগুলি স্বভাবের এত বিরুদ্ধ ও লতানে কেন হয় তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব না।'[1]

চিত্র-সমালোচনায় যুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্রূপ এবং রসের পরিবর্তে কৌশলের প্রতি মোহ নব্য শিক্ষিত-সমাজের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল।

আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে ইংরেজের কথাই তখন অকাট্য। শারীরস্থানের জ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিত, প্রক্ষিপ্ত ছায়া ছাড়া ছবি হতে পারে না— এই হুবহু নকল ও কাস্ট শ্যাডোর মোহ কেবল যে আমাদের শিক্ষিত সাধারণকেই অন্ধ করেছিল তা নয়। পণ্ডিত ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক— যাঁদের দেশীয় শিল্পের সঙ্গে এবং দেশীয় মূর্তি-শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাঁরাও এই কাস্ট শ্যাডোর মোহ কাটাতে পারেন নি; তাঁরাও বোধ হয় বিশ্বাস করতেন কাস্ট শ্যাডো -বর্জিত চিত্র হতে পারে না। এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ না হলে কি কোনো পণ্ডিত বলতে পারেন 'চীন দেশের দৃশ্যচিত্রে আলো ও ছায়ার সন্নিবেশের কোনো চেষ্টার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই বলিয়া চীনা চিত্রকরদের শিক্ষাগুরু ভারতশিল্পীও যে উদাসীন ছিলেন এরূপ অনুমান সমীচীন নহে?'[2] কেবল শিক্ষার অভাবে নয়, ভুল শিক্ষায় আমাদের চিত্ত তখন বিভ্রান্ত।

দেশীয় রূপকলা সম্বন্ধে অজ্ঞতার বশে আমরা যে নিকৃষ্ট বিলাতি চিত্রের অন্ধ অনুকরণ করছি, হ্যাভেলই প্রথম সে কথা আমাদের মনে করিয়ে দেন। ইতিপূর্বে ভারতীয় ভাস্কর্য স্থাপত্য চিত্র নিয়ে দেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় শিল্পের নন্দনীয়তা (aesthetic quality) সম্পর্কে কেউ ঝোঁক দেন নি। সাহস করে হ্যাভেলই প্রথম বলেছিলেন—

It has been always my endeavour in the interpretation of Indian ideals to obtain a direct insight into the artists' meaning without relying on modern

---

১ সাহিত্য ১৩১৭ বৈশাখ।

২ ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা. রমাপ্রসাদ চন্দ। প্রবাসী ১৩২০ অগ্রহায়ণ।

archæological conclusions, and without searching for the clue which may be found in Indian Literature.[১]

অধ্যয়নবিমুখ দাম্ভিকের উক্তি বলে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হ্যাভেলকে বিদ্রূপ করেছিলেন। হ্যাভেলের এই মত অকাট্য নয় এবং ভারতীয় আদর্শ বোঝাতে তাঁকেও ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে সময়ে এই উক্তির প্রয়োজন ছিল। হ্যাভেল ছাড়া ডাক্তার কুমারস্বামী, উড্রফ্ সাহেব ও ভগিনী নিবেদিতার লেখার মধ্য দিয়ে ক্রমে ভারতীয় কলাসংস্কৃতির প্রতি ধীরে ধীরে দৃষ্টি পড়ল। যখন হ্যাভেল ভারতীয় কলাসংস্কৃতির প্রবর্তনে যত্ন করছিলেন সেই সময়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় শিল্পী বলে প্রচার করলেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত হচ্ছে, এ কথা পণ্ডিতরা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইলেন না। শিল্পশাস্ত্র উদ্ধৃত করে কেবলই তাঁরা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের চিত্রের অভারতীয়ত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন— অবনীন্দ্রনাথ বা তাঁর অনুগামীদের কোনো ছবিই ভারতীয় আদর্শে তৈরি হচ্ছে না, কারণ প্রাচীন শাস্ত্রমত তাঁরা অনুসরণ করছেন না, প্রাচীন তাল-মান-প্রমাণাদির সঙ্গে তাঁদের ছবির বিসদৃশ-রকম প্রভেদ। তাঁদের মত যে খুব যুক্তিহীন ছিল তা নয়। কারণ, সত্যই অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীনের দলভুক্ত নন; কিন্তু আধুনিক যুগের ভারতীয় মনকে তিনি যে প্রকাশ করতে পেরেছেন, এ কথা তখন পণ্ডিতরা হয়তো লক্ষ করেন নি। কিন্তু এখন আমরা তা ভালো করেই বুঝতে পারি।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত হওয়ায় যদিও পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিরুদ্ধতা এসেছিল, অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল ভারতীয় চিত্রের নবজন্মদাতা হিসাবেই। হ্যাভেল বা কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথের বা তাঁর সম্প্রদায়ের ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সবচেয়ে ঝোঁক দিয়েছিলেন তার ভারতীয়ত্বের উপর—

The work of the Modern School of Indian Painters in Calcutta is a phase of the national reawakening. The subject chosen by the Calcutta painters are taken from Indian History, romance and epic, and from the mythology and religious literature and legends, as well as from the life of the people around them. Their significance lies in their distinctive Indian-ness. They are however by no means free from European and Japanese influences. The work is full of refinement and subtlity in colour and of a deep love of all things Indian; but, contrasted wlth the Ajanta and Moghal and Rajput paintings which have in part inspired it, it is frequently lacking in strength. The work should be considered as a promise rather than a fulfilment.[২]

---

১ *The Ideals of Indian Art* by E. B. Havell.

২. E. B. Havell: quoted in *A History of Fine Art in India and Ceylon.*

ভারতীয়ত্বের উপর ঝোঁক হ্যাভেলের কথায়ও আমরা পাই—

If neither Mr. Tagore nor his pupils have yet altogether attained to the splendid technique of the old Indian painters, they have certainly revived the spirit of Indian art, and besides, as every true artist will, invested their work with a charm distinctively their own. For their work is an indication of that happy blending of Eastern and Western thought.[১]

১৯১১ পর্যন্ত নব্য বাংলার চিত্রকলার যে রূপ, তার অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচয় এই দুই উক্তিতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা করছেন বা করেছেন কিন্তু সেই আদর্শ অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদির ছবিতে প্রকাশিত হয়েছে, এ কথা দুইজনের কারো উক্তিতেই পাই না। এই সময়ে দেশের মধ্যে যে জাতীয়তার আন্দোলন চলেছিল তারই অংশ বলে অবনীন্দ্রনাথের আদর্শ জনপ্রিয় হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ স্বদেশী আর্টিস্ট, এইটাই সবচেয়ে বড় কথা—কিন্তু যে ভারতীয় আদর্শের প্রতীকরূপে অবনীন্দ্রনাথকে তখন দেখা হচ্ছিল তাঁর ভক্তরা তখনও তার রূপকলার ভাষা আয়ত্ত করতে পারেন নি। ভারতীয় শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে ধারণাও তাঁদের অস্পষ্ট। ধর্ম দর্শন সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান যথেষ্ট ছিল ; এইজন্য অবনীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যখনই তাঁরা আলোচনা করেছেন। দার্শনিক চিন্তা, সাহিত্যের রূপক, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ছবি বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা কি চোখে অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখতেন তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই—

'ভারতশিল্পে নবীন উদ্যমের নেতাগণ যে কেবলমাত্র শিল্পের জন্য শিল্পকার্য করিয়াই ক্ষান্ত তা নয়, হিন্দু জাতির প্রকৃতিগত যে আধ্যাত্মিকতা তাহারও বিকাশে ইঁহারা সকলে সচেষ্ট। সুতরাং ভারতবর্ষের আধুনিক চিন্তাপ্রবাহ, মহতী আশা ও দেশহিতৈষীতার সহিত ভারতশিল্পের এই নববিকাশের ঘনিষ্ঠ যোগ সুসংগত। ঠাকুরমশায়ের [অবনীন্দ্রনাথের] এই ছবিখানিতে [পুরীতে ঝড়, ১৯১১] আছে শুধু একটি ধূসর বালুরেখা, রুদ্র সমুদ্রের সুদূর আভাস। অথচ ভারতবর্ষের উদ্দাম প্রকৃতির সকল ভীষণতা এবং সমগ্র বিষাদ আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। ফলতঃ, যিনি এই প্রদর্শনীতে সূর্যালোক- উদ্ভাসিত দৃশ্যপট খুঁজিতে আসিবেন তিনি নিরাশ মনে ফিরিবেন। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ ভারতবর্ষের যে বাহ্যিক রূপ দেখিতে পান, প্রাচ্যসৌন্দর্য-লিপ্সু ইউরোপীয় চিত্রকরগণ যে শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ আঁকিতে চেষ্টা করেন, এ স্থানে সে ভারতবর্ষ প্রতিফলিত হয় নাই। ইহা অন্তরঙ্গ ও বিষাদাচ্ছন্ন একটি অতিপ্রাকৃত ভারতবর্ষ। রূপকাত্মক আধ্যাত্মিক ধর্মপ্রাণ ও চিন্ময়।'[২]

ছবিকে দার্শনিক বা কাব্যিক চিন্তা দিয়ে দেখবার এই চেষ্টা, এ দেশে বা বিদেশে, অবনীন্দ্রনাথের সপক্ষীয়রা সকলেই করেছিলেন। ভারতীয় ছবি ভাবাত্মক কাজেই আধ্যাত্মিক, এই বিশ্বাসে আধ্যাত্মিক ভাব ও দার্শনিক চিন্তা ছবিতে খোঁজবার চেষ্টা হয়েছিল। এই চেষ্টারই ফলে আজ অধিকাংশের কাছে আধুনিক ভারতীয় ছবি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন, এখনও এই মোহ সম্পূর্ণ কাটে নি। যাঁরা এই জাতীয় ব্যাখ্যা সে-

১. Dr. A. K. Coomaraswamy: quoted by V. Smith in *A History of Sine Ait ni India and Ceylon.*

২ ফরাসী পত্রিকা থেকে সংকলিত প্রবন্ধ: দ্র. ভারত-চিত্রশিল্পের পুনর্বিকাশ। প্রবাসী ১৩২০ শ্রাবণ।

সময় দিয়েছিলেন তাঁদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভাবের আধিক্য এমনই হয়েছিল যে, ছবি যে দেখবার জিনিস সে কথা আমরা প্রায় ভুলেছিলাম। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় শিল্পাদর্শের পুনরুদ্ধারকার্য চলেছে অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর শিষ্যদের হাতে, এইতেই সকলে খুশি। নূতন ছবিতে খুব বড় রকমের গভীর ভাব ভারতীয় চিন্ময় রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, এ কথা তখন বেশ ভালো রূপেই আমাদের মনে গেঁথেছিল। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন ভাব ও ভাষার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকাতেই কবির ভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, ছবির ক্ষেত্রেও যে তেমনি ভাব-প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষা দরকার— সে কথা তখন কেউ মনে করতে পারেন নি। রূপের রেখার বর্ণের ঝংকারে ভাব যুক্ত হলে তাকেই আমরা বলি ছবি। ছবির ভাষাকে চেনবার ঔৎসুক্য তখনও জাগে নি। এ দিক দিয়ে কোনো চেষ্টাও হয় নি। কেবল আদর্শকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল— কিন্তু ভারতীয় আদর্শ যেমনই হোক, রূপকলার ক্ষেত্রে সে আদর্শের প্রয়োগ ও প্রকাশ যে কি ভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা হত তাঁরা যদি জানতেন—

The evolution of Indian Art is organised by the rhythm which organises the work of art, and nothing is left to chance, and little to extraneous influences....Its movements are strictly regulated. In no other civilisation, therefore, we find such minute prescriptions for proportions and movements. The relation of the limbs, every bend and every turning of the figures represented, are of the deepest significance. This dogmatism, far from being sterile, conveys regulations how to be artistically tactful, so that no overstrain, no inadequate expression, and no weakness ever will become apparent. The regulations are a code of manners.[১]

এতক্ষণ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের সপক্ষে বিপক্ষে যে তর্ক উঠেছিল তারই পরিচয় দিলাম। এইবার এই তর্কজাল অতিক্রম করে তাঁর ছবির সঙ্গে পরিচয় করবার চেষ্টা করলে কি আমরা পাই, দেখবার চেষ্টা করব এবং তাঁর সম্বন্ধে মতামতের বা মূল্য কতটা, তাও যাচাই করতে পারব।

২

দেশে ও বিদেশে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় চিত্রের পুনরুদ্ধার করেছেন বলে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ কোনোদিন কোনো কিছু চেষ্টা করে পুনরুদ্ধার করতে চান নি। অলংকারশাস্ত্র তিনি পড়েছিলেন, 'ষড়ঙ্গ' লিখেছিলেন এবং 'ভারতশিল্প' গ্রন্থে ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে ওকালতিও করেছিলেন, কিন্তু ছবি রচনার কালে সে মত তিনি অনুসরণ করেন নি। সংক্ষেপে, ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও, ভারতীয় চিত্র বা ভাস্কর্যের ভঙ্গীকে তিনি অনুসরণ করেন নি।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের ১৩১৬ সালে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই থেকে তাঁর সে সময়ের মনোভাব পরিষ্কার দেখা যায়—

১ Dr. Stella Kramrisch in The Modern Review for December 1922.

'আমি দেখিয়াছি তোমরা কোনো একটা সুন্দর দৃশ্য লিখিতে হইলে বাগানে কিম্বা নদীতীরে গিয়া গাছপালা ফলফুল জীবজন্তু দেখিয়া দেখিয়া লিখিতে থাক। এই সহজ ফাঁদে সৌন্দর্যকে ধরিবার চেষ্টা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। তোমরা কি জাননা সৌন্দর্য বাহিরের বস্তু নয়, কিন্তু অন্তরের? অন্তর আগে কবি কালিদাসের মেঘদূতের রস-বরষায় সিক্ত কর তবে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিও, নব মেঘদূতের নূতন ছন্দ উপভোগ করিবে; আগে মহাকবি বাল্মীকির সিন্ধুবর্ণন, তবে তোমার সমুদ্রের চিত্রলিখন।'[১]

অবনীন্দ্রনাথের এই উপদেশের উদ্দেশ্য কি? তিনি চেয়েছিলেন কল্পনার বা ভাবের জগতে ছাত্রদের মনকে নিয়ে যেতে, কিন্তু সেই ভাব কি ভাবে কোন্ উপায়ে তারা প্রকাশ করবে সে সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নেই। বস্তুর বাইরের রূপটাই সব, তার অনুকরণই আর্ট, এই ধারণার বিপরীত মত দেখা দিল। বস্তুরূপটা কিছুই নয়, ভাবপ্রকাশের জন্য অনুকরণের কোনোই প্রয়োজন নেই— এই মতকে চরম নন্দনাদর্শ (aesthetic ideal) বলা যেতে পারে। এই মত ব্যক্তিগত; জাতিগত আদর্শ একে বলা চলে না। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা চলে, অবনীন্দ্রনাথ কোনো দেশ বা কালের আদর্শ অনুসরণ করেন নি, নিজের রুচির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল, বুদ্ধি দ্বারা সে আদর্শকে তিনি জেনেছিলেন, কিন্তু অন্তরের সঙ্গে তিনি সে আদর্শ গ্রহণ করেন নি বলেই মনে হয়—

'ভারতশিল্পের বায়ু দেবতার মূর্তি— তাও আমাদের ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের মতোই ছেলেমান্‌ষি পুতুলমাত্র। একই মূর্তি, একই হাবভাব, ভাবনার তারতম্য নেই। দেবমূর্তিগুলো তেত্রিশকোটি হলেও একই ছাঁচে একই ভঙ্গিতে প্রায়শঃ গড়া, তারতম্য হচ্ছে শুধু বাহন মুদ্রা ইত্যাদির। একই বিষ্ণু যখন গরুড়ের উপরে তখন হলেন বিষ্ণু, সাতটা ঘোড়া জুড়ে দিয়ে হলেন সূর্য। একই দেবীমূর্তি, মকরে চড়া হলেই হলেন গঙ্গা, কচ্ছপে বসে হলেন যমুনা! বেদের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের রূপকল্পনার মধ্যে যে রকম-রকম ভাবনার ও মহিমার পার্থক্য, গ্রীকমূর্তি আপোলো ভিনাস জুপিটার জুনো ইত্যাদির মূর্তির মধ্যে যে ভাবনাগত তারতম্য তা ভারতের লক্ষণাক্রান্ত মূর্তিসমূহে অল্পই দেখা যায়। একই মূর্তিকে একটু আসবাব রংচং আসন বাহন বদলে রকম-রকম দেবতার রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। বায়ু আর বরুণ, জল আর বাতাস দুটো এক নয়, দুয়ের ভাষা ও ভাবনা এক হতে পারে না। এ পর্যন্ত একজন গ্রীক ভাস্কর ছাড়া আর কেউ বায়ুকে সুন্দর করে পাথরের রেখায় ধরেছে বলে আমার জানা নেই। এ মূর্তির একটা ছাঁচ আচার্য জগদীশচন্দ্রের ওখানে দেখেছি— গ্রীকদেবীর পাথরের কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ভূমধ্যসাগরের বাতাস খেলছে চলছে শব্দ করছে— ছবি দেখে বুঝবে না, মূর্তিটা স্বচক্ষে দেখে এসো।'[২]

অবনীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের এই মত, কাজেই এই মতের মূল্য অস্বীকার করা চলে না। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিণতিতেও এই মতের কার্যকারিতা লক্ষ করা যায়।

একদিন অবনীন্দ্রনাথ দেশী ও বিদেশী চিত্রের আলংকারিক রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে (১৮৯৪) তারই প্রকাশ আমরা দেখি। কিন্তু দেশী ছবির আলংকারিক কাঠামো বিশুদ্ধ রইল না। তার বিলাতী অঙ্কনবিদ্যার প্রভাবে ক্রমে এমন-একটা রূপ পেল তাঁর ছবি যা হুবহু বিলাতী মিনিয়েচার (miniature) নয়, দেশী আলংকারিক পটও নয়— কিন্তু নতুন কালের নতুন ছবি, যে ছবি সে সময় ছিল

১ প্রবাসী ১৩১৬ কার্তিক।

২ বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী।

না কোথাও। দেশী বা বিদেশী ছবির করণকৌশল এতদিন অচল অবস্থায় ছিল, অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে দুই কৌশল একত্রিত হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠল। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার সর্বপ্রধান দান এই। আধুনিক যুগের উপযোগী রূপকলার ভাষা আমাদের দিলেন; সে ভাষা যতই অর্বাচীন হোক, তবু সেই ভাষার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করবার সুযোগ পেলাম আমরা।

১৮৯৪-৯৬ সালে যখন অবনীন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী রচনা করছিলেন তখন তিনি অখ্যাত। ১৮৯৭ সালে ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে অবনীন্দ্রনাথ সাধারণের সামনে এলেন। ভারতীয় আদর্শের নবজন্মদাতা বলে হ্যাভেল তাঁকে পরিচিত করলেন। দেশের লোক তাঁর ছবিতে 'অস্বাভাবিকত্ব', প্রকৃতির বিরুদ্ধতা, লম্বা হাত-পা দেখে কি রকম মর্মাহত হয়েছিলেন সে পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। হ্যাভেলের সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথ মোগল-চিত্র বিচারবিশ্লেষণ করে দেখলেন। মোগল চিত্রকরদের আশ্চর্য অঙ্কনকৌশল ও সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁর নিজের কথায়— 'ছবিতে ভাব দিতে হবে'। এই 'ভাব' কথাটির অর্থ তখন তিনি কি বুঝেছিলেন তা কোথাও লেখার ভাষায় প্রকাশ করেন নি। কিন্তু ছবিতে একটি পরিবর্তন দেখতে পাই যার প্রকাশ 'ভারতমাতা' (১৯০২) চিত্রে এবং যার পরিণতি 'ওমর-খৈয়াম' (১৯১৮) চিত্রাবলীতে। প্রথমেই দেখি, তাঁর প্রথম দিকের ছবির আলংকারিক বাঁধন শিথিল হয়ে এসেছে। ছবিতে পটভূমির সমতলতা নষ্ট হয়ে দূরত্ব (space depth) দেখা দিয়েছে। ছবিতে এই পরিবর্তন মোগল ও জাপানী চিত্রের সংস্পর্শে হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে বিলাতী (academic school) অঙ্কনপদ্ধতির প্রভাবও যে ছিল আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা স্মরণ রাখি না। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর টেকনিকের উপকরণ পেয়েছিলেন মোগল জাপানী এবং য়ুরোপীয় শিল্পসংস্কৃতি থেকে। য়ুরোপীয় ও জাপানী শিল্প-সংস্কৃতির প্রধান গুণ ছিল বাস্তবিক (naturalistic) প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়ে, সেই পদ্ধতির ছবিতে রূপের চটকদারিটাই সব। মোগল দরবারী পদ্ধতিকে আমরা বলতে পারি স্বাভাবিক (realistic), যাতে রূপের বাহার খোলে গুণের যোগ-বিয়োগে। অবনীন্দ্রনাথের টেকনিক যে স্বাভাবিক এ কথা এখন স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর ছবির স্বাভাবিকতা বিলাতী অ্যাকাডেমির মত নয়, জাপানীর মত নয়, মোগলের মতও নয়। এ স্বাভাবিকতা তাঁর নিজের। আরও বিচার করলে এই বলা চলে যে মোগলচিত্রের আলংকারিক রূপ, তার সূক্ষ্ম কারুকার্য, আরও একটু real করে স্বাভাবিক করে তিনি দেখালেন। কিন্তু যে উপায়ে তিনি দেখালেন সেটা কোনো বিশেষ রীতি নয়— একান্তভাবে তাঁর নিজের তৈরি, নিজস্ব ভাব প্রকাশের জন্য। অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কনরীতির প্রবর্তক নন, তিনি স্টাইলের স্রষ্টা। অবনীন্দ্রনাথের ছবির সবচেয়ে বড় সম্পদ, তাঁর স্টাইল, উপেক্ষিত রয়ে গেছে দুই কারণে। প্রথম ও প্রধান কারণ, কেবলই তাঁকে ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক কোঠায় ঠেলে দেবার চেষ্টা; দ্বিতীয় কারণ, অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি এবং তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে যে সময়ে তখন তাঁর কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি আশা ছিল ভারতীয় শিল্পী হিসাবেই— এইজন্য তাঁর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে নি; প্রাচীনের সঙ্গে তুলনা করে তিনি কতটা মোগলের কাছে পৌঁছেছেন সেইটাই দেখবার চেষ্টা হয়েছিল। এইজন্যই তাঁর স্টাইল উপেক্ষা করে তাঁর ভাবের কথাই সকলে বলেছেন।

কোনো দিক দিয়েই অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় চিত্রকরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাঁর নিজস্ব অঙ্কনভঙ্গী স্টাইলের আলোচনায় আরও পরিষ্কার হল। তাঁর আত্মতন্ত্র ও একান্ত নন্দনাদর্শ, তাঁর রূপ-উপাসক

(রূপানুকারী নয়,) দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর আঁকবার স্টাইল, সব নিয়ে তাঁকে প্রাচীনের সগোত্র বলা চলে না। তিনি আধুনিক কালের অসামান্য প্রতিভাবান চিত্রকর— এ রকম প্রতিভা দীর্ঘকাল ভারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নি। তবে কি ভারতীয় শিল্পাদর্শ আজও পুনরুজ্জীবিত হয় নি? অবনীন্দ্রনাথ কি ভারতীয় চিত্রের নূতন যুগের প্রবর্তক নন? এই প্রশ্নের উত্তর সাক্ষাৎভাবে দেবার দরকার নেই, তাঁর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাব।

বিশুদ্ধ প্রাচীন দেশী আর্ট অবনীন্দ্রনাথ করেন নি। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতায় চিত্রকলায় আধুনিক রূপ দিলেন বিভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণের দ্বারা। বিদেশী সংস্কৃতিকে যেভাবে তিনি নিজের করতে পেরেছেন সমগ্র এশিয়ায় তার তুলনা কম। যাঁরা এইভাবে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ অন্যতম এবং কোনো-কোনো দিক দিয়ে তিনি অদ্বিতীয়। জাপানে চীনে প্রাচীন পদ্ধতির বড় বড় ওস্তাদ আছেন, বিলাতীর অনুকারক আছেন, কিন্তু গ্রহণ করে নিজস্ব করে নেওয়ার ক্ষমতা দৈবাৎ চোখে পড়ে। স্বদেশীযুগের গোঁড়া মনোভাবের কাছে অবনীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ হয়তো রুচিকর হত না, কিন্তু আজকের আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি অপরের থেকে গ্রহণ করবার সাহস দিয়েছেন। তার পর, ভারতীয় পুরাতন কলাসংস্কৃতির প্রতি যে দৃষ্টি ফিরেছে সেজন্য হ্যাভেল ও কুমারস্বামীর কাছে আমরা ঋণী, এবং স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবও অনেকখানি।

কিন্তু উড়িষ্যার পূর্বপ্রথাগত খোদাইকরা মূর্তি বা পাটনা-কলমের ছবি নিয়ে আধুনিক মনকে সরস রাখা সম্ভব ছিল না। ইংরেজের আর্ট কেবল তর্ক দিয়েও দূর করা যেত না যদি অবনীন্দ্রনাথের সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ না হত। অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমরা আধুনিক হয়েছি। আধুনিক হয়ে আমরা প্রাচীনকে দেখেছি, প্রাচীনকে অনুসরণ করে আধুনিক হই নি। তার পর, যখন ইংলণ্ড এবং য়ুরোপের প্রায় সর্বত্র ছবির নামে কেবল বিদ্যার বাহাদুরি এবং ধূপছায়ার (shade and light-এর) ছড়াছড়ি চলেছে সেই সময় এই অনুকৃতির (naturalism-এর) মোহ কাটিয়ে রসসৃষ্টির আদর্শকে দেখতে পাওয়ার মূল্য অনেকখানি। তাই আর একবার বলতে হয়, অবনীন্দ্রনাথের প্রাচীন শিল্পাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার আন্দোলন নয়, তাঁর সাধনার দ্বারা শিল্পবোধের রসবোধের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে। এই দিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি।

৩

এইবার ভাবের দিক দিয়ে বা রসের দিক দিয়ে কতটুকু বলে প্রকাশ করা যেতে পারে দেখা যাক। অবনীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে বড় এবং স্থায়ী প্রভাব রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের আবহাওয়ায় অবনীন্দ্রনাথের রসবোধের উন্মেষ এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা সাহিত্য এবং চিত্র এই দুই ধারায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রতিভা এমনভাবে এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়েছে যে কোন্‌টি তাঁর প্রধান ক্ষেত্র বলা শক্ত। সাহিত্যের অনুভূতি এবং চিত্রকরের দৃষ্টি এই দুইয়ের মিশ্রণে এবং দুইয়ের দ্বন্দ্বে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা রূপ পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় আমাদের গল্প শুনিয়েছেন। ভাষার বেগে আমাদের মন এগিয়ে চলে; শুধু কথা শোনার সুখ; শুনতে শুনতে চোখের সামনে ফুটে ওঠে ছবি— ভালো করে দেখতে যাও কি ছবি ফুটে উঠল, ভাষার দমকে আর উপমার ঝংকারে সবকিছু মিলিয়ে যায়, আবার হঠাৎ আসে আর-একটা ছবি। ভাষা, অলংকার, ক্রমে ছবি, তাও মিলিয়ে আসে— মনের মধ্যে বাজতে থাকে শব্দের ঝংকার; আবার মনে

পড়ে যায় ভাষা, অলংকার, চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছবির টুকরো। তাঁর রাজকাহিনী, ভূতপত্রীর দেশ, বুড়ো আংলা— ধ্বনির তরঙ্গে ভেসে ওঠা ছবি। আর, চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের ছবি কিরকম তার উত্তরে বলতে পারি— বর্ণের ঝংকারে ফুটে ওঠা রূপ। সাহিত্যে যেমন তাঁর শব্দের ঝংকার, ছবিতে তেমনি তাঁর বর্ণের ঝংকার আমাদের আকৃষ্ট করে। ছবিতে রঙের জগৎ পেরিয়ে একটুখানি রূপের আভাস আমরা পাই, কিন্তু বর্ণের আবরণের অন্তরাল থেকেই রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। একেবারে সামনে এসে দৈবাৎ অবনীন্দ্রনাথের রূপের জগৎ আমাদের দেখা দেয়। তাঁর আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলীতে এই রূপের জগৎ যত কাছে আমাদের আসে, অন্য কোথাও দৈবাৎ এমন করে তার সাক্ষাৎ পেয়েছি। অধিকাংশ স্থলেই একটু সুর একটু ইঙ্গিত দিয়েই তাঁর রূপের জগৎ বর্ণের অন্তরালে মিলিয়ে যায়। এত মৃদু সেই ইঙ্গিত, এত ক্ষণিকের যে চিত্রকরের নিজেরই সন্দেহ জাগে, সব সুর কানে পৌঁছবে কি না, সব ইঙ্গিতের অর্থ আমরা বুঝব কি না। তাই আগে থেকে বলে রাখার চেষ্টা। এই চেষ্টা থেকেই অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে নামের প্রবর্তন এবং এইজন্যই অবনীন্দ্রনাথ ছবিতে নামের এত মূল্য দিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনা আর তাঁর ছবিরচনা, এই দুয়েরই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ভঙ্গী— দেখাবার জন্য দেখানো, বলবার জন্যই বলা। বলবার জিনিসটা যেমনই হোক, বলে তিনি কিছু বোঝাতে চান নি। দেখিয়ে তিনি কিছু চেনাতে চান নি। তিনি তাঁর সাহিত্যে ছবিতে যা করতে চেয়েছেন তা তাঁরই কাছ থেকে আমরা শুনে নিতে পারি—

'শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হোলো উচ্চারিত ছবি, তার ছবি হোলো রূপের রেখায় রঙের সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে রূপকথা।'

অবনীন্দ্রনাথের ছবি সত্যই রূপকথা— রঙের সুরে, রূপের ইঙ্গিতে তা ব্যক্ত হয়েছে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

ABANINDRANATH TAGORE : HIS EARLY WORKS. Art Section, Indian Museum, Calcutta ; Price Paper Cover Rs. 13/- Cloth and Board Edition Rs. 15/-

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের উদ্যোগে প্রকাশিত এই গ্রন্থে যে-ছবিগুলি সংকলিত হয়েছে, আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে সেগুলি অমূল্য সম্পদ। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈগুণ্যে অবনীন্দ্রনাথের যৌবনকালে রচিত এই ছবিগুলি কখনোই উপযুক্ত সমাদর পায় নি। অবনীন্দ্রনাথ যখন এই ছবিগুলি এঁকেছিলেন তখনকার বিলেতি নন্দনরুচির দ্বারা প্রভাবান্বিত শিক্ষিতসমাজে ছবিগুলির যথার্থ মূল্য স্বীকৃত হয় নি। তেমনি, আজও আছেন বিলেতি নন্দন-আদর্শের প্রভাবে নবীন শিল্পী ও শিল্পরসিকের কাছে এই ছবিগুলির মূল্য স্বীকৃত হবে কি না সন্দেহ হয়। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা এবং তাঁর প্রথম দিকের ছবিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু আধুনিক মনোভাবাপন্ন শিল্পরসিকের মনে সে আলোচনা কতটা স্থান পাবে তাও বলা যায় না।

অবশ্য সকল দেশেই মহৎশিল্পীদের সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকে, কোনো প্রতিভাকে একবাক্যে স্বীকার করে নিতে সময় লাগে। কাজেই অবনীন্দ্রনাথের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে যাঁরা অবনীন্দ্রনাথের নিন্দা করে থাকেন, সন্দেহ হয়, তাঁদের অনেকেই অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখেন নি। অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্র বাংলাদেশের বাইরে কমই প্রদর্শিত হয়েছে। তাঁর পরিণত প্রতিভার রচনা বাংলাদেশের মধ্যেও সুপরিচিত বলা চলে না। এ অবস্থায় অবনীন্দ্রনাথের চিত্র 'book illustrationএর বেশি কিছু নয়' এ রকম একটা ধারণা হবার কারণ কী, এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে— অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই 'সহজিয়া' উপেক্ষার বাণী আমাদের রসিকসমাজ আয়ত্ত করেছেন ইংরেজ সমালোচক রজার ফ্রাই এর কাছ থেকে। রজার ফ্রাই ঠিক এইরকম মতই দিয়েছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথের ছবি magazine illustration। অবশ্য, রজার ফ্রাইও যে অবনীন্দ্রনাথের ছবি ভালোভাবে দেখে এ মত দিয়েছিলেন তা নয়। রজার ফ্রাই -এর শিল্পবিষয়ক বহু মতামত তাঁর নিজের দেশে পুরোনো এবং বাতিল হয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের দেশের নব্যরসিক-সমাজে অনেকের কাছে তাঁর মতামত আজও অভ্রান্ত। পৃথিবীতে এমন কোনো মহাপুরুষ বা কৃতী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নি যাঁকে কথার প্যাঁচে ক্ষণকালের জন্যে নস্যাৎ করে দেওয়া না যায়। কিন্তু আবার তাঁদের নাম সমাজে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং আবার তাঁরা মানুষের পূজা পান। এমনিভাবেই ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে স্মরণীয় নাম চিরস্মরণীয় হয়ে ওঠে।

একসময়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধেও কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছিলেন— যথেষ্ট আধুনিক তিনি নন বলে তাঁকে জাতে ঠেলে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির নব নব দিক-পরিবর্তনের সঙ্গে পাঠকের সম্বন্ধ মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধ মত স্থায়ী হতে পারে নি।

চিত্রের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ যে বিস্ময়কর নূতন সৃষ্টি করেন নি তা নয়। কিন্তু তাঁর সেই নূতন সৃষ্টি

রসিক দর্শকের সামনে আসবার সুযোগ পায় নি। কাজেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ আলোচনা নাও স্বীকৃত হতে পারে।

অবশ্য কেউ যদি পাশ্চাত্য শিল্পের আধুনিক পরিভাষায় অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করেন— অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের textural quality, তাঁর রচনায় outer structure ও inner function, তাঁর ছবিতে visual aspect ও tactile aspect -এর মূল্য ইত্যাদি ইত্যাদি, তা হলে এইসব অর্ধজীর্ণ বাক্যসমাবেশে হয়তো নব্যমনকে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নূতন করে সচেতন করে তুলতেও পারে। এবং সেই অবস্থায় হয়তো অবনীন্দ্রনাথের ছবি না দেখেও তাঁর প্রতিভার অসাধারণত্ব মেনে নিতে আপত্তি হবে না।

পুস্তকসমালোচনার ক্ষেত্রে সাময়িক মতামত সম্বন্ধে উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সাময়িক মতামতের মূল্য চিরন্তন না হলেও অল্প মুহূর্তের জন্য সাময়িক মতামতের আচ্ছন্নতা অত্যন্ত গাঢ়। সাময়িক মতের মোহ এত গাঢ় বলেই এর বাইরের কিছু লক্ষের মধ্যে নিয়ে আসা প্রায় দুঃসাধ্য। এইজন্যই মূল বক্তব্যে পৌঁছবার পূর্বে সাময়িক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা দরকার।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরচনার দীর্ঘ ইতিহাস আজ আমাদের সামনে রয়েছে। তাঁর শিল্পের বিবর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে কী আমরা পেতে পারি, কী পেতে পারি না, সে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো আজ কঠিন নয়।

যে যুগে অবনীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন সে সময়ে সমগ্র প্রাচ্যশিল্পের অবস্থা প্রায় একই রকম।

চীন জাপান বা ভারতবর্ষে শিল্পসংস্কৃতির সামনে প্রধান সমস্যা পাশ্চাত্য প্রভাবকে গ্রহণ বা বর্জন। এই দুই চরম মনোভাবের পক্ষে, অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার আলো শিল্পীদের আত্মীকরণের পথ দেখিয়েছিল। এদিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কেবল ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসেই স্মরণীয় যে তা নয়, এক্ষেত্রে সমগ্র প্রাচ্য ভূভাগের ইতিহাসেও আজ অবনীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভা বিরল।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্ররচনা, আঙ্গিকে দুর্বল বা করণকৌশলের দিক দিয়ে বৈচিত্র্যহীন কি না সে আলোচনার শেষ মীমাংসা না করেও কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্যেই সহজে প্রমাণ করা যাবে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণের ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পভাষা যে একদিন নবজাগ্রত ভারতবাসীকে আত্মপ্রকাশের সামর্থ্য ও সুযোগ এনে দিয়েছিল, এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একদল স্বেচ্ছাসেবক গঠন করেন নি বলে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের নাম জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা চলে না, তেমনি অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার দান আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা চলে না। এ কথা বলা চলে না যে, তিনি সাময়িকতার নিদর্শন মাত্র।

অবশ্য পূর্বেই বলেছি, শুধু ইতিহাসের খাতিরেই যে অবনীন্দ্রনাথ স্মরণীয় এমন নয়। তবে ইতিহাসের সাক্ষ্যকে ব্যক্তিগত খেয়াল ব'লে উপেক্ষা করা সহজ নয়, এজন্যই ইতিহাসের কথা উল্লেখ করলাম। প্রতিভার আভিজাত্যে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকলার ইতিহাসে অমর। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার অসাধরণত্ব বা তার বৈশিষ্ট্য জানতে হলে যে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাঁর শিল্পজীবনের যোগ সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়া দরকার। ইউরোপের রেনেসাঁ-যুগের প্রবর্তিত realismএর আদর্শ উনবিংশ শতকের গণ্ডির

মধ্যে এসে যখন চরম বাস্তবতার সংস্কারে পরিণত হল, যখন নগ্নদেহ ছাড়া শিল্পীদের সামনে আর কিছু রইল না, তখনই ইউরোপীয় শিল্পীদের চমক ভাঙল, তাঁরা বুঝলেন— আসল শিল্পদৃষ্টি তাঁরা হারিয়েছেন।

তার পর দুর্দমনীয় ইচ্ছা ও প্রাণপণ চেষ্টার সঙ্গে অনুসন্ধান চলল শিল্পদৃষ্টিকে ফিরে পাবার।

আধুনিকতার নামে ইউরোপে যে শিল্পসংস্কৃতি সম্প্রতি গড়ে উঠেছে তার মূল উদ্দেশ্য শিল্পদৃষ্টিকে ফিরে পাওয়া। cubism থেকে শুরু করে constructionism পর্যন্ত যে চেষ্টা তাকে খেয়াল বলা চলে না; কিন্তু সে চেষ্টায় ইউরোপীয়রা যা পেয়েছেন তা শিল্পদৃষ্টি নয়— শিল্পভাষার বহু ঐশ্বর্য, শিল্পকৌশলের বহু নূতন নূতন ভাব ও ভঙ্গী। ইউরোপে এই ভাবে যাঁরা শিল্পের ব্যাকরণ, শিল্পের ভাষা ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন তাঁরাই নিজেদের সেই কৃতিত্বে কতটা মুগ্ধ তাও বলা কঠিন।

কিন্তু আধুনিক দর্শক যে আধুনিক শিল্পের এই নূতন নূতন সিদ্ধাই দেখে-শুনে বহুশঃ বিভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক দিকে চরম বাস্তবতা, অপর দিকে জ্যামিতিক বা মনস্তাত্ত্বিক দুর্বোধ্য মার-প্যাঁচ, এই দুই চরম অবস্থার মধ্যেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্প রচিত হয়েছে। তাঁর প্রথমজীবনে অবনীন্দ্রনাথ যাঁদের দর্শক রূপে পেয়েছিলেন তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বাস্তবতার ক্ষেত্রে। তাই, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরচনাকে চিনতে পারা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আর আজ যাঁরা নূতন দর্শক, তাঁদের দৃষ্টিও বিজ্ঞান-ঘেঁষা, ব্যাকরণ-ঘেঁষা। এঁরা অনুসন্ধান করছেন শিল্প-বিজ্ঞানের কতটা সম্পদে এই চিত্রকলা সম্পংশালী। বলা বাহুল্য, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টি থেকে কোনো 'চরম' আদর্শ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, অবনীন্দ্রনাথ বাস্তবতাকে যেমন একমাত্র লক্ষ্যবস্তু বলে দেখেন নি, তেমনি শিল্পের বিজ্ঞানকে বা ব্যাকরণকেও কোনোদিন শিল্পের প্রাণ বলে মেনে নেন নি। অবনীন্দ্রনাথের সহজাত শিল্পদৃষ্টির সামনে যা প্রকাশিত হয়েছিল, রঙে রেখায় তারই রূপ আমাদের সামনে তিনি প্রকাশিত করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে চেষ্টার আধিক্য নেই বলেই সে ছবি সহসা দুর্বল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা সহজ তাই যে অসার, অতি সাধারণ অথবা দুঃসাধ্য সাধনারই সিদ্ধি নয় এ কথা স্বতঃসিদ্ধ মনে করি নে।

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার মহত্ত্ব উপলব্ধি করার পথে বড় বাধা এই দিক দিয়ে। যথার্থ সহজ হওয়া কত কঠিন, কত অসাধারণ— আধুনিক দর্শকের মনে তার কোনো ধারণা আছে কিনা সন্দেহ হয়, বর্তমান যুগটা কারসাজির যুগ, সিদ্ধাইয়ের কেরামতি দেখব বলেই আমরা উৎসুক। এই অবস্থায় শিল্পসৃষ্টির অনায়াসলব্ধ রূপ আমাদের অনেকেই স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তবে এই সহজ সৃষ্টির আদর্শ যে সংসার থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে তাও বলা চলে না। ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় শিল্পী ও শিল্পজ্ঞ রসিকেরা কেউ কেউ তাঁদের আধুনিকতার আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন।

বিচার-বিশ্লেষণের পথে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীরা যা পেয়েছেন সাক্ষাৎভাবে ঠিক-ঠিক শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই —এ সন্দেহ যখন একবার দেখা দিয়েছে, তখন শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচলিত বহু মতামতের অদল-বদল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অবশেষে, হয়তো এই নূতন মত-পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার অসাধারণত্ব রসিকসমাজে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প-সমালোচক ও নব্য মেজাজের রসিক ইউরোপের চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রেখে চলেন না। চলা সহজও নয়। তাই আজও তাঁরা cubism প্রভৃতি মাপকাঠি নিয়ে সন্তুষ্ট, তারই সঙ্গে কিছু folk tradition -এর কথা এবং ইতস্তত সমাজসচেতন হওয়ার

অনভ্যস্ত বুলি। এই অবস্থায় অবনীন্দ্রনাথকে নাকচ করে দেওয়া সহজ। কিন্তু এই বিচারকৈ চরম সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেওয়ারও হেতু নেই। ব্যাপকভাবে দেখলে দেখা যাবে, শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে মতামত, আদর্শ, উদ্দেশ্য সব-কিছুই বাষ্পভাবাপন্ন— কারণ, কাল যে মনোভাব যে আদর্শ স্থির ছিল, আজ সে সম্বন্ধে সন্দেহ এসেছে। এই বিবর্তনের কালে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যাঁরা আস্থাবান তাঁদেরও ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায় নেই।

এইবার সাক্ষাৎভাবে পুস্তকখানি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বইখানিতে যে ছবিগুলির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে সে ছবিগুলি তাঁর শিল্পপ্রতিভার উন্মেষের পরিচায়ক এবং তাঁর আঙ্গিকের পূর্ণপরিণতির ইঙ্গিত।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, অবনীন্দ্রনাথের এই প্রথম দিকের চেষ্টার মধ্যে কোথাও revivalএর ন্যূনতম ইচ্ছাও নেই। গ্রহণ আছে, যেমন ২ ও ৩ সংখ্যক চিত্রে। তার পর আমরা পাই জাপানি শিল্পের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয়ের নিদর্শন ৪, ৭, ৮ সংখ্যক ছবিতে।

নিজের আঙ্গিককে গড়ে তোলার জন্য অবনীন্দ্রনাথের চেষ্টার নিদর্শন উক্ত ছবিগুলি। কিন্তু তাঁর সহজাত শিল্পদৃষ্টিকে অনুসরণ করে তাঁর আঙ্গিক কী রূপ পেয়েছে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ৬, ১২, ১৩ সংখ্যক চিত্র। আর, অবনীন্দ্রনাথের পরিণত স্টাইলের নিদর্শন ৯, ১০ সংখ্যক চিত্র। পুস্তকের নাম 'Early Works' হলেও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার অবশ্যস্মরণীয় কতকগুলি ছবি এই পুস্তকে পাওয়া যাবে।

স্বর্গত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যে নিপুণতার সঙ্গে এটি সম্পাদন করে গেছেন সেজন্য রসিকসমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। আশা করা যায়, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরসিক দেশবাসী, অন্তত শিল্পীরা, বইখানি সংগ্রহ করবেন। অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহুব্যাপ্ত অবহেলা ও ঔদাসীন্য সত্ত্বেও, অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার দ্বারা প্রভাবান্বিত ও উপকৃত নন এমন শিল্পী ভারতবর্ষে কম। এজন্য তাঁর প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে পরিচয়-সাধন ও তার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন শিল্পী-মাত্রের অবশ্য কর্তব্য।

অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলী এখনও অপ্রকাশিত। আশা করা যাক, শীঘ্রই সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা হবে ; ফলে দেশে ও দেশের বাইরে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তা কিছু পরিমাণে দূরীভূত হবে।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

মাসি। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা ১২। মূল্য আড়াই টাকা

একে তিন তিনে এক। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা

মারুতির পুঁথি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭। মূল্য সওয়া তিন টাকা

রং-বেরং। অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, কলিকাতা ১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা

চাঁইবুড়োর পুঁথি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭। মূল্য তিন টাকা

অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন। অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা

সাহিত্যের আসরে স্বীকৃতি অবনীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই পেয়েছিলেন, কিন্তু সত্যকার প্রতিষ্ঠালাভ করলেন শেষজীবনে। তাঁর প্রথমযুগের রচনাগুলি লোককে আকৃষ্ট করে নি তা নয়, কিন্তু বিভ্রান্তও করেছিল। সেগুলির যে একটা বিশিষ্টতা ছিল তা নজর এড়ায় নি। কিন্তু সেই বিশিষ্টতা ছিল একটু উগ্র রকমের। তার মধ্যে খেয়ালখুশির, ব্যক্তিগত মেজাজ, অভিরুচি ও কণ্ঠস্বরের এমন একটা অকুণ্ঠ প্রকাশ ছিল যা তখনকার দিনের সাহিত্যরীতিতে অভ্যস্ত বাঙালী পাঠকের পক্ষে পরিপাক করা সহজ ছিল না। কাহিনী খুঁজতে এসে পেল তারা ছবির পর ছবি যার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ উপভোগ করার মত মন তখনও তৈরি হয় নি ; অর্থসংগতি খুঁজতে পেল ভঙ্গিমার বৈচিত্র্য যা কথার সূত্রটিকে কেবলি প্রসঙ্গ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায় ; ভাষার বুননে দেখল এক অদ্ভুত খামখেয়ালি— তার মধ্যে মিশেছে ঘরোয়া কথা, হাটবাজারের কথা, উড়ে বামুন খোট্টা দরোয়ান দাস দাসী নায়েব খাজাঞ্চির বুলি, বটতলার পাঁচালি, আর তা ছাড়া লেখকের মেজাজের মোচড়ে তৈরি অদ্ভুত সব ইডিয়ম বা শব্দঝংকার। একটা বিরোধিতার পালা যে শুরু হয় নি তার কারণ অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের প্রতিষ্ঠা। তা ছাড়া রচনাগুলি এসেছিল প্রতিভার বাড়তি দান হিসাবে, শিল্পীর নিভৃত ব্যক্তিগত জীবনের, কিংবা তাঁর অবসরযাপনপদ্ধতির সাক্ষ্য হিসাবে। শিল্পীর কোনো নূতন সৃষ্টির রাজ্যে পদক্ষেপকে লোকে একটু প্রশ্রয়ের চোখেই দেখে। সে যেন প্রতিভার কাজ নয়, খেলা। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের খেলা ক্রমশই একটা মনোহর ব্যতিক্রমের ভূমিকা থেকে সুসম্বদ্ধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উঠেছে। সমসাময়িক সাহিত্যে এই সৃষ্টিকে তার মর্যাদার আসনটি না দিয়ে আর উপায় নেই।

এর থেকে বোঝা যায়, এমন কোনো তাগিদ অবনীন্দ্রনাথের স্বভাবে ছিল যা তাঁকে অনিবার্যভাবে ঠেলে দিয়েছে সাহিত্যের দিকে। শুধু চিত্রশিল্পে ভিতরকার সে দাবি মেটবার নয়। শিল্পীর ভিতরে ছিল একটি মানুষ যে তার দৈনন্দিন ঘরোয়া জীবনটিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল। চেনা ঘরদোর বাগানবাগিচা আসবাব-সরঞ্জাম আনাচকানাচ, চেনা লোকজন কথাবার্তা আদবকায়দা, মায়ামমতা ও অন্তরঙ্গতার রসে ভরা ঘরোয়া জীবনের অনুভূতির বিচিত্র সূক্ষ্ম হার্মনি, এবং এই চেনা জীবনের স্নেহ-পরিবেশের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে মনোহর কিম্বা উদ্ভট খেয়ালের স্বপ্নযাত্রা· ·এই সমস্ত অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাপীড়ামুক্ত (unsophisticated) মনের কাছে এতই সত্য, এতই মূল্যবান, এতই সৃষ্টিবেগময় ছিল যে তার একটা নিষ্ক্রমণ-ব্যবস্থা না করে তাঁর উপায় ছিল না। প্রথমটায় এর সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন না হয়েও নিজের ঝোঁককে পথ করে দিয়েছেন, কিন্তু পরের দিকে তিনি সাহিত্যের

ক্ষেত্রেও হয়ে উঠেছেন সচেতন শিল্পী। দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধের যে অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে তার শিল্পমূল্য আবিষ্কার করেছেন শিল্পগুরু, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেছি আমরা।

জীবনভোগের এক মহলে তাঁর এমন অবাধ অধিকার থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি শিশুসাহিত্যের গণ্ডীতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। জেম্‌স্ জয়েসের 'ইউলিসিস' ধরণের কোনো এক বৃহত্তর সাহিত্যপ্রচেষ্টা তাঁর কাছে আশা করা যেতে পারত। কিন্তু তাঁর মনটি ছিল কিশোরের, একদিকে সরল, নমনীয়, স্নেহকোমল, অন্যদিকে আবার কৌতুকক্রীড়াচঞ্চল, শাণিত চতুর দুষ্টামির হাসিতে উজ্জ্বল। এই রকমের মনে যদি প্রতিভার স্পর্শ লাগে, তবে তা সহজেই লাভ করে একটি সুন্দর যথেচ্ছাচারের অধিকার, কিছু একটা সম্পূর্ণ ভেবে দেখা বা গড়ে তোলার দায়িত্ব এড়িয়ে বিষয় থেকে বিষয়ে, আনন্দ থেকে আনন্দে পলায়নের অধিকার। তাই মণিমুক্তা যতই থাক সেইগুলিকে গাঁথবার সূত্র খুঁজে নেওয়াই অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে শক্ত ছিল। কাহিনীটা কোথাও থেকে পেলে— তা সে রাজস্থান থেকেই হোক. বা প্রচলিত কোনো উপকথা রূপকথা হিতোপদেশের গল্প বা মেয়েলি ব্রত কথা থেকেই হোক— তাতে রং ফলাতে, সূক্ষ্ম সুন্দর কারুকাজে তাকে ভরে তুলতে, শিল্পীর ভেল্কি লাগিয়ে তাকে একেবারে নূতন ক'রে ফেলতে তাঁর আনন্দ। মোট কাঠামোটা প্রকৃতির ভাঁড়ার থেকে নিয়ে তিনি করেন 'কুটুম-কাটমে'র কারিগরি। যেখানে তাঁকে সত্যিই কাহিনীটা বানিয়ে নিতে হয় সেখানে সব চেয়ে স্বাভাবিক, সব চেয়ে সুপরিচিত এবং তাঁর সৃষ্টির পক্ষে সব চেয়ে অনায়াস সম্ভবনাময় কাহিনী-সূত্রই তিনি বেছে নেন। সে আর কিছু নয় ভ্রমণ। দেশ থেকে দেশে, এবং সেই উপলক্ষ্যে অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতায় ভ্রমণ। যেমন বুড়ো আংলায়। দীর্ঘ নিরবিচ্ছিন্ন ভ্রমণ না হয় অন্তত ফেরি ষ্টীমারে ডেলি পেসেঞ্জারি যেমন দেখি তাঁর 'মাসি' বাদে একমাত্র বয়স্ক কাহিনী 'পথে বিপথে' গ্রন্থে।

তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর গ্রন্থগুলি শিশু বা কিশোর সাহিত্যের শ্রেণীভুক্তই করতে হয়। কিন্তু এই সাহিত্যের স্রষ্টাকে স্থান দিতে হবে বাংলা সাহিত্যের খোলা দরবারে। সেখানে তাঁর দান কোনো বই নয়, ঐ সমস্ত বইয়ের উৎস একটি সম্পূর্ণ জগৎ ; কাহিনী নয়, একটি নূতন সাহিত্যিক মেজাজ, একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক কণ্ঠস্বর।

'পথে বিপথে' বাংলা গল্প-সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করা উচিত ছিল। যদি তা না পেয়ে থাকে তার কারণ এর সূত্রবয়নের অনিশ্চয়তা। কিছুকাল হল অবনীন্দ্রনাথের যে দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে, তারা সৌভাগ্যক্রমে সে দোষে দুষ্ট নয়। সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের যা প্রত্যাশা তা এই দুটি গ্রন্থ অপূর্ণ রাখে নি। বিশেষ ক'রে এদের মধ্যে দেখা যায় পরিকল্পনার সামঞ্জস্য ; শুধু উজ্জ্বল বিচিত্র উপাদান বা অংশগুলির প্রতি মনোযোগ নয়, সম্পূর্ণ কাহিনীটার সুমিতি ও সুষমার দিকে দৃষ্টি।

'মাসি' বইখানির বিশেষত্ব তার স্নিগ্ধ অন্তর্লীন গল্পসূত্রটি। মাসি বাড়ি বদলেছেন, বোনপো অবু খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির। ব্যস্, এইটুকুই গল্প। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃত্রিমতামুক্ত এই সরল সূত্রটিকে অদ্ভুত কৌশলে ব্যবহার করা হয়েছে যার ফলে দুটি বিভিন্ন পরিবেশের জীবনধারা তাদের পরস্পর তুলনীয় দৃশ্য চরিত্র ও সূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে অতি স্বাভাবিক ভাবে ধরা দিয়েছে। আর তার ফলে 'ঘরোয়া'র কবিশিল্পী ঘরকে ঘিরে তাঁর প্রীতি ও ইন্দ্রিয়বোধের সংবেদনগুলিকে স্মৃতির মধ্য থেকে টেনে এনে সাজিয়ে গুছিয়ে

সামনে ধরে দিতে পেরেছেন। সমস্ত কাহিনীটির আবহাওয়া একটি স্নিগ্ধমৃদু অনুভবের অনুচ্চগ্রামে স্থাপিত। তার মধ্যে পুরানো কথা ভাবার, কথার পিঠে কথা বানিয়ে চলার, যৎসামান্যকেও দৃষ্টির প্রসাদ দেবার মত যথেষ্ট অবসর আছে। চলন-বলনের খুঁটিনাটি নিয়ে রঙ্গরস সেখানে বেমানান নয়। একেবারে সাধারণ আটপৌরে জীবনের সুরটিকে স্থায়ী ক'রে তার উপর তোলা হয়েছে মিড়, দৈনন্দিনের অনুগ্র জমিতে ফুটে উঠেছে ভালোবাসার, ভালো-লাগার, খেয়ালের রঙতামাশার কারুকার্যগুলি। এইটুকু গল্পের আসরে কত সহজে বিনা আড়ম্বরে যাচ্ছে আসছে হরেকধরণের চরিত্র। হয়তো কেউ নেপথ্যে থেকেই মনোযোগ দাবি করছে, সামনে আসছে না। যেমন ফেলা, আর ফেলার মা ও আরো অনেকে। ঐ ঝঙ্কারী ছিঙ্কারী চাংড়াদাদা চাংড়াদিদি, বাসুন্তে ইত্যাদির এ গল্পের মধ্যে কাজ কি ? কাজ এই যে ওরা ওরাই, বিশিষ্টভাবে ওরা ওদের নিজস্বতাটুকু জাগিয়ে রেখেছে, গৃহের পরিবেশটুকে তার দ্বারাই করেছে ঐশ্বর্যময়। ঝি-চাকরের কথা বলতে হঠাৎ কবিতার আবির্ভাব বইএর মধ্যে। "ওরা আমারও কেউ ছিল, তোমারও কেউ ছিল।" এ কবিতা নেহাত খেয়ালের ব্যাপার নয়। ল্যাম্-এর মধ্যে চেনার প্রতি, সাবেকি জিনিসের প্রতি, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর প্রতি, Quaint বা বেখাপ্পা ব্যাপার ও জিনিষের প্রতি যে মমতা কাব্যরসাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, অবনীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই পর্যায়ের একটি অতি সূক্ষ্ম গভীর রসবোধ সারাজীবন তাঁর মনকে সমৃদ্ধ করেছে, তাঁর শিল্প ও সাহিত্যেও অরুপণধারায় নেমে এসেছে। মাসি গ্রন্থে এই ঘরোয়া রসের অনেকগুলি দিক্ ফুটেছে। তার মধ্যে মিলেছে লঘুর সঙ্গে গম্ভীর, পরিহাসের সঙ্গে একটি স্নিগ্ধশ্রী, একটি অন্তরঙ্গ মাধুর্যের ধ্যান। সহজ সরল কথোপকথনের আশ্চর্য কলাকৌশলের সুরের যে হার্মনি মাসিতে ধরা দিয়েছে, উপাদানগৌরব চাপিয়ে কাহিনীর মূল ঐক্যের যে স্নিগ্ধ হৃদয়টি আত্মপ্রকাশ করেছে তা মাসিকে শ্রেষ্ঠসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। ভার্জিনিয়া উল্ফ্ প্রমুখ সাহিত্যিকরা শান্ত অনুত্তেজিত পরিবেশে সূক্ষ্ম হৃৎস্পন্দন রেখাঙ্কিত করার যে চেষ্টা করেছেন, মাসি সেই ধরণের সৃষ্টি। সেই হিসাবে এর শ্রেষ্ঠতা সংশয়াতীত। একেবারে হালকা হাসি থেকে গভীরতম উপলব্ধি পর্যন্ত অনুভবের যে range এই কাহিনীর মধ্যে অবলীলাক্রমে গ্রথিত হয়েছে তা অবনীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

ঘরোয়া কথাবার্তার বিভ্রমে যে ধ্যানটি একবারও বিক্ষিপ্ত হয়নি চকিতে এখানে ওখানে তার দেখা মেলে। যথা—

"চাঁদের আলো পাতার ছাওয়া মাড়িয়ে মাসি চলে গেলেন নিজের ঘরে। যেন শ্বেতপাথরের পুতুল বাগান ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে। মাসির ঘরের আজন্ম চেনা কতদিনের ঘড়ি সুর পাঠালে, যেন একটি ছোট্ট মেয়ে সোনার মন্দিরাতে ঘা দিয়ে দিয়ে থামল।"

'মাসি' শিশুদের জন্যই নয়, সকলের। কিন্তু 'একে তিন তিনে এক' ছেলেমেয়েদের জন্য। এর মধ্যেও এমন একটি সুসামঞ্জস্য, একটি শিল্পের সর্বাঙ্গীণতা দেখি যা অবনীন্দ্রনাথের আগেকার লেখাগুলিতে ছিল না। যাত্রাপালার অনিয়ন্ত্রিত কৌতুকপ্রবণতা এখন দেখি শিল্পসংগতির মধ্যে ধরা দিয়েছে, তাই এর দুটি নাটিকা— ধরা পড়া ও রাসধারী— অতি উপাদেয় হয়ে উঠেছে। গল্পগুলি নিপুণভাবে সীমিত ; উপাদানগুলি বিশৃঙ্খল নয়, আধারকে তারা বিড়ম্বিত করেনি। দুএকটি পুরাণো উপকথা বা fableএর নূতন রূপ দেওয়া হয়েছে,

এবং তার মধ্যে যেটুকু নূতন দান তা নিখুঁতভাবে উৎকীর্ণ। পরিশ্রমী পিঁপড়ে পুরানো উপকথার জিনিস, কিন্তু 'গঙ্গা গঙ্গা' বলে গঙ্গাফড়িংএর সংকীর্তন এক নূতন সরস সৃষ্টি। কোনো-কোনো গল্পে প্রচলিত উপকথার ছড়া প্রভৃতির চরিত্র, যথা ভোম্বলদাস, রতা শেয়াল ইত্যাদি নিয়ে নূতন চমৎকার কাহিনী তৈরি করা হয়েছে। কোনো-কোনো গল্পের আসর একেবারে লৌকিক জীবনের দৈনন্দিন আনাগোনা দেখা-শোনার মধ্যে পাতা হয়েছে। 'একে তিন তিনে এক' তিন পাড়াগেঁয়ে বন্ধুর কলকাতা ভ্রমণ। এই ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার সমস্ত বিচিত্র রস কি অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ সমন্বিত করেছেন, তা এই গল্পটি না পড়লে বোঝা যাবে না। এই বইএর গল্পে, নাটিকায় বিভিন্ন চরিত্রকে, এমন কি তাদের গৌণতমটিকে তিনি এমন নিপুণ আলেখ্যে ফুটিয়েছেন যার তুলনা শুধু তাঁর নিজেরই অঙ্কনশিল্প। 'মন-বুলবুল' গাইতে গাইতে যে নেড়ানেড়ী ঢুকল, আমি তাদের বাউল-সুলভ চোখ-ঝামটি (যাঁরা রসিক বাউল গাইয়ে দেখেছেন তাঁরা কথাটা বুঝবেন) দেখতে পেলুম।

মোটকথা একে তিন তিনে এক সাহিত্যক্ষেত্রে শিল্পোৎকর্ষের নূতন মান নিয়ে প্রবেশ ক'রেছে।

শেষজীবনে এক ধরণের স্বগত কৌতুকে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন বহু যাত্রার পালা। বিষয়চয়নে বাধা মানেন নি কিছু। পুরাণ, ঈশপের গল্প, সংস্কৃত উপকথা, রামায়ণ, মহাভারত, এমন কি আধুনিক লেখকের লেখা কোনো গল্প— যা পেয়েছেন হাতের সামনে তাই নিয়েই শুরু করেছেন পালাগান। গল্পগুলো কখনো-কখনো হয়ে উঠেছে একেবারে উদ্ভট কল্পনা— যেমন গ্রীসের আফ্‌লাতুন (প্লেটো)কে এনে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর মুলাকাত করিয়ে দেওয়া। কিন্তু একটি বিচিত্র উচ্চ কৌতুক-রসায়ন কোথাও ফুরিয়ে যায় নি। এই ভোগরসই এই লেখাগুলির প্রাণ। যাত্রাপালার টেকনিকেই এর অনেক পরিমাণে মুক্তি সম্ভব, কিন্তু সবটা নয়। যাত্রার রচনাকার নিজের টীকা-টিপ্পনি, রঙ চড়িয়ে বর্ণনা, দর্শক-পাঠকের সঙ্গে রসিকতা ইত্যাদির যথেচ্ছ সুযোগ পান না। এই শিষ্টতার বা শিল্পের বাঁধনটুকুও অবনীন্দ্রনাথের দুরন্ত যা-খুশি মেজাজের কাছে অসহ্য। তাই তাঁর সন্ধান: কোথায় সেই স্থিতিস্থাপক শিল্পপাত্রটি যার মধ্যে তাঁর বাঁধনছেঁড়া আনন্দ-খেয়ালটিকে পুরো ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে? এই সন্ধানের ফল পাওয়া গেল তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'মারুতির পুঁথি'তে। যাত্রা-পাঁচালির সঙ্গে, কথকতার সমস্ত আত্মবিস্তার মিশিয়ে এটি তৈরি। বর্তমান লেখকের 'কালোর বই' প্রকাশের আগে তার কয়েক অধ্যায়ের নাটকের ছাঁচে ঢালা ছড়াগুলিকে তিনি কাহিনীর বহমানতার মধ্যে মুক্তি দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এটি তাঁর নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল। মারুতির পুঁথিতে তাঁর এই দিকের শিল্প-অভিজ্ঞতাটি পূর্ণফল প্রসব করেছে। 'মাসি'র সেই চাংড়াদাদা এই মারুতির পুঁথির পাঠক। তাঁর রকম-সকম ক্রিয়াকর্ম বোলচাল সবই এতে ধরা হয়েছে। পুঁথির গল্প আছে, সেই গল্পের পাঠকের গল্পটিও আছে। আমরা চাংড়াদাদার চোখে দেখি দেবতাদের বানরবিবাহ আর হনুমানের রাজকাজের পালা আর অবনীন্দ্রনাথের চোখে দেখি চাংড়াদাদা ও চাংড়াদিদির লীলা। এইভাবে মঞ্চ থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে অবনীন্দ্রনাথ শুধু সাবেকি ধাঁচের একটি পাঁচালি পুঁথিই উপহার দেন নি, একটি পুরানো দিনের রুচি ও সামাজিক সম্ভোগের আসরের পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন।

শুধু অতীতকেই পুনরাবিষ্কার নয়, এরই মধ্য দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ কিছু কিছু শিল্পপ্রকরণ আবিষ্কার করেছেন যা নূতন দিনেও সম্ভাবনাময়। সেটি হচ্ছে কাহিনী বা প্লটের সূত্র রচনায় আধুনিক সমস্ত

নিয়মকানুন, বুদ্ধির ব্যায়াম, মনস্তত্ত্বের চতুর প্রয়োগ— এক কথায় সমস্ত মাথাব্যথাকে সম্পূর্ণ পরিহার। সুতো ছিঁড়ে মালার মুক্তোগুলোকে টলটল ঝলমল ক'রে গড়াতে দেওয়া। সুপ্রসর থালা একটা থাকতে পারে, কিন্তু সূত্র নয়। এর ফলে প্রতিটি ঘটনা, situation, ভাবকে দায়িত্বমুক্তভাবে আলাদা আলাদা ক'রে পাওয়া যায়, পূর্ণ অকুণ্ঠ সম্ভোগ করা যায়। ঘরপালানো কিশোর ছেলের দল যেমন যা কিছু সামনে পায় তারই উপর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব খাটিয়ে দেখে, বাইরের জগৎটাকে Kaledoscope-এর মত পরিবর্তিত হতে দিয়ে গাম্ভীর্যে-চাপল্যে হাসি-কান্নায় অম্ল-মধুরে নিজেদের ভিতরটাকে বিচিত্ররসে সিক্ত করে তোলে, দায়িত্ব মানে না, পরম্পরার সংযোগ রক্ষা করে না, যখন যা পায় নেয়, নিজেদের যা দেবার পুরো শোধ করে দেয়, ঠিক তেমন করেই কেন সাহিত্য হাজির হবে না জীবনের দরবারে ? মারুতির পুঁথির বানরগুলো সেই হিসাবে চমৎকার জীবন রসিক। এই হাসি, এই কান্না। এই অনাহারে মৃত্যুপণ, সঙ্গে সঙ্গে মরণের সবরকম লক্ষণের অতি চটুল, অতি বিজ্ঞ বিচার। পূর্বাপর জ্ঞান নেই, ধাপ থেকে ধাপে যাবার আরোহ অবরোহের সূক্ষ্ম পরিমিতি বিচার নেই, ঝম্পকছন্দে এক অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে আর এক অভিজ্ঞতায় ঝাঁপ। যখন সামনে যা তার মধ্যেই পূর্ণ আত্মনিয়োগ, আত্মপ্রকাশ। মনে রাখতে হবে প্রস্তুতবিষয়ে এই সর্বাঙ্গীন আত্মাহুতি শেক্স্পীয়রের একটা মূল্যবান্ বৈশিষ্ট্য। জীবনের এক দৈনন্দিন স্তরে অবনীন্দ্রনাথ সেই ক্ষমতার সাধনা করেছেন।

আর এই বিচিত্র শক্তিসাধনার বাহন হিসাবে পয়ার ছন্দকে ইচ্ছামত দীর্ঘ-হ্রস্ব ক'রে শেষকালে কোনোক্রমে মিলটা জুগিয়ে রীতিমত একধরণের ছন্দের স্বাধীনতা-আন্দোলন চালিয়ে গেছেন অবনীন্দ্রনাথ। জনজীবনের কাব্য, পালাগানের এই পথ। এতে ছন্দটাও একরকম উদার সর্বংসহ রকমে টিকে থাকে এবং মেজাজের, মজার কোথাও হানি হয় না। জানি না এই সাধনের উত্তরসাধক কেউ হবেন কি না।

'মারুতির পুঁথি'কেও আমাদের সাহিত্যের দরবারে একটি বিশেষ আসন দিতে হবে।

অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সর্বশেষ প্রকাশিত আরো তিনখানি বই হচ্ছে রং-বেরং, চাঁইবুড়োর পুঁথি, ও অবনীন্দ্রনাথের কিশোরসঞ্চয়ন। রং-বেরং একে তিন তিনে এক -এর মত একটি পাঁচমিশেলি রচনার সংকলন। ভাঙা যাত্রা গান, 'চর্ভটি'নাটক, টুকরো পাঁচালি, পশুপক্ষীর মহতী জনসভার অর্থাৎ 'জেন্তু সভা'র বিস্তৃত রিপোর্ট, বাবুই পাখির ফিল্ড রিসার্চ অর্থাৎ গবেষণা-ভ্রমণ ও তার বিবৃতি, রোমান্স কল্পনার রঙ চড়িয়ে হঠাৎ বা রাজকাহিনীর মেজাজে এক অজানা বা গৌণ ইতিহাসের ছিন্ন কাহিনী— অবনীন্দ্রনাথের ডালিতে জ'মে ওঠা এমন অনেক কিছু উপাদানসম্ভারের সংকলন। শিল্পোৎকর্ষে একে তিন তিনে এক -এর সমপর্যায়ে একে রাখা যায় না, কিন্তু এর মধ্যেও ছড়িয়ে আছে তাঁর কলাকৌশলের অনেক নূতন নিদর্শন। শিব-সদাগরকে নিয়ে তাঁর চর্ভটি নাটকটি হল রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসবের অবনীন্দ্র-version— শুধু ঐ নাটকে শরৎ আর এই নাটকে বর্ষাই উপলক্ষ্য— এই যা তফাত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে সিকস্তি পয়স্তি কথা। এই গল্পের সামনের আসর জুড়ে আছে 'শকুন বিদ্যার ব্যাখ্যান', খুঁদিরাম ও খাজাঞ্চিমশায় মিলে মোরগ কাক গোরুর ভাষা ও ধ্বনির মর্মোদ্ঘাটন। কিন্তু এরই আড়ালে আবডালে এগিয়ে চলেছে একটি কঠোর বস্তুতান্ত্রিক বিরোধের প্লট— উদ্ভট্টির চরে সংক্রান্তি ঠাকুরকে উৎখাত করে খাজাঞ্চি মশায়ের খোঁটাগাড়ি

ক'রে জবরদখল নেওয়ার বৃত্তান্ত। লঘু হাস্যরস ও গুরুতর চরিত্র ও কার্যকলাপের এই শিল্পায়ত্ত সংমিশ্রণ যে বিশেষ প্রতিভার পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নেই।

চাঁইবুড়োর পুঁথি মারুতির পুঁথিরই সগোত্র। সেই চাঁইবুড়োই বক্তা, আর বিষয় হনুমানের নয়, রাবণের কীর্তিকলাপ। সে তার মামা কালনেমি, মা নিকষা, বোন সূর্পণখা, বোন মহোদরী ও তার স্বামী মহোদর— এরাই সব হল এই পাঁচালির প্রধান চরিত্র। পরিহাসের মেজাজের দমকা হাওয়ায় অবনীন্দ্রনাথ এই কাহিনীতে যথেচ্ছ ঘটনা ও উদ্ভাবনার দ্বার একেবারে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। রাগের সময়ে প্রথমে হিন্দি এবং তার পর 'রাবণকে তখন ইন্‌জিরীতে পাওয়ার যোগাড় হচ্ছে দেখে সকলের পলায়ন'; মধু দৈত্য রাবণ ভগ্নী কুম্ভীনসীকে হরণ ক'রে তার পর ধরা পড়ে নিজেকে একটা ছারপোকা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছে— 'মধু আকর্ণ বিস্তৃত ঠোঁট মেলে ছার খিলাও, ছার খিলাও ব'লে রাবণের দিকে এগোতে লাগল, রাবণও দুত্তোর ব'লে দুদ্দাড় প্রস্থান।' এখন এইসব চটুলতা যতই আপত্তিজনক মনে হোক, একবার একটু প্রশ্রয় দিলে আর এর মারাত্মক সংক্রামকতা থেকে রক্ষার উপায় নেই। তখন ধূর্ত মহোদরের সমস্ত ভাঁওতা, সূর্পণখার পতিভোজন, লঙ্কার মেয়েদের 'উলুঙ্গু' হয়ে হনুমানের ল্যাজে বাঁধবার কাপড় দেওয়া— এ সমস্তই নির্বিবাদে সুবোধ ছেলের মত গলাধঃকরণ করা ছাড়া উপায় নেই। মারুতির পুঁথির চেয়ে এই বইয়ের শিল্পমর্যাদা অবশ্যই কম, কিন্তু এর উচক্কা উনপঞ্চাশ পবনের আবহাওয়া যাকে সুড়সুড়ি দেবে সেই -এর যথার্থ আনন্দটি ভোগ করতে পারবে।

অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়নের প্রধান আকর্ষণ এর মধ্যে তাঁর বিখ্যাত শিশু-উপন্যাস 'খাতাঞ্চির খাতা'র পুনর্মুদ্রণ। তা' ছাড়া এর মধ্যে আছে তাঁর নানাধরণের লেখার বিচিত্র নমুনা। স্মৃতিকথা, চট্-জল্‌দি কবিতা, 'রাজকাহিনী'র গল্প, যাত্রাপালা, খেয়াল খুসীর গল্প— কিছুই বাদ যায় নি। কিশোরদের প্রতি তাঁর স্নেহোপহারের এই সংগ্রহ কিশোর ও বয়স্ক পাঠক সকলেরই ভালো লাগবে।

ছয়খানি বইই শক্ত বাঁধাই, সুনির্মিত ও সুচিত্রিত। সমস্ত লাইব্রেরি ও বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে বইগুলি থাকবে আশা করি।

সুনীলচন্দ্র সরকার

স্মৃতিচিত্র। শ্রীমতী প্রতিমা দেবী। সিগ্‌নেট প্রেস, কলিকাতা ২০। মূল্য সওয়া দুই টাকা।

বাবার কথা। শ্রীমতী উমা দেবী। মিত্রালয়, কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।

অবনীন্দ্র-চরিতম্‌। শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা. লি., কলিকাতা-৭। মূল্য পাঁচ টাকা।

'যে যুগের কথা শুরু করলুম সেদিন বাঙলার নবযুগ, বর্তমান সাহিত্য শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল সেই দিন। যুগান্তরের সন্ধিক্ষণে তখন বহুকালের সনাতন প্রথাগুলি নাড়া খেয়ে উঠেছিল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন এখনকার মতো গভীরভাবে ঘটেনি, দেউল ছিল খাড়া প্রাচীন বটের মতো, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধরেছিল ঘুণ।…

'...সামনের বৃহৎ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনটা উতলা হয়— ঐ অন্ধকার নির্জন বাড়িটা একদিন প্রাণের আলোড়নে পূর্ণ ছিল, আজও সেই পুরনো কালের দু-একজন স্মৃতির অবশিষ্ট খুঁটি আগলে বসে আছেন। চক-মেলানো ঠাকুর-দালানটির দিকে চেয়ে মনটা তখন ভরে উঠেছে, হঠাৎ অন্ধকার আকাশ চিরে পেঁচার ডাকে বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। চিলছাদের এক কোণে একটা আকাশপ্রদীপ মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। আমার চোখের সামনে ঐ ভাঙা বাড়ির আত্মা তার কবর থেকে বেরিয়ে এল, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনের তান শুনতে পাচ্ছি, আবার জ্বলল আলো, চোখের সামনে যেন পরীস্থানের ইমারত।'

পরিচ্ছন্ন একটি ভাষার পটভূমে এইভাবে প্রতিমাদেবী তাঁর স্মৃতিচিত্রের প্রথম রেখাপাত করেছেন। ক্রমে তা বিবিধ রূপের লিখনে, বহু কুশীলবের চলচ্চিত্রপ্রতিম প্রবেশে ও প্রস্থানে, বিচিত্র বর্ণের রঞ্জনে, একটি বিশেষ দেশকালের আবহ-সৃজনে এবং সর্বব্যাপী একটি ভাবলাবণ্যে ও রসের ব্যঞ্জনায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পদবীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'স্মৃতিচিত্র' নামটি বিশেষভাবেই সার্থক। ভাষা ভাব, দুঃখ সুখের স্মৃতি, বিস্ময় প্রীতি ও অনির্বচনীয় বিষাদ বা ঔদাস্য— স্থূল সূক্ষ্ম বিবিধ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে অপরূপ 'ধ্বনি' জেগে উঠেছে সে তো সত্যই, তা ছাড়া ফুটে উঠেছে যেন কাংড়া কলমের একখানি ছবি। অতীতের সাচীকৃত সেই আননে অবয়বে কী সৌন্দর্য, কী সৌকুমার্য, কী শালীনতা, ভাষা-হাব-মানে এমন কী যেন ভাষা— কটাক্ষ-ইঙ্গিতে বলে না কি? 'আমি বর্তমান নই, সোজাসুজি চোখ তুলে চাইতে পারি নে তোমার চোখে, অথচ একেবারে মুখ ফেরাই নি বিস্মৃতি ও বিলুপ্তি পানে— আছি তোমার অন্তর্দৃষ্টিপথে শাশ্বত অন্তরলোকে।' রামধনু-রঙে বিশ্লিষ্ট হয়ে আলো যেখানে ঠিকরে পড়ে দিকে দিকে, দিবস রাত্রির সন্ধিক্ষণে, সুন্দর কোমল আভায়, তেমনি কাংড়া কলমের ছবি কি? হয়তো তুলনাটি নিখুঁত হল না। মাতুল অবনীন্দ্রনাথের রঙ-লেপা (লিপ্ত) আর রঙ-ধোওয়া (ওয়াশ) অভিনব চিত্রশৈলীর সঙ্গেই এ রচনার সাদৃশ্য সমধিক। অর্থাৎ, পরিস্ফুট রূপের ও ঘটনার বিলিখন এবং কোমল করুণ মনোরম বর্ণের দ্যুতি শুধু নয়; তারও পরে সমস্ত চিত্রক্ষেত্রটি (মানুষের চিত্তক্ষেত্রই বাহিরে মেলে ধরা— তা বৈ অন্য কিছু নয়) ব্যাপ্ত ক'রে আছে বহু বিমিশ্র রঙের অনির্দিষ্ট মায়াছায়ার একটি আবরণ— সে যেন জীবনের শীতসন্ধ্যায় দীর্ঘশ্বাসের একটি কুয়াশা বিছানো, সে যেন সেই কুয়াশা ভেদ ক'রে বারে বারে অস্তাচলের শিখর থেকে অরুণাচল পর্যন্ত বিসর্পিত করুণ অরুণ আভা— মনে পড়ে ৫ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর-ভবনের অধুনাবিলুপ্ত দক্ষিণের বারান্দায় সৃষ্ট ওমার-খৈয়াম কাব্য অথবা আরব্য উপাখ্যানের অতুল ছবি। ঐ পাঁচ নম্বর আর ছ নম্বর বাড়ির সাত-মহলা সুপরিসর রঙ্গমঞ্চে যে জীবননাট্যের সত্য অভিনয় হয়েছিল একদিন, প্রধানতঃ তারই ঝলক দিয়ে গেছে এই রচনায়, অদৃশ্যই দৃশ্য হয়েছে আর্টের মায়ামন্ত্রে।

ফলতঃ, রসোত্তীর্ণ হয়েছে, work of art হয়ে উঠেছে, মনস্বিনী লেখিকার ক্ষীণতনু এই স্মৃতিচিত্র। বিশেষ একটি পরিবারের কথা, ঘরের কথা, নিশ্চিহ্ন কতকগুলি উষাসন্ধ্যা দিবানিশার ঘটনা, আপন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও পেয়েছে সব দেশের আর সব কালের ধ্রুবপদবী, হয়েছে আজকের আর আগামীকালের সব জনের অন্তরঙ্গ অনুভব ও অভিজ্ঞতার বিষয়। শব্দ কিছুই নয়, মানুষের রসনায় রসনায় তার সচকিত জন্ম মৃত্যু, নাহয় বৃহদায়তন কোষগ্রন্থের যাদুঘরে তার জড় ও অনড় স্থিতি। অথচ সেই শব্দই ছন্দঃস্পন্দিত ও রসধ্বনিত হয়ে প্রায় অক্ষয় অমর জীবন অধিকার করে। নিজের অন্তর্জীবনটি নিঙড়ে নিঙড়ে আর্টের আধারে এই অমর্ত জীবনের যিনি স্রষ্টা, আপন সৃষ্টিতে তিনি মিলে মিশে থাকেন, একীভূত হয়ে থাকেন

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শাশ্বতকালের জন্য— আর্টিস্টের সেই হল বিশেষ সার্থকতা। 'স্মৃতিচিত্র' লিখে শ্রদ্ধেয়া প্রতিমাদেবী নিজেকে ফুরিয়ে-ফেলা হারিয়ে-ফেলা সেই সার্থকতা লাভ করেছেন ব'লেই পাঠক হিসাবে আমরা খুশী হয়েছি আর বাঙলা সাহিত্যও নূতন সম্পদ লাভ করেছে। ভাব-ভাষার উপর অতুল অধিকারে, আলেখ্যলিখনের নিখুঁত নৈপুণ্যে, উনিশ-বিশ অবশ্যই আছে, তবু অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা' বইটির জুড়ি এটিকে বলা চলে; বহুস্থলে অবনীন্দ্রনাথের মুখের কথাই সংকলিত হয়েছে স্মৃতি থেকে। এ বইয়ে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট আলোকচিত্র ছাপা হয়েছে; মুদ্রণ-পারিপাট্য আর দৃষ্টিতর্পণ বেশভূষা সেও বিশেষ প্রশংসারই যোগ্য।

'বাবার কথা লিখতে বসেছি, বাবার জীবনী নয়। নিতান্ত ঘরোয়া কাহিনী। এতে হয়তো থাকবে না ধারাবাহিকতা, থাকবে না সম্পূর্ণতা। তা না থাকলেও তাঁর অন্তরের অন্দর মহলের স্নিগ্ধ ছবিগুলোরই কয়েকটা টুক্‌রো এতে পাওয়া যাবে। যাঁরা তাঁর জীবনচরিত রচনা করবার চেষ্টা করবেন তাঁদের কাজে লাগলেও লাগতে পারে। তবে কারও অনুরোধে বা কারও দরকারে··· আমি কিছু লিখছি না। বাবার কথা লিখতে ভালো লাগছে, ভাবতে ভালো লাগছে— তাই মনে ক'রে লেখবার চেষ্টা করছি।' এই উদ্ধৃতি থেকেই অবনীন্দ্রনাথের কন্যা শ্রদ্ধেয়া উমাদেবীর লেখা 'বাবার কথা' বইখানির বিষয়বস্তু বা প্রকৃতি চমৎকার বোঝা যায়। লেখিকা জানাতে ভোলেন নি, যেমন 'এতে ইতিহাস নেই' তেমনি 'মিথ্যের অবকাশ একবিন্দুও নেই।'

পাইকা অক্ষরে ছাপা এই পুস্তিকাখানি একপঞ্চাশত্তম পৃষ্ঠাতেই সমাপ্ত, এই অল্প পরিসরে লোকোত্তর চিত্ররূপ-স্রষ্টার অলৌকিক প্রতিভার পূর্ণপরিচয়-দান সম্ভবপর নয় আর লেখিকার লক্ষ্যও ছিল না কিন্তু মাতৃগতপ্রাণ পুত্র-রূপে, স্নেহশীল পিতা-রূপে অবনীন্দ্রনাথের যে বৈশিষ্ট্য— চিরশিশু স্বভাবের যে বিষাদ সুখ কৌতুকপ্রিয়তা ও স্বত-উৎসারিত আনন্দ উৎসাহ এবং বিমল প্রীতি— তার অনেকটাই অনুভূত বা অনুমিত হয় নানা ঘটনাধারার অনায়াস অনাড়ম্বর বিবরণ-যোগে। অবনীন্দ্রনাথের কোণারক-ভ্রমণ, সিঞ্চলে সূর্যোদয়-দর্শন, আর্ট্ ইস্কুলে চাকরি নেওয়া আর চাকরি ছাড়া, 'বাগেশ্বরী'-ব্যাখ্যান, পাখি পোষা, কুটুমকাটুম বানানো— সেইসঙ্গে শিল্পীর জননী জায়া ও কন্যার অপরূপ পার্শ্বচিত্র— অবনীন্দ্র-চরিত্রের অনাবিল প্রকৃতি-প্রীতি, মানব-প্রীতি, বিশুদ্ধ অনুরাগ, অনাসক্তি ও সত্য-সুন্দরের সন্ধান, এ-সবই ছোটো ছোটো আখ্যানের ভিতর দিয়ে বিনা ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে আমাদের জ্ঞানগোচর হয়ে আনন্দ দান করে। বহু প্রসঙ্গ 'জোড়াসাঁকোর ধারে' অথবা 'ঘরোয়া'য় পাওয়া গেলেও, পূর্বে আমাদের জানা ছিল না আর শোনা হয় নি এমন প্রসঙ্গও অল্প নয়। আর প্রত্যেক প্রসঙ্গই নানা চিত্তবৃত্তির আলোকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বথা নূতন রূপ না পেলেও, নূতন অপরূপতা পায় ও নূতন রঙে রঙিয়ে উঠে আদরণীয় হয় এ কথাও মিথ্যা নয়। তিনখানি আলোকচিত্রে আর অবনীন্দ্রনাথের আঁকা একখানি চিত্রে ('শেখ'— আসলে এটি শিল্পীর কল্পরূপ নয় কি?) গ্রন্থখানির মূল্য এবং মান বর্ধিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এরূপ স্মৃতিকথা আরও লেখা হয়, বিস্তারিতভাবে লেখা হয়, তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। না হলে নবযুগে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির নবজাগরণের ইতিহাস নিখুঁতভাবে লেখা যাবে না।

পূর্বোক্ত দুখানি গ্রন্থের তুলনায় 'অবনীন্দ্র-চরিতম্' বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে সত্য এবং নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে নূতন 'রঙিলা' ('রঙ্গিলা') আলোর উদ্ভাসে উদ্ভাসিত হওয়াতে অবনীন্দ্ররূপ-লিখন অপরূপ

লিখন হয়ে ওঠে নি তাই বা বলা যায় কেমন ক'রে? অথচ লেখাটি বড়ো বেশি ব্যক্তিগত। বিষয়বস্তুর অপ্রতুলতা নেই— সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসুবিধা এই যে, বক্তব্যকে বহুগুণে অতিক্রম ক'রে গেছে বলার ভঙ্গী। অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ চিত্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা আছে এই রচনায়; ভাবে-ভোলা গুণীর বিচিত্র আচার-আচরণের সঙ্গে নিপুণভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর মুখের কথা বা মুদ্রিত ভাষণ। ঠাকুরমশায়ের এই উদ্যমের বিশেষ এক-প্রকার মূল্য বা মর্যাদা আছে। তাঁর ভাব ও ভাষার ব্যুৎপত্তি-জ্ঞান অল্প নয়। তিনি একাধারে রসিক ও পণ্ডিত। তাঁর বলবার কথা আছে অনেক, এই গ্রন্থের দুখানি মলাটের মধ্যেই সব যে ধরেছে এমনও নয়, আমাদের বিশেষ আক্ষেপের কারণ এই যে, এ রচনাকে তিনি অসংগত আগ্রহে 'রম্যরচনা'র পর্যায়ে 'উন্নীত' করতে চেয়েছেন। উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়েছে উদ্দেশ্যসাধনের উপায়। লেখকের কাছে আমাদের এ নিবেদন সবিনয়ে এবং সসম্ভ্রমে। যা তিনি দিয়েছেন তার অনেক বেশি আমরা তাঁর কাছে প্রত্যাশা করি। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির নয়খানি একবর্ণ ও একখানি বহুবর্ণ প্রতিচিত্রে এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ হয়েছে। দুঃখের বিষয়, সচরাচর একবর্ণ প্রতিচিত্র থেকে অবনীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট রূপের মাধুরী ও রঙের জাদু, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারিগরি, কিছু বোঝা যায় না— রঙিন প্রতিচিত্রও যে একেবারে আশানুরূপ হয় তা অবশ্য নয়— এ স্থলে অনেকগুলি একবর্ণ প্রতিচিত্রের বদলে অল্প কয়েকখানি রঙিন প্রতিচিত্র দেওয়াই কি ভালো ছিল? এটি বিবেচনার বিষয়। অপরূপ প্রচ্ছদশোভা হয়েছে শিল্পীগণের অগ্রণী নন্দলালের আঁকা তূলিধর অবনীন্দ্ররূপে। অবনীন্দ্র- চরিতে ও চিত্রে আকৃষ্ট যাঁরা, ঠাকুরমশায়ের এ গ্রন্থ তাঁদের পড়তেই হবে। বিশেষপ্রকার বাগ্‌ভঙ্গীটিকে বিশেষ বাধা ব'লে মনে না করলে অবশ্যই তাঁরা লাভবান হবেন।[১]

সুদর্শন চক্রবর্তী

১ গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'দাসখৎ' ছবিটি কোনো প্রদর্শনীতে দেখানো হয় নি। অথচ আমাদের যতদূর মনে পড়ে, কলিকাতায় যাদুঘরের দ্বিতলে রবীন্দ্রভারতীর উদ্যোগে যে অবনীন্দ্র-চিত্রপ্রদর্শনী হয় তাতে এ ছবিটি দেখানো হয়েছিল। যথাকালে পাওয়া যায় নি ব'লে চিত্রতালিকায় উল্লেখ ছিল না— এমন হতেও পারে।

অবনীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা গ্রন্থের সূচী

পুলিনবিহারী সেন ও পার্থ বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (মাঘ-চৈত্র ১৩৫১) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবনীন্দ্রনাথ-রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; উহাতে 'জোড়াসাঁকোর ধারে' পর্যন্ত যাবতীয় গ্রন্থ সূচীভুক্ত হয়। তাহার পর অবনীন্দ্রনাথের আরও অনেক রচনা সাময়িক পত্রাদি হইতে সংকলিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান সূচীতে এযাবৎ-মুদ্রিত সকল গ্রন্থের বিবরণ, পূর্বাপেক্ষা কিছু বিস্তারিত আকারে, নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থ, যতদূর জানা যায়, 'শকুন্তলা'। 'আমার বই লিখতে শেখা' বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, বহু-উদ্ধৃত হইলেও তাহা এই প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখযোগ্য :

'একদিন আমায় উনি [রবীন্দ্রনাথ] বললেন, "তুমি লেখ না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখ।" আমি ভাবলুম, বাপরে, লেখা— সে আমার দ্বারা কস্মিন্ কালেও হবে না। তা আবার আমি লিখব কি করে ? উনি বললেন, "তুমি লেখই-না ; ভাষার কিছু দোষ হয়— আমিই তো আছি।" সেই কথাতেই মনে বড় জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলাম এক ঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন ; শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল' ওই একটি মাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক্' বলে রেখে দিলেন।· ·সেই প্রথম জানলুম আমার বাংলা বই লিখবার ক্ষমতা আছে।· ·মনে বড় স্ফূর্তি হল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম ক্ষীরের পুতুল ইত্যাদি। সেই যে উনি সেদিন বলেছিলেন "ভয় কি, আমি তো আছি"— সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল।'[১]

এই প্রসঙ্গে 'বাল্যগ্রন্থাবলী'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। "শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া গণ্য" না করিয়া তাহাদের জন্য সাহিত্য রচনায় ও প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ আযৌবন উৎসাহী ছিলেন— 'বালক' (১২৯২) পত্রিকা প্রকাশের পর এ বিষয়ে ঠাকুর-পরিবারে অপর উদ্‌যোগ বাল্যগ্রন্থাবলী প্রকাশ। যতদূর জানা যায় এই গ্রন্থমালায় তিনখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল— প্রথম গ্রন্থ অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' (শ্রাবণ ১৩০২), দ্বিতীয় গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 'নদী' (মাঘ ১৩০২), তৃতীয় গ্রন্থও অবনীন্দ্রনাথের রচিত, 'ক্ষীরের পুতুল' (ফাল্গুন ১৩০২) ; তিনটি রচনাই বাংলা সাহিত্যে চিরায়ু হইয়া আছে।

১

বাল্যগ্রন্থাবলী ১।/শকুন্তলা।/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/মূল্য ছয় আনা।

অপর পৃষ্ঠায়

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক/চিত্রাঙ্কিত।/৩৩নং জেলেটোলাস্থ/"ইণ্ডিয়ান আর্ট কটেজে"/শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ধর

---

১ "আমার ছবি ও বই লিখতে শেখা···", প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৮। পরে 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র অন্তর্গত।

কর্তৃক প্রস্তর-ফলকে মুদ্রিত।/কলিকাতা।/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/শ্রাবণ ১৩০২।[১]

পৃ [৵০], ২৯

২

বাল্যগ্রন্থাবলী ৩।/ক্ষীরের পুতুল।/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/মূল্য ছয় আনা।

আখ্যাপত্রের পিছনে

কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও/প্রকাশিত।/ফাল্গুন ১৩০২।/৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।[২]

পৃ [৵০], ৪৫

ছয়খানি রঙিন চিত্র সম্বলিত, দুইখানি পূর্ণপৃষ্ঠ।

৩

রাজকাহিনী/(মেবার)/প্রথম খণ্ড /শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য ৸০ আনা।

পৃ [।০], ৮১। প্রকাশ [২৮ জুন ১৯০৯][৩]। প্রকাশক হিতবাদী লাইব্রেরী, কলিকাতা।

মলাটের নামচিত্র অবনীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিখিত, ফার্সী অক্ষরের ছাঁদে। শ্রীনন্দলাল বসু প্রভৃতি শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র আছে।

সূচী॥ শিলাদিত্য; গোহ; বাপ্পাদিত্য; পদ্মিনী।

৪

ভারত শিল্প/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য আট আনা

পৃ [।০], ৮৮, ।০। প্রকাশ [সেপ্টেম্বর ১৯০৯]। প্রকাশক হিতবাদী লাইব্রেরী, কলিকাতা।

সূচী॥ স্পষ্ট কথা; কি ও কেন?; পরিচয়; মানস চর্চ্চা; শিল্পে ত্রিমূর্ত্তি; শিল্পের ত্রিধারা; আর্ট ও আর্টিষ্ট।

৫

ভূতপত্রীর দেশ/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য বারো আনা

পৃ [৵০], ৫৫। প্রকাশ [১৯১৫]। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা।

শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র।

৬

নালক/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য আট আনা

পৃ [।০], ৮৮, [৵০]। প্রকাশ [১৯১৬]। প্রকাশ ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা।

৭

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ষট্‌ত্রিংশ গ্রন্থ/পথে-বিপথে/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/চৈত্র ১৩২৫

পৃ [।০], ১৪৪, [৪]। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

---

১ এই পুস্তকের এক কপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে। দুঃখের বিষয় এই কপিতে ছবিগুলি নাই।

২ ক্ষীরের পুতুল প্রথম সংস্করণ শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিতে দিয়াছেন।

৩ বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজি তারিখ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত তালিকা হইতে গৃহীত। তিনি ঐ-সকল তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ হইতে লইয়াছিলেন।

সূচী ॥ নদী-নীরে— মোহিনী ; অস্থি ; গুরুজী ; টুপি ; দোশালা ; মাতু ; শেমুষী ; ইন্দু ; অরোরা ; পর্-ঈ-তাউস্ ; ছাই-ভস্ম ; লুকি-বিদ্যে। সিন্ধু-তীরে— গমনাগমন। গিরি-শিখরে— নিষ্ক্রমণ ; আরোহণ ; বিচরণ ; [অবরোহণ]।

৮

বাংলার ব্রত/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য আড়াই টাকা

পৃ [৵০], ২, ৬২, ৵০। ১২০ পৃষ্ঠা একবর্ণ আলপনা চিত্র ও ২ পৃষ্ঠা বহুবর্ণ আলপনা চিত্র

প্রকাশ [১৯১৯]। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা।

'নিবেদনে' অবনীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন : 'আজ দুই তিন বছর ধরে 'বিচিত্রা সভা'র জন্য আমার ছাত্র ও বন্ধুদের সাহায্যে যতগুলি ব্রতের আলপনার নক্সা সংগ্রহ করেছি, প্রায় সকল গুলিই এই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল। কি মণ্ডনচিত্র হিসাবে, কি স্বকীয়তা পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনার দিক দিয়ে বাংলার মেয়েদের হাতের এই লেখা শিল্পীমাত্রেরই যে আদর পাবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নক্সাগুলি আমি যথাসম্ভব অবিকৃত ভাবে নকল করে প্রকাশ কল্লেম··।'

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (১ শ্রাবণ ১৩৫০) মুদ্রিত হইয়াছে।

৯

খাতাঞ্চির খাতা/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/এক টাকা

পৃ [৵০], ৭০। প্রকাশ [১৯২১]। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস্, কলিকাতা।

প্রচ্ছদপট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত, কাগজ ও মাটির পুতুল অনুসরণে। সুকুমার রায় অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র আছে।

বইখানি সম্প্রতি 'অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন' গ্রন্থভুক্ত।

১০

প্রিয়দর্শিকা/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/দাম চার আনা

পৃ ১৪। প্রকাশ [১৯২১]। প্রকাশক ও মুদ্রক কান্তিক প্রেস, কলিকাতা।

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর বার্ষিক প্রদর্শনীর চিত্রাবলীর পরিচয় ও ব্যাখ্যা।

১১

চিত্রাক্ষর/অবনীন্দ্র

চিত্রে বর্ণমালা ও ১-৯ সংখ্যার বর্ণন। বইখানি লিথোতে ছাপা, আখ্যাপত্র সহ মোট ২৫ পৃষ্ঠা, একপৃষ্ঠে মুদ্রিত। মোট আড়াই শত কপি বিশেষ সংস্করণ ছাপা হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি আছে। প্রকাশ-তারিখ মুদ্রিত নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তারিখ দিয়াছেন ১৩৩৬।

এই প্রসঙ্গে শ্রীউমা দেবীর 'বাবার কথা' হইতে নিম্নমুদ্রিত সংবাদ উল্লেখযোগ্য :

'আমার স্বামীর বুক বাইণ্ডিং কারখানা যখন খুললেন, বাবা প্রায়ই দেখতে আসতেন। পেষ্টবোর্ডের চৌকো ছাঁটগুলো কারখানায় পড়ে থাকতে দেখে বাবা তাঁকে বললেন, "এগুলো ফেলো না। আগে যেমন অ-আ লেখা তাস হতো, আমি ছড়া লিখে দেবো—তোমরা ছড়া অনুযায়ী উল্টো পিঠে ছাপ আঁকিয়ে

তাস কর, খুব চাহিদা হবে।" তার কথামতো ছাঁটগুলো জমা ক'রে রেখে-রেখে শেষে সেগুলি তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তিনি তাতে প্রত্যেক স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের একটি একটি ছড়া লিখে দিলেন।'

এগুলি লেখিকার নিকট রক্ষিত আছে।

১২

রাজকাহিনী/দ্বিতীয় খণ্ড/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রথম সংস্করণ/গ্রন্থবিহার/৫৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট/কলিকাতা

পৃ [৷৵০], ১৫০, ৵০। প্রকাশ [১৯৩১]

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রালংকৃত।

সূচী॥ হাম্বির; হাম্বির (রাজ্যলাভ); চণ্ড; রাণা কুম্ভ; সংগ্রাম সিংহ।

পরবর্তীকালে দুই খণ্ড রাজকাহিনী সিগনেট প্রেস কর্তৃক একত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম বিদ্যালয়-সংস্করণে (মাঘ ১৩৬৩) রাণা কুম্ভ ও সংগ্রাম সিংহ গল্প দুইটি বর্জিত।

১৩

বুড়ো-আংলা/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ/১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

পৃ [।০], ১৮৮। 'প্রকাশকের নিবেদনে'র তারিখ শ্রাবণ ১৩৪৮

'প্রকাশকের নিবেদনে' লিখিত হইয়াছে: 'সুইডিশ লেখিকা Selma Lagerlofএর Adventures of Nils নামক বইখানি পড়ে অবনীন্দ্রনাথ 'বুড়ো-আংলা' লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু বুড়ো-আংলা, তর্জমা নয়—সম্পূর্ণ বাংলা দেশের বই।'

প্রচ্ছদপট অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত, আদ্রেঁ কার্পেলেস প্রেরিত সুইডেনের খড়ের পুতুল অবলম্বনে। অন্যান্য চিত্র শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত।

১৪

ঘরোয়া/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/শ্রীরানী চন্দ/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

পৃ [৮], ৶০, ১৭১। প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৮

এই গ্রন্থের সূচনায় মুদ্রিত অবনীন্দ্রনাথের একখানি চিঠিতে আছে:

কল্যাণীয়া রাণী—

আমি বলেছি, তুমি লিখেছো।

আমার ঝুলিতে এতো কথা জমা আছে যা এক তুমি ছাড়া কেউ লিখে উঠতে পারতো না। আমার ভাগ্যক্রমে তোমার হাতে আমার খাপছাড়া ঘরাও কথা ভাল করে গেঁথে তোলার ভার রবিকাকা দিয়েছেন, না হলে ঘরাও কথা ঘরচাপা পড়েই থাকতো, ছাপা হয়ে বেরোতো না।

এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন[১]:

অবন,

কী চমৎকার—তোমার বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে উঠলো। বোধ হয় আজকের দিনে আর দ্বিতীয় কোনো লোক নেই যার স্মৃতি-চিত্রশালায় সেদিনকার যুগ এমন প্রতিভার

১ "অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' ", প্রবাসী কার্তিক ১৩৪৮

আলোকে প্রাণে প্রদীপ্ত হয়ে দেখা দিতে পারে—এ তো ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নয়, এ যে সৃষ্টি—সাহিত্যে এ পরম দুর্লভ। প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে—এমন সুযোগ দৈবাৎ ঘটে। ২৭ জুন, ১৯৪১।

রবিকাকা

অবন,

এক দিন ছিল যখন জীবনের সকল বিভাগে প্রাণে পরিপূর্ণ ছিল তোমাদের রবিকাকা। তোমরাই তাকে অন্তরঙ্গভাবে এবং বিচিত্র রূপে নানা অবস্থায় দেখতে পেয়েছ। তোমাদের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আজ তাকে যদি না জাগিয়ে তুলতে, তবে তার অনেকখানি দেশের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যেত। আজকে যখন দিনান্তের শেষ আলোতে মুখ ফিরিয়ে দেশ তার ছবি একবার দেখে নিতে চায়— তখন তোমার লেখনী তাকে পথ নির্দেশ করে দিলে— এ আমার সৌভাগ্য। যে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছি— সে দেশে পূর্ণ আসন থাকবে না— এই আশঙ্কা আমি অনুশোচনার বিষয় বলে মনে করি নি। অনেক বারই ভেবেছি আমি আজন্ম নির্বাসিত— এ আমি বারবার মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছি। আজ তুমি যে ছবি খাড়া করেছ সে অত্যন্ত সত্য, অত্যন্ত সজীব। দীর্ঘকালের অবমাননা সে দূর করে দিয়েছে— সেই নিরন্তর লাঞ্ছনা ও গ্লানির মধ্যে আজ যেন তুমি তার চার দিকে তোমার প্রতিভার মন্ত্রবলে এক দ্বীপ খাড়া করে দিয়েছ। তার মধ্যে শেষ আশ্রয় পেলুম। ২৯ জুন, ১৯৪১।

তোমাদের রবিকাকা

১৫

বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী/[১৯২১—১৯২৯]/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি. লিট/কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত/১৯৪১

পৃ. [৷৵০], ৩৯৫

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাণী বাগেশ্বরী' অধ্যাপকরূপে বক্তৃতাবলী।

সূচী ॥ শিল্পে অনধিকার ; শিল্পে অধিকার ; দৃষ্টি ও সৃষ্টি ; শিল্প ও ভাষা ; শিল্পের সচলতা ও অচলতা ; সৌন্দর্যের সন্ধান ; শিল্প ও দেহতত্ত্ব ; অন্তর বাহির ; মত ও মন্ত্র ; সন্ধ্যার উৎসব ; শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড ; শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড ; শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভালমন্দ ; শিল্পবৃত্তি ; সুন্দর ; অসুন্দর ; জাতি ও শিল্প ; অরূপ না রূপ ; রূপবিদ্যা ; রূপ দেখা ; স্মৃতি ও শক্তি ; আর্য ও অনার্য শিল্প ; আর্যশিল্পের ক্রম ; রূপ ; খেলার পুতুল ; রূপের মান ও পরিমাণ ; ভাব ; লাবণ্য ; সাদৃশ্য।

১৬

জোড়াসাঁকোর ধারে/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/শ্রীরানী চন্দ/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট/কলিকাতা

পৃ [৷০],১৫১। প্রকাশ কার্তিক ১৩৫১

সূচনায় অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

'যত সুখের স্মৃতি তত দুঃখের স্মৃতি— আমার মনের এই দুই তারে ঘা দিয়ে দিয়ে এই সব কথা আমার শ্রুতিধরী শ্রীমতি রানী চন্দ এই লেখায় ধরে নিয়েছেন।…'

১৭

আপন কথা/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/সিগনেট প্রেস : কলিকাতা

পৃ [।৵০], ১২৯। প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫৩

সূচী॥ মনের কথা ; পদ্মদাসী ; সাইক্লোন ; উত্তরের ঘর ; এ-আমল সে-আমল ; এ-বাড়ি ও-বাড়ি ; [বারবাড়িতে] ; অসমাপিকা ; বসতবাড়ি।

ভূমিকায় (মনের কথা) অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

'আমার ভাব ছোটোদের সঙ্গে— তাদেরই দিলেম এই লেখা খাতা।···যারা কেবল শুনতে চায় আপন কথা, থেকে থেকে যারা কাছে এসে বলে 'গল্প বলো', সেই শিশু-জগতের সত্যিকার রাজা-রানী বাদশা-বেগম তাদেরই জন্যে আমার এই লেখা পাতা ক'খানা।'

এই শৈশবস্মৃতি, অবনীন্দ্রনাথের অপর দুখানি স্মৃতিকথা 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র বহু পূর্বে লিখিত।

১৮

সহজ চিত্রশিক্ষা/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিশ্বভারতী

পৃ [।০], ৩৩, [২]। প্রকাশ পৌষ ১৩৫৩

'সহজ চিত্রশিক্ষা'র চিত্রাবলী আচার্য অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা-অনুসারে শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত।

১৯

আলোর ফুলকি/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

পৃ [৵০], ৯৪। প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৪

প্রচ্ছদ ও মুখপাতের চিত্র শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত ; অনুচ্ছদ শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত।

দ্বিতীয় সংস্করণের (বৈশাখ ১৩৬৩) বিজ্ঞপ্তিতে লিখিত আছে :

'ফরাসী লেখক Edmond Rostand'এর রচিত গল্পের ভাবানুবাদ করেন Florence Yates Hann : The Story of Chanticleer. উহারই ভাবগ্রহণ করিয়া এই কাহিনীর রচনা ও ভারতী পত্রে প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩২৬— অগ্রহায়ণ ১৩২৬'

২০

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট/কলিকাতা

পৃ [।৵০], ৫৭। প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৪

প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে লিখিত হইয়াছে :

'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধাবলী ১৩২১ সালে ভারতীপত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলি ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু মূল বাংলা প্রবন্ধগুলি এ যাবৎ ভারতীর পৃষ্ঠাতেই নিবদ্ধ ছিল। চীন ও ভারত -শিল্পের ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা অবনীন্দ্রনাথই প্রথম করেন, এবং এই ক্ষেত্রে এই আলোচনাই এখনো অদ্বিতীয় হইয়া আছে।'

সূচী॥ পরিচয় ; চিত্রে ছন্দ ও রস ; ভারত-ষড়ঙ্গ ; রূপভেদ ; প্রমাণ ; ভাব ; লাবণ্যযোজনা ; সাদৃশ্য ; বর্ণিকাভঙ্গ ; ষড়ঙ্গদর্শন।

২১

ভারতশিল্পে মূর্তি/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট/কলিকাতা

পৃ [।০], ৩১, [২], চার পৃষ্ঠা চিত্র। প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪

প্রকাশকের 'বিজ্ঞপ্তি'তে লিখিত হইয়াছে: 'এই প্রবন্ধ প্রথমে 'মূর্তি' নামে ১৩২০ পৌষ ও মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।· ·এই প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।'

২২

মাসি/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

পৃ [।৶০], পৃ ৭৪। প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬১

সূচী॥ মাসি ; বনলতা ; হাতে খড়ি।

২৩

একে তিন তিনে এক/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড/১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট; কলিকাতা ১২

পৃ [।৶০], ১২৯। প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৬১

সূচী॥ একে তিন তিনে এক ; কনকলতা ; বড় রাজা ছোট রাজার গল্প ; কাঁচায় পাকায় ; দেয়ালা ; মহামাস তৈল ; ভোম্বলদাসের কৈলাস যাত্রা ; রতা-শেয়ালের কথা ; সিংহরাজের রাজ্যাভিষেক ; ধরা পড়া ; সাথী ; খোকাখুকি ; বাতাপি রাক্ষস : রাসধারী ; আষাঢ়ে গল্প ; গঙ্গাফড়িং ; হিন্দবাদের প্রথম সিন্দবাদের শেষ যাত্রা।

২৪

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/শিল্পায়ন/সিগনেট প্রেস কলকাতা ২০

পৃ ৭৮। প্রকাশ চৈত্র ১৩৬১

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে প্রকাশিত কতকগুলি রচনার অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: 'কিছু অদল-বদল করতে হল পুরাতন লেখার মধ্যে, নতুন চিন্তাও কিছু-কিছু আমার দুর্বল অবস্থায় পরিশ্রম স্বীকার করেও যোজনা করে দিতে হয়েছে।···কাঁচি নির্ভয়ে চালিয়েছি, আসলটুকু যাতে নষ্ট না হয় এই ভাবে সংক্ষেপ করেছি বক্তব্য।'

২৫

মারুতির পুঁথি/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ/ ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

পৃ [॥০], ১০২, [২]। প্রকাশ ৭ আশ্বিন ১৩৬৩

২৬

চাঁইবুড়োর পুঁথি/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ/ ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

পৃ [।৶০], ১০৮। প্রকাশ ৭ আশ্বিন ১৮৮১ শক

২৭

রং-বেরং/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির/৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট/কলকাতা-১২

পৃ [৷৷০], ১৬৪। প্রকাশ জন্মাষ্টমী ১৩৬৫, সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

সূচী॥ কানকাটা রাজার দেশ; দেবীর বাহন; সিন্ধবাদ বিবরণ পত্র; মাতৃগুপ্ত; রেনি-ডে; চাঁইদাদার গল্প; শিব-সদাগর; সিকস্তি পয়স্তি কথা; রতনমালার বিয়ে; চৈতন চুটকী; কারিগর ও বাজিকর; যুগ্মতারা; আলোয় কালোয়; ইচ্ছাময়ী বটিকা; ভবের হাটে হেতি হোতি; বহিত্র; জেন্তু-সভা বা জন্তু-জাতীয় মহাসমিতি; বাবুই পাখির ওড়ন-বৃত্তান্ত।

২৮

অবনীন্দ্রনাথের/কিশোর সঞ্চয়ন/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির/৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

পৃ [৷৷০], ২২৩। প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৭

নাট্য॥ ভূতপতরীর যাত্রা; রাসধারী [একে তিন তিনে এক]। গল্প॥ চাঁদনি; বাদশাহি গল্প; অস্থি [পথে বিপথে]; বাদশাহি গল্প (২); বাতাপি রাক্ষস [একে তিন তিনে এক]; শিলাদিত্য [রাজকাহিনী]; বনলতা [মাসি]; গজ-কচ্ছপের বৃত্তান্ত; টুকরি বুড়ি। কবিতা॥ ভূত চৌদশী; চটুজলদি কবিতা; চটুজলদি কবিতা (২); হাটবার; নিদ্রা-পরীর তন্দ্রাপরীর গান। প্রবন্ধ॥ আবহাওয়া; রবিকাকার গান [ঘরোয়া]; ঋতুমঙ্গল।

'খাতাঞ্চির খাতা' সম্পূর্ণ এই সঞ্চয়নগ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথ লিখিত যাত্রা-পালা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকগুলি যাত্রা-পালা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলিই সাময়িকপত্রে বা পাণ্ডুলিপিতে আবদ্ধ আছে। এগুলির কোনো-কোনোটি পাঠে প্রীত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ঐগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের উৎসাহ দিয়া অবনীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন[১] :

"St. Marks"
Almora, U. P.

অবন,

রংমহলে [রংমশালে] তোমার লেখাটা পড়ে ভারি মজা লাগল। এ রকম বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প আর কারো কলম থেকে বেরোবার জো নেই। আমরা চেষ্টা করলে তার মধ্যে ঠাণ্ডা মাথার হাওয়া লেগে সমস্ত জুড়িয়ে দেয়। তুমি তো ছেলেদের জন্যে অনেকগুলো রামায়ণ মহাভারতের পালা বানিয়েছ, দোহাই তোমার এগুলো ছাপিয়ে দাও না। ছাপাখানাকে তো বাতে ধরেনি।...ইতি ২৭ মে ১৯৩৭।

রবিকাকা

এই যাত্রাগুলির মধ্যে কোনো-কোনোটি শান্তিনিকেতনে ও অন্যত্র অভিনীত হইয়াছে।

এই পালাগুলির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে :

---

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩

লম্বকর্ণ পালা/রাজশেখর বসু রচিত গড্ডলিকা গ্রন্থের,'লম্বকর্ণ শীর্ষক কাহিনী অবলম্বনে/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ...হরবোলা সম্প্রদায়ের সভ্যদের জন্য সিগনেট প্রেস কর্তৃক নির্দিষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত।

অপর দুইটি পালার শান্তিনিকেতনে অভিনয়-কালে মুদ্রিত নিম্নোক্ত পুস্তিকায় পালার গানগুলি আছে :

হংসনামা পালা। পৃ ১৬ [মলাট সমেত]। ৮ নভেম্বর ১৯৫১। শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত।

এসপার ওসপার পালা। পৃ ৮। ৯ পৌষ ১৩৫৯। বোলপুর শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত।

অ ব নী ন্দ্র - প্র স ঙ্গ

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ও সাহিত্য -রচনা, বা তাঁহার জীবনকথা আলোচনার সহায়ক হইতে পারে এইরূপ কতকগুলি গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও সাময়িক পত্রের বিশেষ সংখ্যার তালিকা নিম্নে মুদ্রিত হইল। অবনীন্দ্রনাথের আত্মস্মৃতিগ্রন্থগুলি পূর্বেই উল্লিখিত।[১]

অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গ্রন্থ

শ্রীমনোজিৎ বসু। অবনীন্দ্রনাথ। মিত্র ও ঘোষ। 'গ্রন্থকারের নিবেদনে'র তারিখ মহালয়া ১৩৫২

শ্রীপ্রতিমা দেবী। স্মৃতিচিত্র। সিগনেট প্রেস। আশ্বিন ১৩৫৯

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্র-চরিতম্। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং। জ্যৈষ্ঠ ১৮৭৯ শকাব্দ
অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত দশখানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

শ্রীউমা দেবী। বাবার কথা। মিত্রালয়। [জুন ১৯৫৮]
'বাবার কথা লিখতে বসেছি, বাবার জীবনী নয়। নিতান্ত ঘরোয়া কাহিনী।'
অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত একখানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

Abanindranath Tagore: His Early Works. Indian Museum, Calcutta. April 1951.
এই চিত্রপ্রতিলিপি-সংগ্রহে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্টেলা ক্রাম্‌রিশ ও শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের রচনা আছে।

Rai Govind Chandra. ABANINDRANATH TAGORE, Thacker Spink & Co. December 1951.
অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত কতকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

Exhibition of Paintings Drawings Toys Books by Abanindranath Tagore. Rabindra-Bharati. April 1956

এই চিত্রতালিকায় শ্রীনন্দলাল বসুর একটি ও শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দুইটি রচনা পুনর্মুদ্রিত। অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত তিনখানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

কলিকাতা অবনীন্দ্র-পরিষদ অবনীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে যে স্মারক-পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাহার কোনো-কোনোটিতে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

---

১ শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় এই বিভাগে উল্লিখিত কোনো-কোনো গ্রন্থ সংকলয়িতাদের লক্ষ্যগোচর করিয়াছেন।

অবনীন্দ্র-প্রসঙ্গ-সম্বলিত বাংলা গ্রন্থ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বাংলার লেখক, প্রথম খণ্ড। বিশ্বভারতী। জন্মাষ্টমী ১৩৫৭
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ৯০-১১৪

শ্রীবিষ্ণু দে। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। সিগনেট প্রেস। আশ্বিন ১৩৫৯
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ১৬-২০

সৈয়দ মুজতবা আলী। ময়ূরকণ্ঠী। বেঙ্গল পাবলিশার্স। চৈত্র ১৩৫৯
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচনা পৃ ১০৬-১১৩

শ্রীবুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যচর্চা। সিগনেট প্রেস। বৈশাখ ১৩৬১
'বাংলা শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী। সৌন্দর্যদর্শন। বিশ্বভারতী। শ্রাবণ ১৩৬১
'অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন' পৃ ৪৯-৫৫

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। এখন যাঁদের দেখছি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং। শ্রাবণ ১৩৬২
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনটি রচনা পৃ ৭-২৫

শ্রীনন্দলাল বসু। শিল্পচর্চা। বিশ্বভারতী। বৈশাখ ১৩৬৩
জলরঙে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব পদ্ধতি ('wash') সম্বন্ধে আলোচনা পৃ ৮৯-৯৭

শ্রীঅশোক মিত্র। ভারতের চিত্রকলা। বেঙ্গল পাবলিশার্স : স্বাক্ষর। আশ্বিন ১৩৬৩
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ২৭০-২৮০

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ। শান্তি লাইব্রেরী। শ্রাবণ ১৩৬৪
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ১২১-১২৬

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। সাহিত্য ও সংস্কৃতি। মিত্রালয়। ভাদ্র ১৩৬৪
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ১৫৬-১৭৬

শ্রীসুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড। বর্ধমান সাহিত্য-সভা। ১৩৬৫
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা পৃ ১৩৮-১৫৩

রাজশেখর বসু। চলচ্চিন্তা। মিত্র ও ঘোষ। ১৮৮০ শক
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ২১-২৫

শ্রীকানাই সামন্ত। চিত্রদর্শন। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী। মহালয়া ১৮৮১ শক
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ১২৪-১৪২। শ্রীনন্দলাল বসুর 'অবনীন্দ্র-প্রতিভা' সম্পর্কে পত্র পরিশিষ্টে মুদ্রিত। অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত পাঁচটি চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী। নন্দনতত্ত্ব। প্রকাশ মন্দির। ১৯৫৯
'অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ধারণা' ও 'অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদ' এই দুইটি প্রবন্ধ পৃ ৬৫-৮৪

সাময়িকপত্রের বিশেষ অবনীন্দ্র-সংখ্যা

VISVABHARATI QUARTERLY. Abanindra Number, May-October 1942
এই সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীঅসিতকুমার হালদার, শ্রীবীরেশ্বর সেন, শ্রীমুকুলচন্দ্র দে,

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্টেলা ক্রাম্‌রিশ, জেমস্ এইচ কাজিন্‌স্, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগুরুদয়াল মল্লিক, শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা আছে; শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথের একটি চিত্রসূচীও এই সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। মার্কুইস অব জেটল্যাণ্ড, লরেন্স বিনিয়ন, সর্ উইলিয়ম রদেন্‌স্টাইন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার অবনীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত পঞ্চাশোর্ধ সংখ্যক চিত্র আছে।

ললিতা। ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

চতুষ্কোণ। অবনীন্দ্র-সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৮

উত্তরা। অবনীন্দ্রস্মৃতি-সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৮

এই সংখ্যায় শ্রীঅসিতকুমার হালদার-লিখিত প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পত্র উদ্ধৃত আছে, তাহার অধিকাংশই বর্তমান সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত।

AESTHETICS. Abanindra Nath Tagore Memorial Number

—

স্বীকৃতি

১ আত্মপ্রতিকৃতি। শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে

২ অবনীন্দ্রনাথ। শ্রীমুকুলচন্দ্র দের সৌজন্যে

৩ আবদুল খালিক। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সৌজন্যে

৪ জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ি। শ্রীমতী রানী চন্দের সৌজন্যে

৫ শ্বেতময়ূর। রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে

৬ কৃষ্ণলীলা : নৌবিহার। রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে।

৭ শ্যামলী : শ্রীঅনিলকুমার চন্দের সৌজন্যে

২-সংখ্যক চিত্রের ব্লক শ্রীমুকুলচন্দ্র দে ও ৬-সংখ্যক চিত্রের ব্লক বিদ্যোদয় লাইব্রেরি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। ৩-সংখ্যক চিত্রের ব্লক ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম -প্রকাশিত Abanindranath Tagore: His Early Works গ্রন্থে প্রকাশিত ও মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত বই 'শকুন্তলা'। ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে ছাপা হয়ে বার হয় ছোট্ট বইটি। এই হল 'বাল্যগ্রন্থাবলী'র প্রথম গ্রন্থ। তার পর ঐ বছরই ফাল্গুন মাসে অবনীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বই 'ক্ষীরের পুতুল' প্রকাশিত হয় বাল্যগ্রন্থাবলীর তৃতীয় গ্রন্থ হিসেবে। শকুন্তলারই মত করে অনুরূপ ভাষায় দুখানি বই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ঠিক জানা যায় নি কোন্ তারিখে, তবে যতদূর মনে হয় শকুন্তলা লেখার দু-এক বছর আগেই। একখানি 'শ্রীকৃষ্ণকথা' অপরখানি 'নল ও দময়ন্তী উপাখ্যান'। এই বই দুটি শেষ করেন নি। যেটুকু লিখেছিলেন তা পরে 'টুকরো কথা'য় ছাপানো হয়েছিল। ১৩০৬ সালে অবনীন্দ্রনাথের দুটি গল্প আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'ছেলে ও ছবি' নামক বইএর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই লেখা দুটির নাম 'কানকাটা রাজার দেশ' এবং 'চাঁদনী'। এই ক'টিই হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকে ছোটদের জন্যে লেখা গল্প।

সাময়িক পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের যে প্রথম লেখা বার হয় তার নাম 'দেবীপ্রতিমা'। তারিখ শ্রাবণ ১৩০৫— শকুন্তলা প্রকাশিত হবার তিন বছর পরে। পত্রিকাটি ভারতী। 'দেবীপ্রতিমা' লেখাটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন ঐ ভাষায় অবনীন্দ্রনাথ আর কখনও লেখেন নি। আগেও না, পরেও নয়। প্রথমে 'শকুন্তলা' তার পর 'দেবীপ্রতিমা' তার পর 'রাজকাহিনী'-'নালক'-এর ভাষা থেকে শেষে 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' এবং 'লম্বকর্ণ'-পালার মজলিসি জমাট ভাষায় গিয়ে কেমন করে পৌছেছিলেন এ নিয়ে যাঁরা আলোচনা করতে প্রস্তুত তাঁরা হয়তো লক্ষ করবেন যে রবীন্দ্রনাথের অত কাছে থেকেও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নি। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র হয়েও এবং কবিরই উৎসাহে লেখনী ধারণ করেও অবনীন্দ্রনাথ উক্ত প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছিলেন।

ভাষার প্রভাব নিয়ে আলোচনা-সূত্রে অবনীন্দ্রনাথ নিজে এক সময় এই কথা বলেছিলেন যে, একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবই তাঁর ভাষার মধ্যে আছে। এ উক্তি কতদূর যুক্তিসাপেক্ষ তার আলোচনা করবেন অবনীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে যাঁরা সম্যক চর্চা করতে প্রস্তুত তাঁরা।

অবনীন্দ্রসাহিত্য তথা বঙ্গসাহিত্যের তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদের উপকারে আসবে এই প্রেরণার বশেই বর্তমান সূচীটি সংগৃহীত হতে আরম্ভ হয়। এই কাজে প্রথমে হাত লাগান আমার ভাই শোভনলাল, পরে প্রধানত বন্ধুবর শ্রীসনৎকুমার গুপ্তের প্রচেষ্টাতেই অবনীন্দ্রনাথের রচনাসূচীটি মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়েছে। এখনও যে এই তালিকার মধ্যে কিছু কিছু ফাঁক আছে সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন। সংগ্রহের প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও অধুনা দুষ্প্রাপ্য কোনো-কোনো সাময়িক পত্র— যাতে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বলে জানা আছে— তা আমরা খুঁজে বার করতে পারি নি। এর মধ্যে নাম করা যেতে পারে নাচঘর, মাস-পয়লা, রবিবার (শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত), বঙ্গলক্ষ্মী, অর্চনা, অঞ্জলি, বিজলী, শিক্ষক ইত্যাদি। সূচীর মধ্যে যেসব তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে অজ্ঞতাবশত তাতে কিছু ভুলচুকও থাকতে পারে। তথ্যানুসন্ধান-বিষয়ে বা সংশোধন-ক্রিয়ায় পাঠকদের কাছ থেকে যে-কোনো প্রকারের সাহায্য পেলে আমরা পরম উপকৃত হব।

বর্তমান সূচীটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের রচনার তালিকা। ঐ সঙ্গে তাঁর লিখিত ভূমিকা-সংবলিত বিভিন্ন লেখকের যেসব বই বেরিয়েছে তারও একটি তালিকা দেওয়া হল। অবনীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গ্রন্থাদির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সহ সূচী বর্তমান অবনীন্দ্রসংখ্যার অন্যত্র লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

রচনাসূচীটি প্রকাশের কালানুক্রমে সাজানো। রচনার নাম, বিষয়, প্রকাশের তারিখ, কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত এবং যে-রচনাগুলি পরে অবনীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়েছে তারও নির্দেশ দেওয়া আছে। ক্রমিক সংখ্যায় সাজানো হয়েছে লেখাগুলি। রচনার নাম, বিষয়, তারিখ ও পত্রিকার পরিচয় এবং যদি তা গ্রন্থভুক্ত হয়ে থাকে তা হলে ॥- চিহ্নের পর গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে।

এই সূচী থেকে জানা যায়, সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'দেবীপ্রতিমা', তারিখ শ্রাবণ ১৩০৫। প্রথম প্রবন্ধ 'নবদূর্বা', তারিখ শ্রাবণ ১৩১১। প্রথম শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ 'প্রশ্নোত্তর,' তারিখ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২। এর প্রায় ন-বছর পরে, ১৩২১ সালে, 'ভারত-ষড়ঙ্গ' এবং 'ষড়ঙ্গ-দর্শন' লেখেন। এবং তারও প্রায় সাত বছর পরে লিখতে শুরু করেন 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধা .লী'। প্রথম নাটক 'শিব-সদাগর', তারিখ আশ্বিন ১৩২৫। প্রথম গদ্যছন্দ 'উত্তরা', তারিখ পৌষ ১৩৩২। এর দু বছর পরে যখন বিচিত্রা পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের 'পাহাড়িয়া' 'রংমহল' প্রভৃতি লেখা বার হতে শুরু হয় তখন রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে গদ্যছন্দ আখ্যা দেন, একটি রচনা নিজে-হাতে কিছু বদল করে দেন এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরে গদ্যছন্দ লেখা শুরু করেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম লিখিত পালা 'এসপার ওসপার', রচনার তারিখ ১৩৩৭। মুদ্রিত প্রথম পালা 'উড়নচণ্ডীর পালা', তারিখ ১৩৪৯। প্রথম জীবনস্মৃতি 'আপনকথা', প্রকাশ বঙ্গবাণী পত্রিকায় ১৩৩৩ সালে। পনেরো থেকে আঠারো বছর পরে রানী চন্দের সহযোগে 'ঘরোয়া' এবং 'জোড়াসাঁকোর ধারে' জীবনস্মৃতি গ্রন্থ দুটি রচিত ও প্রকাশিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথের সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা চুরানব্বই। প্রবন্ধ এবং শিল্পপ্রবন্ধ এক শ সতের। নাটক এবং পালা নিয়ে ছাব্বিশ। পদ্য এবং গদ্যছন্দাদি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের আটচল্লিশটি রচনা আছে। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সংখ্যা সাড়ে তিন শ -র উপর।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাপঞ্জী[১]

১ দেবীপ্রতিমা। গল্প। ভারতী ১৩০৫ শ্রাবণ

২ শিলাদিত্য। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১১ বৈশাখ ॥ রাজকাহিনী প্রথম খণ্ড

৩ গোহ। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ॥ রাজকাহিনী প্রথম খণ্ড

৪ পদ্মিনী। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১১ আষাঢ় ॥ রাজকাহিনী প্রথম খণ্ড

৫ বাপ্পাদিত্য। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১১ শ্রাবণ ॥ রাজকাহিনী প্রথম খণ্ড

৬ নবদূর্ব্বা। প্রবন্ধ। নবযুগ ১৩১১, ২৪ শ্রাবণ

৭ আলেখ্য। গল্প। ভারতী ১৩১২ বৈশাখ

---

১ কোনো কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত রচনাও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হল।

৮ স্বস্তিবচন[১]। কবিতা। ভারতী ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ
৯ প্রশ্নোত্তর। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভাণ্ডার ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ
১০ স্বর্গীয় রবিবর্ম্মা। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩১৩ পৌষ
১১ বিজাতীয় রকমে স্বদেশোন্নতি। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩১৩ ফাল্গুন
১২ গ্রন্থ-সমালোচনা[২]। গ্রন্থ-সমালোচনা। প্রবাসী ১৩১৩ চৈত্র
১৩ মানসচর্চ্চা। প্রবন্ধ। শিল্পবিষয়ক। বঙ্গদর্শন ১৩১৪ কার্তিক
১৪ অরিসিংহ[৩]। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১৫ বৈশাখ ॥ রাজকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড
১৫ হাম্বির[৪]। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১৫ ভাদ্র ॥ রাজকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড
১৬ হাম্বির[৫]। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১৫ আশ্বিন ॥ রাজকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড
১৭ কি ও কেন। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৫ কার্তিক
১৮ স্পষ্ট কথা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৫ ফাল্গুন
১৯ পরিচয়। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৫ চৈত্র
২০ আইনে চীন-ই। গল্প। ভারতী ১৩১৬ বৈশাখ
২১ নামকরণ-রহস্য[৬]। প্রবন্ধ। বঙ্গদর্শন ১৩১৬ বৈশাখ
২২ কলঙ্ক ভঞ্জন[৭]। পত্র : আলোচনা। প্রবাসী ১৩১৬ বৈশাখ
২৩ পান্থ হাফেজ। পদ্য। দেবালয় ১৩১৬ শ্রাবণ
২৪ শিল্পের দেবতা[৮]। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩১৬ কার্তিক
২৫ গঙ্গাযমুনা। গল্প। ভারতী ১৩১৬ পৌষ
২৬ শিল্পে ভক্তিমন্ত্র। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ
২৭ হাফেজ। পদ্য। দেবালয় ১৩১৭ অগ্রহায়ণ
২৮ ভাবসাধন। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৭ অগ্রহায়ণ

১ ভারতেশ্বরের আমন্ত্রণে মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের বিলাতযাত্রা উপলক্ষে রচিত।

২ দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'সতী বেহুলা ও ফুল্লরা' পুস্তকের সমালোচনা।

৩ রাজকাহিনীতে এটি 'হাম্বির' গল্পের প্রথমাংশ রূপে আছে।

৪ রাজকাহিনীতে এটি 'হাম্বির' গল্পের শেষাংশ রূপে আছে।

৫ রাজকাহিনীতে এটি 'হাম্বিরের রাজ্যলাভ' নামে আছে।

৬ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' চিত্রের প্রতিবাদ স্বরূপ পলায়ন-কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তিহীনতার বিষয় আলোচনা করে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বঙ্গদর্শনে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বর্তমান প্রবন্ধটিতে শিল্পকলার দিক থেকে চিত্রটির নামকরণ সমর্থন করা হয়েছে।

৭ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' নামে যে ছবি এঁকেছিলেন তদুপলক্ষে ১৩১৫ সালের প্রবাসীতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় শিল্পীর নৈপুণ্যের প্রশংসা করেন কিন্তু ছবিটির ঐতিহাসিক ভিত্তিহীনতার কথাও বলেন। বর্তমান চিঠিখানি তারই প্রত্যুত্তরে লেখা।

৮ কলিকাতা গভর্নমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের পূজার ছুটি আরম্ভ উপলক্ষে ছাত্রদের প্রতি অভিভাষণ।

২৯ কালোর আলো। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৮ বৈশাখ

৩০ অবনীন্দ্রবাবুর পত্র। পত্র : স্মৃতিমূলক। ভারতী ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ

৩১ দুই দিক। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩১৮ আশ্বিন

৩২ পুরী-মাহাত্ম্য। প্রবন্ধ। ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ

৩৩ টাইটানিকের হিসাব নিকাশ। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩১৯ শ্রাবণ

৩৪ যুগ্মতারা। গল্প। ভারতী ১৩২০ বৈশাখ

৩৫ প্রাণপ্রতিষ্ঠা। প্রবন্ধ : সচিত্র। ভারতী ১৩২০ আশ্বিন

৩৬ গোরিয়াঁ। গল্প। ভারতী ১৩২০ আশ্বিন

৩৭ স্বর্গগত শ্রীমদ্ ওকাকুরা। স্মৃতিকথা। ভারতী ১৩২০ কার্তিক

৩৮ সূর্য্যিমামার ঘর। প্রবন্ধ। সন্দেশ ১৩২০ অগ্রহায়ণ-পৌষ

৩৯ মূর্ত্তি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবাসী ১৩২০ মাঘ ॥ ভারতশিল্পে মূর্তি : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

৪০ যাওয়া আসা। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩২০ ফাল্গুন

৪১ শেষ বোঝা। চিত্র-পরিচয়। প্রবাসী ১৩২০ ফাল্গুন

৪২ পরিচয়। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২১ বৈশাখ

৪৩ গমনাগমন। ভ্রমণবৃত্তান্ত। সবুজ পত্র ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ॥ পথে বিপথে

৪৪ চিত্রে ছন্দ ও রস। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ ॥ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

৪৫ ভারত ষড়ঙ্গ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২১ আষাঢ় ॥ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

৪৬ ষড়ঙ্গ দর্শন। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২১ শ্রাবণ ॥ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

৪৭ নালক। গল্প। ভারতী ১৩২২ বৈশাখ-ভাদ্র ॥ নালক

৪৮ পথে পথে। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ

৪৯ কালো ফুল। গল্প। ভারতী ১৩২২ আশ্বিন

৫০ আদ্যিকালের ছবি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২২ কার্তিক

৫১ ফাল্গুনী। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩২২ ফাল্গুন

৫২ নিষ্ক্রমণ। ভ্রমণবৃত্তান্ত। ভারতী ১৩২২ চৈত্র ॥ পথে বিপথে

৫৩ আরোহণ। ভ্রমণবৃত্তান্ত। ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ ॥ পথে বিপথে

৫৪ ভারতীয় ছবি। স্মৃতিকথা। ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ

৫৫ বিচরণ। ভ্রমণবৃত্তান্ত। ভারতী ১৩২৩ আষাঢ় ॥ পথে বিপথে

৫৬ চৈতন চুটকী। গল্প। ভারতী ১৩২৩ আশ্বিন

৫৭ মোহিনী। গল্প। ভারতী ১৩২৩ চৈত্র ॥ পথে বিপথে

৫৮ মাতু। গল্প। ভারতী ১৩২৪ বৈশাখ ॥ পথে বিপথে

৫৯ গুরুজী। গল্প। ভারতী ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ ॥ পথে বিপথে

৬০ শেমুষী। গল্প। ভারতী ১৩২৪ আষাঢ় ॥ পথে বিপথে

৬১ অস্থি। গল্প। ভারতী ১৩২৪ শ্রাবণ ॥ পথে বিপথে

৬২ টুপী। গল্প। ভারতী ১৩২৪ ভাদ্র ॥ পথে বিপথে
৬৩ দোশালা। গল্প। ভারতী ১৩২৪ আশ্বিন ॥ পথে বিপথে
৬৪ ইন্দু। গল্প। ভারতী ১৩২৪ কার্তিক ॥ পথে বিপথে
৬৫ অরোরা। গল্প। ভারতী ১৩২৪ অগ্রহায়ণ ॥ পথে বিপথে
৬৬ পর-ঈ-তাউস। গল্প। ভারতী ১৩২৪ পৌষ ॥ পথে বিপথে
৬৭ ছাইভস্ম। গল্প। ভারতী ১৩২৪ মাঘ ॥ পথে বিপথে
৬৮ লুকিবিন্থে। গল্প। ভারতী ১৩২৪ ফাল্গুন ॥ পথে বিপথে
৬৯ চণ্ড। গল্প : ঐতিহাসিক। পার্বণী ১৩২৫ ॥ রাজকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড
৭০ শিবসদাগর। নাটক। আগমনী ১৩২৫ ॥ রং-বেরং
৭১ আলপনা। প্রবন্ধ। পার্বণী ১৩২৫
৭২ রূপরেখা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ
৭৩ শিল্প ও শিল্পী। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ
৭৪ বাংলার ব্রত। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৫ কার্তিক-ফাল্গুন ॥ বাংলার ব্রত : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ
৭৫ পাটেল বিল[৯]। প্রবন্ধ। সবুজ পত্র ১৩২৫ মাঘ
৭৬ মাতৃগুপ্ত। গল্প। ভারতী ১৩২৫ চৈত্র
৭৭ আলোর ফুলকি। উপন্যাস। ভারতী ১৩২৬ বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ॥ আলোর ফুলকি
৭৮ তোরমান। গল্প। ভারতী ১৩২৬ বৈশাখ
৭৯ কোটরা। গল্প। ভারতী ১৩২৬ আশ্বিন
৮০ দারুব্রহ্মের ইতিকথা ও উপকথা। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৬ পৌষ
৮১ উনো দুনো।[১০] প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৬ ফাল্গুন
৮২ রাণাকুম্ভ। গল্প : ঐতিহাসিক। রংমশাল ১৩২৭ ॥ রাজকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড
৮৩ রাসধারী। নাটক। পার্বণী ১৩২৭ ॥ একে তিন তিনে এক
৮৪ গঙ্গাফড়িং। গল্প। পার্বণী ১৩২৭ ॥ একে তিন তিনে এক
৮৫ খাতাঞ্চির খাতা। উপন্যাস। সন্দেশ ১৩২৭ বৈশাখ-মাঘ ॥ খাতাঞ্চির খাতা
৮৬ বুড়ো আংলা। উপন্যাস। মৌচাক ১৩২৭-১৩২৮ ॥ বুড়ো আংলা
৮৭ রং বেরং। নাটক। ভারতী ১৩২৭ বৈশাখ
৮৮ নোয়ার কিস্তি। নাটক। ভারতী ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়
৮৯ জেন্তু সভা বা জন্তু-জাতীয় মহাসমিতি। গল্প। ভারতী ১৩২৭ কার্তিক ॥ রং-বেরং
৯০ বারোয়ারি উপন্যাস। উপন্যাসাংশ। ভারতী ১৩২৭ কার্তিক ॥ বারোয়ারি উপন্যাস
৯১ রস ও নীরস। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৭ পৌষ
৯২ ধরাপড়া। নাটক। শিক্ষক ১৩২৮ আষাঢ় ॥ একে তিন তিনে এক

৯ কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলএ 'পাটেল বিল'এর সমর্থনে সভাপতির বক্তৃতা। ভারতী ও প্রবাসীতে পুনর্মুদ্রিত।

১০ হাইল্যাণ্ড ডিবেটিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

৯৩ ভায়ে ভায়ে[১১]। গল্প : ঐতিহাসিক। রংমশাল ১৩২৮ ॥ রাজকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড

৯৪ আলো আঁধারে। গল্প। ভারতী ১৩২৮ কার্তিক

৯৫ শিল্পের অন্ধকার যুগ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবর্ত্তক ১৩২৮ মাঘ

৯৬ শিল্পে অনধিকার[১২]। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবর্ত্তক ১৩২৮ ফাল্গুন-চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

৯৭ বাণী ও বীণা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবর্ত্তক ১৩২৮ ফাল্গুন

৯৮ শিল্পের অধিকার। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৮ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

৯৯ হিন্দবাদের প্রথম ও সিন্দবাদের শেষযাত্রা। গল্প। রংমশাল ১৩২৯ ॥ একে তিন তিনে এক

১০০ সঙ্গীতের পথ। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৯ বৈশাখ

১০১ দৃষ্টি ও সৃষ্টি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১০২ এক যে ছিল বাগান। স্মৃতিকথা। প্রবর্ত্তক ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ

১০৩ ছবি ও সুর। গল্প। ভারতী ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ

১০৪ শিল্প ও ভাষা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ আষাঢ় ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১০৫ তালাসী। প্রবন্ধ। প্রবর্তক ১৩২৯ আষাঢ়

১০৬ দুই লাইন। গল্প। ভারতী ১৩২৯ আষাঢ়

১০৭ সত্যেন্দ্র। স্মৃতিকথা। ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ

১০৮ শিল্পের সচলতা ও অচলতা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ শ্রাবণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১০৯ রঙ্গালয়ের রঙ্গিন আলো[১৩]। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৯ ভাদ্র

১১০ বাতাপি রাক্ষস। গল্প। মৌচাক ১৩২৯ আশ্বিন ॥ একে তিন তিনে এক

১১১ সমালোচনা[১৪]। গ্রন্থ-সমালোচনা। ভারতী ১৩২৯ কার্তিক

১১২ হাঁসুলি কি ফাঁসুলি[১৫]। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৯ কার্তিক

১১৩ সৌন্দর্য্যের সন্ধান। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ কার্তিক ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১১৪ শিল্প ও দেহতত্ত্ব। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১১৫ জলে স্থলে[১৬]। গল্প। বুধবার ১৩২৯, ২৬ পৌষ

১১৬ চিঠি। লেখ-চিত্র। বুধবার ১৩২৯, ২৪ মাঘ

১১৭ হাফেজ। প্রবন্ধ। প্রবর্তক ১৩২৯ মাঘ

১১৮ অন্তর ও বাহির। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ ফাল্গুন ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

---

১১ রাজকাহিনীতে এটি সংগ্রামসিংহ নামে মুদ্রিত হয়েছে।

১২ বঙ্গবাণী ১৩২৮ ফাল্গুন সংখ্যাতেও মুদ্রিত।

১৩ নাট্যশিল্পী অমরনাথ রায়ের স্মৃতিসভায় সভাপতির অভিভাষণ।

১৪ দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনা।

১৫ কলিকাতা ক্যানিং হস্টেলের চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে সভাপতির বক্তৃতা।

১৬ প্রাচী-র ১৩৩০ ভাদ্র সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

১১৯ বর্তমান ও ভবিষ্যত আর্ট। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবর্তক ১৩২৯ চৈত্র

১২০ মত ও মন্ত্র। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

১২১ বাসন্তী পর্ব্ব[১৭]। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৯ চৈত্র

১২২ সন্ধ্যার উৎসব[১৮]। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ বৈশাখ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১২৩ উৎসবের কনসার্ট। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩৩০ বৈশাখ

১২৪ ছেলেভুলানো ছড়া। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩০ বৈশাখ

১২৫ দর্শন দরবাজা[১৯]। প্রবন্ধ। অয়ন ১৩৩০ বৈশাখ

১২৬ মহা বংবুম হস্কীয় সিড়প প্রশ্নোত্তরমালা। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ

১২৭ শিল্প। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রাচী ১৩৩০ আষাঢ়

১২৮ কারুছত্র। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। অয়ন ১৩৩০ শ্রাবণ

১২৯ বড় লেখা ছোট লেখা। প্রবন্ধ। প্রাচী ১৩৩০ শ্রাবণ

১৩০ রীতিমতো শিল্পশিক্ষা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। তরুণ ১৩৩০ ভাদ্র

১৩১ এসপার ওসপার। নাটক। ভারতী ১৩৩০ আশ্বিন

১৩২ টাটকা চিঠি। পত্র। তরুণ ১৩৩০ আশ্বিন

১৩৩ শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ আশ্বিন ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৩৪ ছেলেমানুষী বিদ্যে। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩০ কার্তিক-অগ্রহায়ণ

১৩৫ আলোয় কালোয়। গল্প। মৌচাক ১৩৩০ কার্তিক ॥ একে তিন তিনে এক

১৩৬ শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৩৭ কারিগর ও বাজীকর। গল্প। প্রাচী ১৩৩০ পৌষ

১৩৮ পূর্ণিমা ব্রত। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩০ পৌষ

১৩৯ শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভালোমন্দ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ মাঘ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৪০ সমালোচনা[২০]। সমালোচনা। ভারতী ১৩৩০ ফাল্গুন

১৪১ রস ও রচনার ধারা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ ফাল্গুন

১৪২ পথের বীণা। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩১ বৈশাখ

১৪৩ নববর্ষের আবদার। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ

১৪৪ উন্নতি ও পরিণতি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। মহিলা ১৩৩১, ২ জ্যৈষ্ঠ

১৪৫ নাচঘরের আবহাওয়া। প্রবন্ধ। নাচঘর ১৩৩১, ৯ জ্যৈষ্ঠ

১৪৬ চরখা না বেহালা। প্রবন্ধ। শনিবারের চিঠি ১৩৩১ শ্রাবণ

---

১৭ বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে পঠিত।

১৮ হার্ডিঞ্জ হস্টেল-এর তিন নং ওয়ার্ড-এর সান্ধ্য সম্মিলনীতে পঠিত।

১৯ ভারতী'র ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

২০ কমলাকান্তের পত্র।

১৪৭ বাংলা থিয়েটারের এক টুকরো। প্রবন্ধ। নাচঘর ১৩৩১, ১৬ শ্রাবণ

১৪৮ শিল্পাচার্যের পত্র[২১]। পত্র। বাঁশরী ১৩৩১ আশ্বিন

১৪৯ নানা পংক্তি। পদ্য। শনিবারের চিঠি ১৩৩১ আশ্বিন

১৫০ শিল্পবৃত্তি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩১ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৫১ সুন্দর। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩১ ফাল্গুন ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৫২ নির্ভাবনার দুর্ভাবনা[২২]। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩৩১ চৈত্র

১৫৩ অসুন্দর। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩১ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৫৪ শিল্পের 'ক' ও 'খ'। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বার্ষিক বসুমতী ১৩৩২

১৫৫ রূপরেখার রূপকথা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবাসী ১৩৩২ বৈশাখ

১৫৬ বড় রাজা ছোট রাজার গল্প। গল্প। মৌচাক ১৩৩২ বৈশাখ ॥ একে তিন তিনে এক

১৫৭ জাতি ও শিল্প। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৫৮ স্মৃতির পরশ[২৩]। স্মৃতিকথা। কল্লোল ১৩৩২ আষাঢ়

১৫৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্মৃতিকথা। বঙ্গবাণী ১৩৩২ আষাঢ়

১৬০ আশুতোষ[২৪]। স্মৃতিকথা। বঙ্গবাণী ১৩৩২ আষাঢ়

১৬১ দীপালি। লেখ-চিত্র। শরতের ফুল ১৩৩২ আশ্বিন

১৬২ আর্টিষ্ট। । ভারতী ১৩৩২ আশ্বিন

১৬৩ কনকলতা। গল্প। মৌচাক ১৩৩২ আশ্বিন ॥ একে তিন তিনে এক

১৬৪ খাসিয়াদের শারদোৎসব। প্রবন্ধ। কল্লোল ১৩৩২ আশ্বিন

১৬৫ অরূপ না রূপ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ কার্তিক ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৬৬ রূপবিদ্যা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৬৭ রূপ দেখা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ পৌষ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৬৮ উত্তরা। গদ্যছন্দ। উত্তরা ১৩৩২ পৌষ

১৬৯ একখানি পত্র। পত্র। নাচঘর ১৩৩২, ৩ পৌষ

১৭০ বড় জ্যাঠামশায়। স্মৃতিকথা। ভারতী ১৩৩২ মাঘ

১৭১ একখানি পত্র। পত্র। উত্তরা ১৩৩২ ফাল্গুন

১৭২ স্মৃতি ও শক্তি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ ফাল্গুন ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৭৩ পত্র[২৫]। পত্র। শান্তিনিকেতন ১৩৩২ ফাল্গুন

১৭৪ পত্র[২৫]। দ্বিতীয়। পত্র। শান্তিনিকেতন ১৩৩২ ফাল্গুন

---

২১ শিল্পী চারুচন্দ্র রায়কে লিখিত।

২২ রামমোহন লাইব্রেরী হলে কুমার লাইব্রেরীর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। ২৪, মাঘ।

২৩ রাঁচীর 'শান্তিধাম' সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসস্থান এবং 'শান্তিনিকেতন' এই দুইএর স্মৃতির আলোচনা।

২৪ কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি হলে প্রথম বার্ষিক স্মৃতিসভায় পঠিত।

২৫ নন্দলাল বসুকে লেখা।

১৭৫ আর্য ও অনার্য শিল্প। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৭৬ দোতারা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। উত্তরা ১৩৩২ চৈত্র
১৭৭ আসা যাওয়া। গদ্যছন্দ। বার্ষিক বসুমতী ১৩৩৩
১৭৮ কোণের ঘর। গল্প। বার্ষিক বসুমতী ১৩৩৩
১৭৯ সাথী। গল্প। বার্ষিক শিশুসাথী ১৩৩৩ ॥ একে তিন তিনে এক
১৮০ আশ্রমের উৎসব ও অনুষ্ঠান। প্রবন্ধ। প্রবর্ত্তক ১৩৩৩ বৈশাখ
১৮১ আশীর্ব্বাদ ও স্বস্তিবচন[২৬]। আশীর্বাণী। প্রবাসী ১৩৩৩ বৈশাখ
১৮২ আর্য্যশিল্পের ক্রম। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ বৈশাখ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৮৩ পত্র[২৭]। পত্র। শান্তিনিকেতন ১৩৩৩ বৈশাখ
১৮৪ রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট। পত্র : শিল্পবিষয়ক। শান্তিনিকেতন ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ
১৮৫ আর্টের সহজ পথ। প্রবন্ধ। উত্তরা ১৩৩৩ আশ্বিন
১৮৬ সাহিত্যে শুচিবিচার। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩৩ কার্তিক
১৮৭ ঋতুমঙ্গল। লেখ-চিত্র। কালিকলম ১৩৩৩ কার্তিক
১৮৮ ভোম্বলদাসের কৈলাসযাত্রা। গল্প। মৌচাক ১৩৩৩ কার্তিক ॥ একে তিন তিনে এক
১৮৯ রতা শেয়ালের কথা। গল্প। মৌচাক ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ ॥ একে তিন তিনে এক
১৯০ রূপ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৯১ খেলার পুতুল। সচিত্র। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ পৌষ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৯২ একখানি পত্র[২৮]। পত্র। ভারতবর্ষ ১৩৩৩ পৌষ
১৯৩ সিংহরাজ্যের রাজ্যাভিষেক। গল্প। মৌচাক ১৩৩৩ পৌষ ॥ একে তিন তিনে এক
১৯৪ জগদিন্দ্রনাথের স্মরণে। প্রবন্ধ। মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩৩ ফাল্গুন
১৯৫ ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ[২৯]। গ্রন্থসমালোচনা। মৌচাক ১৩৩৩ ফাল্গুন
১৯৬ আপন কথা। স্মৃতিকথা। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ ফাল্গুন-১৩৩৪ ভাদ্র ॥ আপন কথা
১৯৭ রূপের মান ও পরিমাণ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৯৮ হীরা-কুনি। গল্প। চালচিত্র ১৩৩৪
১৯৯ এম্ এ আর্টিষ্টের প্রশ্নমালা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। কল্লোল ১৩৩৪
২০০ হাওয়াবদল। গদ্যছন্দ। মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩৪ বৈশাখ
২০১ দেয়ালা। গল্প। মৌচাক ১৩৩৪ বৈশাখ ॥ একে তিন তিনে এক
২০২ মহামাষ তৈল। গল্প। বেণু ১৩৩৪ বৈশাখ ॥ একে তিন তিনে এক

---

২৬ প্রবাসীর পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় লিখিত।

২৭ 'শান্তিনিকেতন' থেকে সংকলিত।

২৮ এই পত্রখানি শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'ভারতের স্থাপত্যশিল্প' প্রবন্ধ উপলক্ষে লেখকমহাশয়কে লিখিত।

২৯ শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত।

২০৩ ভাব। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
২০৪ বর্ণমালা। প্রবর্তক ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ
২০৫ বাবুই পাখীর ওড়নবৃত্তান্ত। গল্প। বেণু ১৩৩৪ আষাঢ়-ভাদ্র ॥ রং-বেরং
২০৬ নতুন ও পুরোনোর ছন্দ। প্রবন্ধ। বিচিত্রা ১৩৩৪ আষাঢ়
২০৭ কলি ও কাল। প্রবন্ধ। নওরোজ ১৩৩৪ আষাঢ়
২০৮ পাহাড়িয়া। গদ্যছন্দ। বিচিত্রা ১৩৩৪ শ্রাবণ
২০৯ রংমহল। গদ্যছন্দ। বিচিত্রা ১৩৩৪ ভাদ্র
২১০ রসসৃষ্টি। প্রবন্ধ। নাচঘর ১৩৩৪, ১১ আশ্বিন
২১১ হাটবার। গদ্যছন্দ। বেণু ১৩৩৪ আশ্বিন
২১২ তিন দরিয়া। গদ্যছন্দ। বিচিত্রা ১৩৩৪ আশ্বিন
২১৩ মেঘমণ্ডল। গদ্যছন্দ। বিচিত্রা ১৩৩৪ কার্তিক
২১৪ আতসবাজি। গদ্যছন্দ। উত্তরা ১৩৩৪ কার্তিক
২১৫ লাবণ্য। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৪ কার্তিক ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
২১৬ বাগানে। লেখ-চিত্র। বিচিত্রা ১৩৩৪ চৈত্র
২১৭ সাদৃশ্য। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবাসী ১৩৩৪ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
২১৮ আলোকশিখা। গদ্যছন্দ। রংমশাল ১৩৩৫
২১৯ আশীর্বাণী। আশীর্বাণী। বিশ্ববার্তা ১৩৩৫ রবীন্দ্র সংখ্যা
২২০ ভারতশিল্প[৩০]। গ্রন্থ-সমালোচনা। প্রবাসী ১৩৩৫ বৈশাখ
২২১ বর্ণিকাভঙ্গম। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বিচিত্রা ১৩৩৫ পৌষ
২২২ নতুন খাতা। লেখ-চিত্র। চিত্রা ১৩৩৬ বৈশাখ
২২৩ আষাঢ়ে গল্প। গল্প। শিশুসাথী ১৩৩৭ ॥ একে তিন তিনে এক
২২৪ খোকাখুকী। গল্প। খোকাখুকু ১৩৩৭ কার্তিক ॥ একে তিন তিনে এক
২২৫ অশথ-পাতা। লেখ-চিত্র। বিচিত্রা ১৩৩৭ মাঘ
২২৬ বনের ময়ূর[৩১]। পদ্য। 'মডার্ন রিভিউ' ১৯৩১ মার্চ
২২৭ যাত্রা ও থিয়েটার[৩২]। প্রবন্ধ। জয়ন্তী-উৎসর্গ ১৩৩৮ পৌষ
২২৮ অপরাজিতার মালা। পদ্য। রূপরেখা ১৩৩৯
২২৯ গীত-হাফেজ। পদ্য। রূপরেখা ১৩৩৯
২৩০ শিল্পী শ্রীমান্ নন্দলাল বসু[৩৩]। আশীর্বাণী। বিচিত্রা ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ

৩০ ডা পি. কে. আচার্য প্রণীত *A Book on Architecture*-এর সমালোচনা।

৩১ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস্-এর উদ্যোগে চীনা চিত্রকরদের দুখানি ছবি উপহার দিয়ে (তার মধ্যে একখানি ময়ূরের ছবি) অবনীন্দ্রনাথ এই কবিতাখানি লিখে দেন।

৩২ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত।

৩৩ বিচিত্রার 'চিত্রশালা'য় প্রকাশিত নন্দলাল বসুর চিত্রাবলীর সমালোচনা।

২৩১ সহজ মানুষকে নমস্কার। প্রবন্ধ। Acharyya Ray Commemoration Volume 1932

২৩২ বাংলার রঙ ও রূপ[৩৪]। চিত্র-সমালোচনা। বিচিত্রা ১৩৩৯ পৌষ

২৩৩ রূপকথার দেশ। পদ্য। উদয়ন ১৩৪০ বৈশাখ

২৩৪ নূতনে পুরাতনে[৩৫]। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। উদয়ন ১৩৪০ আষাঢ়

২৩৫ উড়ো চিঠি[৩৬]। প্রবন্ধ : নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ৫ শ্রাবণ

২৩৬ উড়ো চিঠি[৩৬]। প্রবন্ধ : নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ১২ শ্রাবণ

২৩৭ উড়ো চিঠি[৩৬]। প্রবন্ধ : নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ২৬ শ্রাবণ

২৩৭ উড়ো চিঠি[৩৬]। প্রবন্ধ : নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ৯ ভাদ্র

২৩৮ ব্রহ্মদেশের নৃত্য। প্রবন্ধ : নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ৭ বৈশাখ

২৩৯ 'পাউই' নৃত্য। প্রবন্ধ : নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ২১ বৈশাখ

২৪০ কাকলী। পদ্য। রূপরেখা ১৩৪১

২৪১ একে তিন তিনে এক। গল্প। মৌচাক ১৩৪১ বৈশাখ-শ্রাবণ ॥ একে তিন তিনে এক

২৪২ ই. বি. হ্যাভেল। স্মৃতিকথা। প্রবাসী ১৩৪১ শ্রাবণ

২৪৩ বর্ষবাণী। লেখ-চিত্র। বর্ষবাণী ১৩৪২

২৪৪ রাবিস রামায়ণের ভূমিকা। পদ্য। নবমঞ্জরী ১৩৪৩

২৪৫ বাসিন্দা-নিবাসিন্দার রূপকথা। গল্প। বর্ষবাণী ১৩৪৩

২৪৬ কাঁচায় পাকায়। গল্প। মৌচাক ১৩৪৪ শ্রাবণ ॥ একে তিন তিনে এক

২৪৭ মারুতির পুঁথি। পুঁথির ভঙ্গীতে রামায়ণের গল্প। মৌচাক ১৩৪৪-১৩৪৫ ॥ মারুতির পুঁথি। চাঁইবুড়োর পুঁথি

২৪৮ সিকস্তি পয়স্তি কথা। গল্প। রংমশাল ১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র ॥ রং-বেরং

২৪৯ ভবের হাটে হেতি হোতি। গল্প। পাঠশালা ১৩৪৪ আশ্বিন-পৌষ ॥ রং-বেরং

২৫০ ভূত চৌদশী। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৪ কার্তিক

২৫১ হেতি হোতির বৃত্তান্ত। গল্প। সোনার কাঠি ১৩৪৫

২৫২ দেবীর বাহন। গল্প। ছোটদের মাধুকরী ১৩৪৫ ॥ রং-বেরং

২৫৩ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ বৈশাখ

২৫৪ শিশুসাহিত্য। প্রবন্ধ। রংমশাল ১৩৪৫ আষাঢ়

২৫৫ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ আশ্বিন

২৫৬ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ কার্তিক

২৫৭ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ

---

৩৪ নলিনীকান্ত মজুমদারের ছবির প্রতিলিপি-সংগ্রহের সমালোচনা।

৩৫ স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা।

৩৬ উদয়শঙ্করের নৃত্য উপলক্ষে লেখা।

২৫৮ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ পৌষ

২৫৯ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ ফাল্গুন

২৬০ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ চৈত্র

২৬১ পোড়ালঙ্কার পুঁথি। পুঁথির ভঙ্গিতে রামায়ণের গল্প : অসম্পূর্ণ। মৌচাক ১৩৪৬ বৈশাখ-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ

২৬২ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৬ বৈশাখ

২৬৩ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ

২৬৪ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৬ আষাঢ়

২৬৫ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ ভাদ্র

২৬৬ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ আশ্বিন

২৬৭ শিল্পীর খেয়াল। প্রবন্ধ। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৪৬

২৬৮ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ কার্তিক

২৬৯ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ

২৭০ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ পৌষ

২৭১ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ মাঘ

২৭২ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ ফাল্গুন

২৭৩ বড় জ্যাঠামশায়। স্মৃতিকথা। প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র

২৭৪ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ চৈত্র

২৭৫ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ বৈশাখ

২৭৬ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ

২৭৭ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ শ্রাবণ

২৭৮ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ ভাদ্র

২৭৯ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ আশ্বিন

২৮০ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ কার্তিক

২৮১ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ

২৮২ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ পৌষ

২৮৩ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ মাঘ

২৮৪ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ ফাল্গুন

২৮৫ আমার ছবি ও বই লিখতে শেখা এবং আমার মাষ্টারি। স্মৃতিকথা। প্রবাসী ১৩৪৮ বৈশাখ ॥ জোড়াসাঁকোর ধারে

২৮৬ মহাবীরের পুঁথি। পুঁথির ভঙ্গীতে রামায়ণের গল্প। রংমশাল ১৩৪৮ আশ্বিন - ১৩৫০ ভাদ্র

২৮৭ রবিকাকার গান। স্মৃতিকথা। কবিতা ১৩৪৮ আষাঢ় ॥ ঘরোয়া

২৮৮ শিশুদের রবীন্দ্রনাথ। স্মৃতিকথা। রংমশাল ১৩৪৮ আষাঢ়

২৮৯ আবহাওয়া। স্মৃতিকথা। শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন

২৯০ রূপকথার আদিকথা। স্মৃতিকথা। রূপকথা ১৩৪৮ আশ্বিন

২৯১ প্রভাত। পদ্য। অলকা ১৩৪৮ কার্তিক

২৯২ রেনি ডে। গল্প। মধুমেলা ১৩৪৯ ॥ রং-বেরং

২৯৩ উড়নচণ্ডীর পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৪৯

২৯৪ মাসীমা। গল্প। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ শ্রাবণ ॥ মাসি

২৯৫ আমাদের সেকালের পুজো। স্মৃতিকথা। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৪৯

২৯৬ ফার্ষ্ট টু লাষ্ট[৩৭]। গল্প। শনিবারের চিঠি ১৩৪৯ কার্তিক

২৯৭ হারজিত। গল্প। পাঠশালা ১৩৪৯ পৌষ

২৯৮ রাতশেষের গান। পদ্য। পাঠশালা ১৩৪৯ পৌষ

২৯৯ দুই সন্ধানী। প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ মাঘ

৩০০ বনলতা। গল্প। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র ॥ মাসি

৩০১ মউর ছালের পালা। যাত্রার পালা। দিগন্ত ১৩৫০

৩০২ টুকরী বুড়ি। গল্প। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫০

৩০৩ চৈত্রের মুহূর্ত্ত। গদ্যকবিতা। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ

৩০৪ হাতে খড়ি। গল্প। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ জ্যৈষ্ঠ ॥ মাসি

৩০৫ কঞ্জুষের পালা। যাত্রার পালা। রংমশাল ১৩৫০ আশ্বিন-পৌষ

৩০৬ ভারতীয় চিত্রকলার প্রচারে রামানন্দ। স্মৃতিকথা। প্রবাসী ১৩৫০ পৌষ

৩০৭ আমাদের পারিবারিক সঙ্গীতচর্চ্চা। স্মৃতিকথা। গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০ মাঘ

৩০৮ শুভ কামনায়[৩৮]। আশীর্ব্বাণী। জয়ন্তী মৌচাক ১৩৫১

৩০৯ গজকচ্ছপের পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫১

৩১০ শিশু সাহিত্য[৩৯]। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩৫১ বৈশাখ

৩১১ মৌচাক মেলা। প্রবন্ধ। মৌচাক ১৩৫১ বৈশাখ

৩১২ মা গঙ্গা। স্মৃতিকথা। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ বৈশাখ-আষাঢ় ॥ জোড়াসাঁকোর ধারে

৩১৩ ভূতপতরীর যাত্রা। যাত্রার পালা। রংমশাল ১৩৫১ বৈশাখ-ফাল্গুন

৩১৪ বহিত্র। গল্প। দেশের মাটি ১৩৫১ আশ্বিন ॥ রং বেরং

৩১৫ রথোযাত্রা গীতাভিনয়। যাত্রার পালা। অর্চ্চনা ১৩৫২ বৈশাখ

৩১৬ রতনমালার বিয়ে। গল্প। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫২

৩১৭ চাঁইদাদার গল্প। গল্প। শারদীয়া দেশ ১৩৫২

৩১৮ নিদ্রাপরী তন্দ্রাপরীর গান। পদ্য। কলরব ১৩৫২

---

৩৭ শনিবারের চিঠি সম্পাদকের মন্তব্য—'এই গল্পের গোড়ার দিকের ঘটনা বিশ্বভারতী পত্রিকা ভাদ্র সংখ্যার মাসি গল্পে দ্রষ্টব্য'।

৩৮ মৌচাকের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় লিখিত।

৩৯ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, দিল্লীতে পঠিত।

৩১৯ নতুন বছর[৪০]। লেখ-চিত্র। উদয়াচল ১৩৫২ আষাঢ়

৩২০ আলিপনা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২ শ্রাবণ

৩২১ কাঠবেড়ালের পুঁথি। গল্প। মৌচাক ১৩৫২ কার্তিক

৩২২ ধোড়াকাক বুড়োশেয়ালের পালা। যাত্রার পালা। আকাশদীপ ১৩৫৩

৩২৩ নেই ও আছে[৪১]। প্রবন্ধ। রংমশাল ১৩৫৩ আষাঢ়

৩২৪ সিন্ধবাদ বিবরণ পদ্য। গল্প। সপ্তডিঙা ১৩৫৩ ॥ রং-বেরং

৩২৫ কলাবনের কলা। গল্প । শারদীয়া দেশ ১৩৫৪

৩২৬ রামানন্দজীবনী। গ্রন্থ-সমালোচনা। প্রবাসী ১৩৫৪ পৌষ

৩২৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্ব্বাণী[৪২]। আশীর্ব্বাণী। বিশ্ববার্ত্তা ১৩৫৫, ২৫ বৈশাখ

৩২৮ বেণুকুঞ্জের পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫৫

৩২৯ সব পেয়েছির আসর। । শারদীয়া যুগান্তর ১৩৫৫

৩৩০ যুগাবতার পালা। যাত্রার পালা। ছায়াপথ ১৩৫৫

৩৩১ সোকার ঘটকালি। গদ্য। শারদীয়া বসুমতী ১৩৫৬

৩৩২ লম্বকর্ণ পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫৬

৩৩৩ তালপাতি। পদ্য। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫৭

৩৩৪ ঋষিযাত্রা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫৭

৩৩৫ অতীত ও বর্ত্তমান বাংলা। প্রবন্ধ। পুনশ্চ ১৩৫৭ আশ্বিন

৩৩৬ অক্ষরদের গান। কবিতা। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫১

৩৩৭ আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাণী। চয়নিকা ১৩৫৮ বৈশাখ

৩৩৮ ছেলে-বুড়ো। গদ্যছন্দ। কথাসাহিত্য ১৩৫৮ পৌষ

৩৩৯ হংসনামা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫৯

৩৪০ এসপার ওসপার[৪৩]। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৬০

৩৪১ শান্তিনিকেতনে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ভাষণ [৪৪]। শ্রীসুধীরচন্দ্র কর 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা', আশ্বিন ১৩৬০

৩৪২ সূর্য্য কি করতে এলেন[৪৫]। গল্প। সমকালীন ১৩৬১ শারদীয়

৩৪৩ উড়ো চিঠি (এয়ার মেল)[৪৬]। প্রবন্ধ। সুচিত্রিতা ১৩৬১ শারদীয়া

---

৪০ ১৩৪২এর বর্ষবাণীতে 'বর্ষবাণী' নামে প্রকাশিত।

৪১ অবনীন্দ্রনাথের সাতান্ন বছরের জন্মদিনে লিখিত।

৪২ রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।

৪৩ এই নামে যে নাটক আশ্বিন ১৩৩০এর ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে যাত্রার পালায় ভাঙা।

৪৪ ভাষণের তারিখ সম্ভবতঃ ১৩৪৮ চৈত্র।

৪৫ প্রাচী'র ১৩৩০ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'জলে স্থলে' নামক গল্পের প্রথম খসড়া।

৪৬ নাচঘর হইতে উদ্ধৃত।

৩৪৪ বৃক ও মেষপালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া বসুমতী ১৩৬১

৩৪৫ জাবালির পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৬১

৩৪৬ হানাবাড়ির কারখানা। উপন্যাস। মৌচাক ১৩৬১ বৈশাখ-কার্তিক

৩৪৭ অবনীন্দ্রনাথের পত্র[৪৭]। পত্র। পদ্যে লেখা। কথাশিল্প ১৩৬১ মাঘ

৩৪৮ গজকচ্ছপের বৃত্তান্ত। গল্প। দেবালয় ১৩৬২

৩৪৯ উড়ো পাখী। স্মৃতিকথা। সমকালীন ১৩৬২ বৈশাখ

৩৫০ এ কার জন্য। পদ্য। ঋতুপত্র ১৩৬২ গ্রীষ্ম সংখ্যা

৩৫১ পরবশ। প্রবন্ধ। সমকালীন ১৩৬২ শারদীয়

৩৫২ ফসকান পালা। যাত্রার পালা। জয়যাত্রা ১৩৬৩

৩৫৩ দুই পথিক ও ভল্লুকের পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া বসুমতী ১৩৬৩

৩৫৪ শ্রীকৃষ্ণকথা। গল্প: অসম্পূর্ণ। টুকরো কথা ১৩৬৩ শ্রাবণ

৩৫৫ নল-দময়ন্তী। গল্প: অসম্পূর্ণ। টুকরো কথা ১৩৬৩ শ্রাবণ

৩৫৬ কাক ও পনির পালা। যাত্রার পালা। মৌচাক ১৩৬৩ কার্তিক

৩৫৭ অবনীন্দ্রনাথের চিঠি[৪৮]। পত্র। সংযোগ ১৩৬৪ শ্রাবণ

৩৫৮ পুতলীর পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া বসুমতী ১৩৬৫

৩৫৯ ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী পালা। যাত্রার পালা। মৌচাক ১৩৬৫ কার্তিক

৩৬০ ছড়া। পদ্য। উত্তরসূরী ১৩৬৫ কার্তিক

৩৬১ গোল্ডেন গুজ পালা। যাত্রার পালা। দেবদেউল ১৩৬৬

তারিখ জানা যায় নি

৩৬২ ভূতের কেত্তন। পদ্য। সোনালি ফসল

৩৬৩ জেন্ত দেশ। পদ্য। ছোটদের বার্ষিকী

৩৬৪ নগ্ন ক্ষপণকে দেশে রজকঃ কি করিষ্যতি। প্রবন্ধ। মাসপয়লা

অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকা সংবলিত গ্রন্থ

১ জেবুন্নিসা বেগম। সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা। ১৩০৬ অগ্রহায়ণ

২ অজন্তা। শ্রীঅসিতকুমার হালদার। ১৩২০

৩ রাজাবাদশা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩২৮

৪ মন্দিরের কথা। শ্রীগুরুদাস সরকার। ১৩২৮

৫ ভারতের দেবদেউল। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। ১৩৪৮ বৈশাখ

---

৪৭ পৌত্র অমিতেন্দ্রনাথকে লেখা।

৪৮ কন্যা সুরূপা দেবীকে সাহাজাদপুর হইতে লেখা।

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খৃষ্ট

রবীন্দ্রনাথ খৃষ্ট-জীবন ও -বাণীর যে ব্যাখ্যা বিভিন্ন সময়ে (১৯১০-১৯৩৬) করেছেন এই গ্রন্থে সেগুলি একত্র সংকলিত হয়েছে। সমাহৃত অধিকাংশ রচনা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল -অঙ্কিত খৃষ্ট-চিত্রে ভূষিত। মূল্য ২·৫০ টাকা।

বিভিন্ন বৎসরে (১২৯১-১৩৪৭) রামমোহনের স্মরণ-সভায়, রামমোহন শতবার্ষিকীতে, ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসবে, মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, অভিভাষণ দিয়েছেন, ও অন্য সূত্রেও রামমোহন সম্বন্ধে যা বলেছেন, এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণে তা যথাসাধ্য সংকলন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্ব সংস্করণের পর এই নূতন সংস্করণে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি রচনা সংগৃহীত হয়েছে। মূল্য ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·০০ টাকা।

সপ্তম খণ্ড

কাদম্বিনী দত্ত ও শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত পত্রগুচ্ছ।
মূল্য কাগজের মলাট ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·৩০ টাকা

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত চিত্রাবলী-বিভূষিত শোভন সংস্করণ
এই সংস্করণে সুবিস্তৃত গ্রন্থপরিচয়ও আছে : মূল্য বোর্ড বাঁধাই ১২·০০ টাকা
মুগা ও চামড়া বাঁধাই ২০·০০ টাকা

॥ অন্যান্য সংস্করণ ॥

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচয় সংবলিত কাগজের মলাট : ৩·৫০ টাকা
বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় সংবলিত সাধারণ সংস্করণ যন্ত্রস্থ

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

Statement about ownership and other particulars about
VISVA-BHARATI PATRIKA

FORM IV : Rule 8

1. Place of Publication	6/3, Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta 7.
2. Periodicity of Publication ...	Quarterly.
3. Printer's Name	Sri Prabhat Chandra Ray.
Nationality	Indian.
Address	Sri Gouranga Press Private Ltd. 5, Chintamani Das Lane, Calcutta 9.
4. Publisher's Name	Sri Saradindu Bose.
Nationality	Indian.
Address	Visva-Bharati, 6/3, Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta 7.
5. Editor's Name	Sri Pulinbihari Sen.
Nationality	Indian.
Address	Visva-Bharati, 6/3, Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta 7.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one per cent of total capital.	Visva-Bharati University, P.O. Santiniketan.

I, Saradindu Bosè, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

SARADINDU BOSE
Signature of Publisher.

Date 30-3-60

বিশ্ব
ভারতী
পত্রিকা

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনপ্রিয়তা সম্প্রতি এমন আশাতীত রকমের বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সমালোচকেরা অনেকেই বিষয়টির দিকে নতুন করে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন অনুভব করছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মরা গাঙে আবার এই রকম একটা জোয়ারের জন্যে অনেকেই বোধ করি প্রস্তুত ছিলেন না। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে আমাদের ইতিহাস-চেতনাতেও কি হঠাৎ কোনো নতুন জোয়ার এসেছে— অতীত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বোধ বা উপলব্ধিতে কোনো নতুন বিপ্লব? তা যদি না এসে থাকে, তাহলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই সাম্প্রতিক জনসমাদরের কি অন্য কোনো গূঢ় তাৎপর্য আছে? এই রুচি-পরিবর্তনের মূল কতদূর গভীরে?

কেবল সাহিত্যের দিক থেকেই নয়, বাংলা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকেও এ প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের দৃষ্টি একটু অন্য দিকে, অন্য এক সংশ্লিষ্ট কিন্তু প্রাথমিক ধরণের প্রশ্নের দিকে। সাম্প্রতিক কালের এইসব ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসকে আমরা আদৌ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে' গ্রহণ করতে পারি কি? প্রশ্নটাকে অনায়াসে আর একটু পিছিয়ে দেওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কার ওই-জাতীয় উপন্যাসগুলিকেই কি যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে' আমরা অনায়াসে ঘোষণা করতে পারি? আরো গোড়ার প্রশ্ন: ঐতিহাসিক উপন্যাস কাকে বলব? কেন বলব?

ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা তত্ত্বগত দিকও আছে—সাহিত্যতত্ত্বগত দিক। সেই গোড়াকার প্রশ্নগুলো অমীমাংসিত থাকলে পরবর্তী অনেক জিজ্ঞাসারই সন্তোষজনক উত্তর মিলবে না। এখানে আমাদের দৃষ্টি সেই তত্ত্বের দিকে। সত্যিই কি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে' আলাদা-কিছু সম্ভব? যে উপন্যাস 'অনৈতিহাসিক', তার মধ্যেও কি যথার্থ ঐতিহাসিকতা থাকতে বাধ্য নয়?

ঐতিহাসিক উপন্যাসের 'ঐতিহাসিক' বিশেষণটি কি উপন্যাসের শ্রেণী বা গোত্রের চিহ্ন? এই শ্রেণীবিভাগ কি সাহিত্যগত বিভাগ? নামটি যখন বহুব্যবহৃত, তখন নিশ্চয়ই তার কোনো কার্যকারিতা আছে। সেই কার্যকারিতাকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু তা কি সাহিত্যিক কার্যকারিতা? 'ঐতিহাসিক' বিশেষণটি কি উপন্যাস-বিশেষের শিল্পরূপ বা রস-বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে উজ্জ্বল করে' তোলে?

'ঐতিহাসিক' কথাটার মধ্যে কি মোটেই কোনো বিশিষ্ট ইস্থেটিক তাৎপর্য নেই? কেবল বিষয়-বস্তু, ঘটনা, পাত্রপাত্রীর গুণেই ঐতিহাসিক? কত উপন্যাসে কত রকম বিষয়, কত রকম গল্প থাকে। তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন'এর নায়ক কবিরাজ, বিষয়ের অনেকটা জুড়ে কবিরাজী। মনোজ বসুর 'নিশি-কুটুম্ব'র নায়ক চোর, বিষয় চুরি। কই, 'আরোগ্য-নিকেতন'কে তো বলি না কবিরাজী উপন্যাস? 'নিশি-কুটুম্ব'কে তো বলি না চোরাই উপন্যাস?

আরো কথা আছে। উপন্যাসের গল্পের মাঝখানে হঠাৎ যখন ইতিহাসকে সাক্ষী মানা হয়, তখন

সেটা কেমন ইতিহাস? সে কি ইতিহাস, না ইতিহাসের ভগ্নাংশ? এমন প্রসঙ্গ-বিচ্যুত ভগ্নাংশ, এমন সাক্ষ্যপ্রমাণহীন ভগ্নাংশ, এমন পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ভগ্নাংশ, যে তাকে ইতিহাস বলতে আপত্তি হওয়া আশ্চর্য নয়। ঔপন্যাসিক কি ইতিহাস বলতে সেই জিনিসকেই বোঝেন, ঐতিহাসিকেরা নিজেরা যাকে ইতিহাস বলতে অকুণ্ঠিতচিত্তে সম্মত হবেন? কিংবা, আরো একটু গোড়ায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, ঐতিহাসিকেরাই কি ইতিহাস বলতে সকলে ঠিক ঠিক একই জিনিসকে বুঝে থাকেন? কার্লাইল যাকে ইতিহাস বলবেন, ঔপন্যাসিক টলস্টয় তাকে নিশ্চয়ই ইতিহাস বলবেন না, কিন্তু এইচ্. জি. ওয়েল্স্-ই কি তাকে ইতিহাস বলতে রাজি হবেন? টয়েন্‌বী যাকে ইতিহাস বলে মনে করেন, পিটার গেইল্ বা ট্রেভর-রোপার তাকে ইতিহাস বলতে সম্মত হবেন কি?

সম্মত হবেন না তা আমরা জানি। সুতরাং গোড়াতেই গোলমাল। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস কী' সে প্রশ্নের আগেই তাহলে 'ইতিহাস কী' এই প্রশ্নটাই এখন জরুরি হয়ে উঠছে।

২

প্রথমেই খটকা লাগে—উপন্যাসের মায়া-জগতে ইতিহাসের মতো কঠিন বাস্তব প্রবেশ করবে কোন পথ দিয়ে? এই দুই ভিন্ন জগতের মধ্যে যাতায়াতের সেতু কোথায়? এরিস্টটল বলেছিলেন, ইতিহাসের তথ্যগত সত্য হল বিশেষের সত্য। আর কাব্যাদির সত্য হল সম্ভাব্যতার সত্য—সাধারণ সত্য, দর্শন-জাতীয় সত্য। এরিস্টটলের মতে উপন্যাস-কাব্যাদির স্থান দর্শন ও ইতিহাসের মধ্যবর্তী। ইতিহাস থেকে এদের জাত উঁচু। উঁচু হোক আর না হোক, জাত যে একেবারেই ~~ইতিহাস~~ তাতে সন্দেহ নেই। এত ভিন্ন যে তথ্যগত সত্যকেই যদি সত্য বলি, তাহলে একে যে কী বলব সে এক সমস্যা। অনেকেই একে সত্য নাম দিতে কুণ্ঠিত হবেন। এখন প্রশ্ন এই, যারা এতই ভিন্ন, তারা মিলবে কী উপায়ে? ইতিহাসের সেটা কী বস্তু, ঔপন্যাসিক যাকে নিতে পারেন? নিতে পারেন মাত্র পাঠক হিসেবে নয়, ঔপন্যাসিক হিসেবে, আর্টিস্ট হিসেবে? অ-লৌকিকের স্রষ্টা হিসেবে? ঘটনার সুপ্রত্যক্ষ সত্যকে পরিত্যাগ করে, সম্ভাব্যতার স্বপ্নলোকে যিনি প্রতীকী সত্যের অনুসরণ করে' ফেরেন, ইতিহাস তাকে কীসের টানে টানবে? 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে'—এই কথা বলে' যিনি অ-ঘটনের মায়া-জগতে পথে-বিপথে ঘুরে ফেরেন, ইতিহাসের কাছে তিনি কী পেতে পারেন?

ঘটে যা তা সব সত্য—ইতিহাস এই কথাই বলে। যা ঘটেছে তাই হল ইতিহাস। কথাটার ব্যুৎপত্তিও সেই অর্থেরই ইঙ্গিত করে, লোক-প্রসিদ্ধিও সেই কথাই বলে। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ইতিহাসকে বলা হয়েছে—বেদ। এ কথার গুরুত্ব কম নয়। বেদই তো সব থেকে বড় জ্ঞান। বুঝতে পারি, ইতিহাস জিনিসটা যে জ্ঞানাত্মক, এটা সর্ববাদিসম্মত। ঐতিহাসিক হলেন জ্ঞান-তপস্বী। ইতিহাস-পাঠক সত্যসন্ধানী।

কিন্তু উপন্যাস? যা ঘটে নি, যা বানানো গল্প, উপন্যাস হল তাই। যা ছিল না, যা নেই, উপন্যাস তাই। দেশে কালে কখনো কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেই তার নাম উপন্যাস—মিথ্যা। উপন্যাস কথাটার এ অর্থ সুচিরপ্রসিদ্ধ। মিথ্যা, কিন্তু সুন্দর মিথ্যা।

নাটকাদির কাজ যে আনন্দ দেওয়া আর ইতিহাসের কাজ যে উপদেশ দেওয়া, সাংসারিক জ্ঞান

উৎপন্ন করা, এ কথা আমাদের দেশেও নতুন নয়। দশরূপকের রচয়িতা ধনঞ্জয় কথাটি বেশ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে গেছেন। বলেছেন, নাটকাদির কাছে জ্ঞান চেয়ো না। তিনি অবশ্য উপন্যাস জিনিসটা দেখে যান নি। দেখলে নিশ্চয়ই বলতেন, উপন্যাসের মতো আনন্দ-নিষ্যন্দী জিনিসের কাছে আর যাই চাও না কেন, ইতিহাসের কাছে যা চাইবার তা চেয়ো না। যদি জ্ঞানই চাও তো উপন্যাসের কাছে যেয়ো না, ইতিহাসের কাছে যাও।

ঔপন্যাসিক মোটেই জ্ঞান-তপস্বী নন। তাঁর তপস্যা একেবারেই অন্যরকম। সত্য বলতে সাধারণত যা বুঝি, বিজ্ঞান ইতিহাস ইত্যাদির কাছে আমরা যা চাই এবং যা পাই, উপন্যাসের কাছে আমরা তা চাইও না, পাইও না। উপন্যাসের আসল লক্ষ্য আনন্দ। এমনও বলতে পারি যে, মিথ্যার আনন্দ।

ইতিহাস আর উপন্যাসের মিলন যেন সত্য আর মিথ্যার মিলন। এই রকম সত্য আর মিথ্যার মিলনেরই আর-এক নাম— অর্ধসত্য। অর্ধসত্য জিনিসটা কাজে যা-ই হোক না কেন, কথাটা কিন্তু শুনতে মোটেই ভাল নয়। তার কারণ, অর্ধসত্য কোনো কোনো সময় পরিপূর্ণ মিথ্যার থেকেও মারাত্মক। আমরা সব সময়ই তাকে বিপজ্জনক মনে করি।

কিন্তু সব সময় সব অর্ধসত্যই যে সমান বিপজ্জনক তা নয়। যখন আমরা সত্যকে খুঁজি এবং ভুল করে' অর্ধসত্যকে পূর্ণসত্য মনে করি, তখন অর্ধসত্য বিপজ্জনক সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন সত্যকে খুঁজি না, কিংবা যখন মিথ্যাকে মিথ্যা বলেই জানি তখন তার মধ্যে কোনো বিপদ নেই। যে-মিথ্যা সত্যের ভান নয়, ছলনা নয়, যার কাজ আনন্দ দেওয়া, সে কতটুকু সত্য আর কতখানি বা মিথ্যা সে জিজ্ঞাসাই অবান্তর। যে-অর্ধসত্য সত্যকে দেবার ভান করে তার সত্যতা অবশ্যই যাচাইযোগ্য। ইতিহাস আর উপন্যাসের মিলনে যে-অর্ধসত্য, তার কাছে আমরা কী চাই ?

ইতিহাসের কাছে আমরা প্রথমত ও প্রধানত সত্যকে চাই। উপন্যাসের কাছে আনন্দকে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাছে ? সত্য, না আনন্দ ? যদি সত্যকে চাই, তাহলে ঐতিহাসিক উপন্যাস ছলনা। যদি আনন্দকে চাই ? তাহলে হয়তো তার ঐতিহাসিকতটাই একটা মায়া।

যদি বলি, ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাছে আমরা ইতিহাসের সত্য এবং উপন্যাসের আনন্দ দুই-ই চাই ? এ কথার জবাব দেওয়া কঠিন। কারণ সত্যিই হয়তো সত্য এবং আনন্দ দুই-ই আমরা চাই। এমন ভাবে চাই যে, একের থেকে অপরকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু সে কি শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাসের বেলাতেই ? শুধু কি উপন্যাসেই, না সমস্ত সাহিত্যেই ? সেই যে রবীন্দ্রনাথের নায়িকা বাঁশরি বলেছিল, "সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য," তার এ কথাটাকে যদি যথার্থ বলে' মানি, তাহলে একা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেই বা মানব কেন, অন্য উপন্যাসের ক্ষেত্রেও মানব— সমস্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রেই মানব।

বরং উল্টো একটা প্রশ্ন করব। ইতিহাসের সত্য রসাত্মক হওয়ার পরেও কি ঠিক ঠিক ইতিহাসের সত্যই থাকে ? যে সত্য কল্পনার সঙ্গে রফা করে— শুধু রফা নয়, যে সত্য কল্পনার নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয় সে আবার কেমন ইতিহাসের সত্য ?

ইতিহাস কী, এই প্রশ্নের উত্তর এখনো অপেক্ষা করে আছে। প্রথমেই বলে রাখি, এখানে আমরা ইতিহাসের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করব না। আমরা শুধু প্রয়োগটাই দেখতে চাই। ইতিহাস কথাটি কোথায় কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কোন্ প্রয়োগের প্রসঙ্গ-ক্ষেত্র কী, এখানে এইটেই আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

কথাটির দুটো স্বতন্ত্র প্রয়োগকে প্রথমেই আলাদা করে নেওয়া দরকার। ইতিহাস কথাটার একটা অর্থ হল অতীত, বা অতীতের ঘটনা। অথবা বলি, অতীতের ঘটনাপ্রবাহ। যা কিছু ঘটে গিয়েছে তার মহাসমগ্রতা।

ইতিহাসের অপর অর্থ হল অতীতের জ্ঞান, অতীত-ঘটনার জ্ঞান— অতীতের স্মৃতি, অতীতের চিন্তা। অতীতের সম্পর্কে প্রশ্ন, অনুসন্ধান এবং সংবাদ সংগ্রহ। সাক্ষ্য-সংগ্রহ, প্রমাণ-প্রয়োগ, তথ্য-বিচার। নতুন তথ্যকে পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে অন্বিত করা। অতীতের পুনর্গঠন। অতীতের পুনর্গঠিত চিত্রকে পুস্তকাকারে পরিবেশন। এই দ্বিতীয় অর্থে ইতিহাস হল— ইতিহাস-চিন্তা, ইতিবৃত্তকথা, ইতিহাসের বই। অর্থাৎ ইতিহাস-শাস্ত্র।

এই দুটো অর্থের কোনোটাই অসঙ্গত নয়। কিন্তু দুটোর প্রয়োগ-ক্ষেত্র যে পৃথক্ সে কথা স্মরণ রাখতে হবে। বস্তু এবং সেই বস্তুর সম্পর্কে ধারণা যেমন আলাদা, ঘটনা এবং সেই ঘটনার বর্ণনা যেমন আলাদা, প্রথম অর্থের ইতিহাস এবং দ্বিতীয় অর্থের ইতিহাস তেমনি আলাদা।

প্রথম অর্থে যে ইতিহাস, সে যেন মহাকালেরই বিরাট প্রবাহ। আমাদের জীবন আমাদের মরণ সবই এই মহাপ্রবাহের অন্তর্গত: আমরা সকলেই ইতিহাস-সন্ততি। এ ইতিহাস নির্বিকার, অমোঘ এবং অনাদ্যন্ত। এ যেন সত্যেরই গতিশীল রূপ— রিয়ালিটিরই চলৎ-মূর্তি। একে সম্বোধন করেই কবি বলেছেন, 'হে বিরাট নদী'। বলেছেন, 'অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি'।

এই অর্থে যে ইতিহাস, তার থেকে ইতিহাসবিদ্যা বা ইতিহাস-শাস্ত্র অনেক দূরের বস্তু। শুধু দূরের নয়, আলাদা জাতের। প্রথমটা যদি হয় জ্যান্ত আগুন, তাহলে দ্বিতীয়টি হল শীতল ভস্ম-সংবাদ।

এই দ্বিতীয় অর্থের ইতিহাসই— অর্থাৎ ইতিহাসবিদ্যাই আমাদের প্রতিদিনের আলোচনার সচরাচর-ব্যবহৃত ইতিহাস কথাটির সাধারণ অর্থ। এ ইতিহাস আমাদের জ্ঞান-জগতের অঙ্গ। এ ইতিহাস প্রতিনিয়তই রচিত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে পরিবর্ধিত হচ্ছে। এই অর্থকে যখন গ্রহণ করি, তখন আগের অর্থের ইতিহাস আর মোটেই যথার্থ ইতিহাস নয়, তা হল ইতিহাসের কাঁচা মাল। বলতে পারি, কাঁচা মালের আকর।

এই যে দ্বিতীয় অর্থের ইতিহাস, যার সঙ্গে আমরা মাঝে মাঝে উপন্যাসকে মিলতে দেখি, তা আর কিছুই নয়, তা হল সাক্ষ্যপ্রমাণসংবলিত নির্বাচিত তথ্যপুঞ্জের সমাবেশ: সুগ্রথিত এবং সুগঠিত অতীত-সংবাদ। পরীক্ষিত এবং পরীক্ষণ-যোগ্য বাক্য দিয়ে, সুস্পষ্ট এবং বাচ্যার্থ-সর্বস্ব বাক্য দিয়ে রচিত নিরাবেগ, নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ। সেই যে কবি যাকে বলেছেন বিরাট নদী, রিয়ালিটির মহাপ্রবাহ, সেই মহাপ্রবাহের এক বিন্দু জলকণাও এর মধ্যে নেই। জলের আস্বাদও নেই। এ কেবল নির্বাচিত জলকণাসমূহ সম্পর্কে তথ্যপ্রমাণসংবলিত বিশুষ্ক বিবৃতি।

ইতিহাসে মিলবে জলের তথ্য। সাহিত্যে উপন্যাসে জলের আস্বাদ। কথাটা হচ্ছে এই যে, ইতিহাস আর সাহিত্য দু'য়েরই উৎস এক জায়গায়। তার নাম রিয়ালিটি। ইচ্ছা করলে তাকে আমরা জীবনও বলতে পারি। ইতিহাসে তার সংবাদ, উপন্যাসে তার আস্বাদ। এর একটির লক্ষ্য জ্ঞান, অপরটির লক্ষ্য রস। ইতিহাসে আর উপন্যাসে যে যোগসূত্র সে হল জীবন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের এর থেকে বাড়তি আর কোনো যোগসূত্র আছে কি? তা নেই।

ইতিহাস কি কেবলই তথ্য? পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত— কিন্তু একান্তভাবেই অর্থহীন তথ্য? এমন তথ্য যার সম্বন্ধ-সমবায় নেই? যার কোনো পূর্বও নেই, পরও নেই? যা স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ? এমন তথ্য যা সম্পূর্ণভাবে গুরুলঘুভেদাভেদবর্জিত? এমন তথ্য যাকে মানবিক মূল্যবোধ আদৌ স্পর্শ করতে পারে না?

এ কথা অনেকেই স্বীকার করবেন না। বিশেষত যাঁরা ইতিহাস-ব্যাপারে একটু অনাধুনিক। তাঁরা বলবেন, ইতিহাসে তথ্য আছে বটে, কিন্তু তথ্যটাই তার সব নয়। ইতিহাস হল তথ্য এবং তার ব্যাখ্যা। কেউ কেউ হয়তো আর-একটু এগিয়ে গিয়ে বলবেন, তথ্যটা কাঁচা মাল, ব্যাখ্যাটাই আসল ইতিহাস।

কিন্তু ব্যাখ্যাকে একবার ইতিহাসে ঢুকতে দিলে সেই সূত্রে একাধিক গোলমালের পথ করে দেওয়া হয়। প্রথমত, ব্যাখ্যা জিনিসটা, অন্তত কিছু পরিমাণে, ব্যক্তিগত বিচার-সাপেক্ষ এবং ব্যক্তিগত বিচার ব্যক্তিগত তাৎপর্যবোধ-সাপেক্ষ— অর্থাৎ মূল্যবোধ-সাপেক্ষ। ব্যাখ্যাকে ঢুকতে দেওয়া মানেই ফ্যাক্টের রাজ্যে ভ্যালু-কে ঢুকতে দেওয়া।

তা ছাড়া, ব্যাখ্যাকে একবার ঢুকতে দিলে থামানো কঠিন। কোন্‌খানে তার সীমানা? কোনো ব্যাখ্যাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ব্যাখ্যার অর্থই যেখানে সংযোগ, এবং সংযোগের যেখানে শেষ নেই, সেখানে ব্যাখ্যাকে স্বীকার করে নেবার অর্থই হল তথ্যের বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার না করা, তার সীমারেখাগুলিকে মুছে তাকে বৃহৎ একটা অখণ্ড ঐক্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। এর স্বাভাবিক পরিণতি ইতিহাসকে মহা-ইতিহাস রূপে দেখা। বিশ্বইতিহাসতত্ত্বই তখন ইতিহাসের স্থান অধিকার করে বসে।

নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবীকে একটি সুবৃহৎ অর্থের সূত্রে গেঁথে নেওয়া, এর জন্যে যেরকম সরল বিশ্বাস এবং দুঃসাহসী কল্পনার প্রয়োজন হয়, আধুনিক কালে তা সহজলভ্য নয়। আধুনিক জীবনও বোধ করি এর অনুকূল নয়। বেশির ভাগ আধুনিক ঐতিহাসিক একে ঐতিহাসিকের কাজ বলে স্বীকার করবেন না। তাঁরা বলবেন, ইতিহাস তত্ত্বকথাও নয়, কল্পনার ঘোড়দৌড়ও নয়। ইতিহাসে ব্যাখ্যা যদি আদৌ স্থান পায় তো সে ব্যাখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বাস্তব-কাযকারণের ব্যাখ্যা। ইতিহাসের অর্থ, ইতিহাসের অভিপ্রায়, তার গতির ছন্দ— এ সব আলোচনার স্থান ইতিহাসবিদ্যার অঙ্গন নয়। এর যথাযোগ্য স্থান হল ইতিহাসের দর্শন। তাও আধুনিক অর্থে নয়। পুরানো অর্থে।

ইতিহাস-দর্শন কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। ইতিহাস কথাটির যেমন দুটো অর্থ, ইতিহাসের দর্শন বা ইতিহাস-দর্শন কথাটারও তাই। একটা প্রয়োগ পুরানো। ইতিহাসের ঘটনা-প্রবাহের

সামগ্রিক ভাবে কোনো অর্থ আছে কি না, তার গতিতে কোনো ছন্দ বা প্যাটার্ন আছে কি না, তার সামনে এমন কোনো লক্ষ্য আছে কি না যার অভিমুখে তার অগ্রগতি, অথবা তার পিছনে এমন কোনো ঠেলা আছে কি না যাকে ইতিহাসের কারয়িত্রী শক্তি বলে গণ্য করা যায়, এই সব অনুসন্ধানই এতাবৎ কাল ইতিহাসের দর্শন বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। ভিকো এবং কাণ্ট, হার্ডার এবং হেগেল, যাঁরাই সেকালে ইতিহাসের দর্শন নিয়ে কথা বলেছেন, তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর এই একই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ইতিহাস-দর্শন কথাটার দ্বিতীয় অর্থ অনেক আধুনিক। ইতিহাস যদি হয় অতীত-সংবাদের অনুসন্ধান, অতীত সম্পর্কিত তথ্যের পরীক্ষণ ও প্রমাণ, অতীতের পুনর্গঠন, তাহলে ইতিহাসের দর্শন হল ইতিহাসে-ব্যবহৃত এই প্রক্রিয়াগুলির—এই অনুসন্ধান প্রমাণ পুনর্গঠন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা বিচার। এক কথায়, ইতিহাসের পদ্ধতি বা কর্ম-প্রণালীর বিশ্লেষণ ও বিচার। বিজ্ঞানের দর্শন যেমন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক নয়, বিজ্ঞানের সন্ধান-পদ্ধতির অনুসন্ধান—সন্ধান-পদ্ধতির বিচার, এও ঠিক তেমনি। এই ইতিহাস-দর্শন—যাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল ইতিহাস-দর্শন—এর কাজ ইতিহাসের সিদ্ধান্তের আলোচনা নয়, এর কাজ ইতিহাসবিদ্যার সন্ধান-পদ্ধতির—মেথডলজির সম্পর্কে অনুসন্ধান।

এ পর্যন্ত আমরা দু রকম ইতিহাসের সাক্ষাৎ পেলাম, অতীত আর অতীত-বিদ্যা। তেমনি দু রকম ইতিহাস-দর্শনেরও সাক্ষাৎ পেলাম, অতীতের অর্থ-নিরূপণ—যাকে বলা হয়েছে স্পেকুলেটিভ ইতিহাস-দর্শন, আর অতীতবিদ্যার পদ্ধতি-সমীক্ষণ অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল ইতিহাস-দর্শন। এই বারে আমরা আবার আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে আসতে পারি। এই দুই ইতিহাস আর এই দুই ইতিহাস-দর্শন, এর কোন্‌টার সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাস কী ভাবে যুক্ত।

উপন্যাস নিজেই তো ঘটনা-প্রবাহ নয়, নিজেই জীবন নয়, উপন্যাস হল জীবনের কল্পনাত্মক রূপায়ণ। তাহলে ঐতিহাসিক উপন্যাস হল অতীত ঘটনা-প্রবাহের—অতীত জীবনের কল্পনাত্মক রূপায়ণ। ঔপন্যাসিক যখন জীবনকে রূপায়িত করেন কল্পনার সাহায্যে, তখন তাঁর আদর্শকে তিনি কোথায় পান? বলা বাহুল্য, আপন অভিজ্ঞতায়, আপন উপলব্ধিতে, আপন জীবনদৃষ্টিতে। এক কথায় বলতে পারি, জীবনে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে? জীবনে, না ইতিহাসের পুঁথিপত্রে?

সাধারণত আমরা ধরে নিই যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিকতার অংশটুকুকে লেখক নিজের স্মৃতি বা নিজের অভিজ্ঞতাতে পান না, পান ইতিহাসে। অর্থাৎ ইতিহাসের গ্রন্থে। এ কথার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য যদি কিছু থাকে, তাহলে সেইটুকুর জন্যে লেখকের সাক্ষাৎ উত্তমর্ণ জীবন নয়, ইতিহাসের বই।

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে খানিকটা আছে ঐতিহাসিক সত্য আর খানিকটা আছে কল্পনা। সাধারণ উপন্যাসে সবটাই কল্পনা—সবটাই লেখকের সাক্ষাৎ জীবন-উপলব্ধি। কিন্তু এ কথা যদি পুরোপুরি ঠিক হয়, তাহলে মানতেই হবে যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রন্থগত সত্যের লোভে জীবনগত সত্যের প্রতি অমনোযোগী হয়েছে। এ কথা কতদূর ঠিক সেইটেই আসল প্রশ্ন।

কারণ এমন খুবই হতে পারে যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস কয়েকটা নাম আর তারিখ ছাড়া ইতিহাসের কাছ থেকে আর কিছুই নেয় না। অন্তত যাকে আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলে জানি—তথ্যগত সত্য,

তা মোটেই নেয় না, নেওয়ার ভান করে মাত্র। ইতিহাসের কাছ থেকে কিছু-একটা হয়তো নেয়, কিন্তু তা এমন বস্তু যা কল্পনার সঙ্গে বেমালুম মিলে যায়, যা নিজেই কল্পনাপুষ্ট। যা লেখকের নিজস্ব জীবনদৃষ্টির সঙ্গে এক হয়ে যায়। হয়তো তার নাম অর্থ, হয়তো তার নাম ভ্যালু।

ইতিহাস যদি তা না দিতে পারে? প্রচলিত অর্থে যে ইতিহাস সে যদি না দিতে পারে, অন্য কোনো ইতিহাস দেয়। কোনো ইতিহাসই যদি না দেয়, তো আর কেউ দেয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উপন্যাস আর ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, অন্য কিছু।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রোমান্সের কথাও উঠতে পারে। তবে আমাদের বর্তমান আলোচনার দিক থেকে এদের আমরা মোটামুটি অভিন্ন অর্থেই গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু আর-একটা জিনিস আছে যা অনেক দিক থেকে ঐতিহাসিক রোমান্সের ঠিক উল্টো। তার কথাটা এখানে বলা দরকার। সে জিনিসটা হল, যাকে বলা হয়— 'রোমান্টিক ইতিহাস'। ঐতিহাসিক উপন্যাস আসলে উপন্যাস, কিন্তু তার একটা বাড়্‌তি দাবিও আছে যে সে ইতিহাস-সমর্থিত। রোমান্টিক ইতিহাসের দাবি যে সে ইতিহাস। কিন্তু আসলে সে রোমান্স-স্বভাবসম্পন্ন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস কী নয় তা ভালো করে বুঝতে হলে এই রোমান্স-স্বভাবী কিন্তু ইতিহাস-নামে-পরিচিত বস্তুটির সঙ্গে একটু পরিচয় করে নেওয়া দরকার।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক কখনো কখনো সুলিখিত ইতিহাসের বিরুদ্ধে— বিশেষ করে সাহিত্য-গুণসম্পন্ন ইতিহাসের বিরুদ্ধে সন্দেহ এবং আক্রোশ প্রকাশ করে থাকেন। এটা অবশ্য অক্ষমতাসঞ্জাত। ইতিহাসরচনায় সাহিত্যগুণের সঞ্চার দোষের কথা নয়, গুণেরই কথা। কিছু পরিমাণে এই গুণ ইতিহাস-রচনায় অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। সীমা লঙ্ঘন করলে তা দোষ। বিশেষ করে সেই সীমা-লঙ্ঘন যদি কোনো গূঢ় প্রবৃত্তির তাড়নায় ঘটে থাকে।

এই সীমার কথা স্মরণ করেই 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গে 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা আর কাল্পনিকতার মধ্যে একটা স্পষ্ট ভেদ নির্দেশ করেছিলেন। কাল্পনিকতার পিছনে অনেক সময় গোপন কামনার প্রশ্রয় ক্রিয়া করে। রোমান্সধর্মী ইতিহাসে কাল্পনিকতার আকর্ষণ প্রবল।

ইতিহাসরচনায় প্রশংসনীয় কল্পনা-কুশলতা এবং নিন্দনীয় কাল্পনিকতা এ দুই বস্তু চরিত্রধর্মে প্রায় বিপরীত হলেও কোনো কোনো সময় পরস্পরের খুব কাছাকাছিই বিরাজ করে। গত শতাব্দীতে রোমান্টিক ঐতিহাসিকদের রচনায় এই দুই বস্তুই— এই গুণ এবং এই দোষ দুই-ই— প্রচুর পরিমাণে লক্ষ করা যাবে। অনেক সময় একই লেখকের রচনার মধ্যেও। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে আমরা কার্লাইলের কথা উল্লেখ করতে পারি। কার্লাইলের সাহিত্যগুণ সর্বজন-প্রশংসিত। তাঁর রচনায় আশ্চর্য কল্পনাশক্তির পরিচয় আছে। কিন্তু কাল্পনিকতার প্রশ্রয়ও সেখানে সম্পূর্ণ অলক্ষ্য নয়। মেকলে, যিনি বর্ণনাশক্তির গুণে 'ইতিহাসের রুবেন্স' আখ্যা অর্জন করেছেন, তাঁর সম্পর্কেও যে এ অভিযোগ একেবারে খাটে না তা নয়।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতকের রোমান্টিক ঐতিহাসিকদের সাফল্য অসামান্য। অষ্টাদশ শতকের তথ্য-দীন এবং কল্পনা-রিক্ত ইতিহাস-চেষ্টার পরে, এঁদের নানা দিক থেকে সার্থক ইতিহাস-

সাধনার দিকে আমাদের আরো বেশি করে দৃষ্টি পড়ে। আমাদের বর্তমান ইতিহাসমুখিতা যে অনেকখানি পরিমাণে রোমান্টিক ঐতিহাসিকদের দান, এ কথাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই রোমান্টিকতার মধ্যেই যে একটা দুর্বলতার বীজ আছে তাও স্বীকার করে' নিতে হবে। তাছাড়া, অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসসাধনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার যে-প্রবণতা রোমান্টিসিস্ট ঐতিহাসিকদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, তার মধ্যেও গুপ্ত ইচ্ছার তাড়না আছে। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্র থেকে এন্‌লাইটেন্‌মেণ্টের পর্বকে কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভল্‌তেয়ার, হিউম্‌ বা গিবনের যুগকে 'ইতিহাসবিমুখ যুগ' বলে আখ্যা দেওয়াটা যে নিরপেক্ষ মনের নির্দোষ সিদ্ধান্ত নয়, এ কথা মানতেই হবে।

আসলে, দুই যুগের ইতিহাস-চেতনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা লক্ষ করবার মতো। এই পার্থক্যের মধ্যেই রোমান্টিক ঐতিহাসিকদের শক্তি, আবার এইখানেই তাঁদের দুর্বলতা। সকলের নয়, সব সময়ও নয়। কিন্তু দুর্বলতার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। এবং এইখানেই—এই দুর্বলতার মধ্যেই রোমান্সধর্মী ইতিহাসের উদ্‌ভব।

অষ্টাদশ শতকের এন্‌লাইটেন্‌মেণ্টের সমস্ত জ্ঞানচর্চার মধ্যেই একটা ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ইতিহাসের জন্যেই ইতিহাস, ঠিক এই জাতীয় অনাসক্ত জিজ্ঞাসা সেকালের ইতিহাস-সাধকদের মনে স্থান পায় নি। সেদিনের জীবন-সাধকেরা ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ততটা অতীতের আকর্ষণে নয়, যতটা তাঁদের বর্তমানের প্রয়োজনে—বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথনির্দেশের অভিপ্রায়ে।[১]

অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস-সাধনায় যেমন শুষ্ক ব্যবহারিক বুদ্ধির আধিপত্য, রোমান্টিক যুগে তেমনি আর্দ্র আবেগের। অষ্টাদশ শতকের মনের কথা যেমন বর্তমানের জন্যে অতীত, উনবিংশ শতকের হল অতীতের জন্যেই অতীত—বর্তমানকে অস্বীকার করবার জন্যেই অতীত। অষ্টাদশ শতকের বিবেচনায় ইতিহাস হল বিশ্ব-ইতিহাস, ইতিহাসচর্চা হল সর্বমানবের কল্যাণ-সাধনা। আর উনবিংশ শতকের? সচেতন চেষ্টা আর অবচেতন উৎকণ্ঠায় তা এত জটিল যে এখানে তার মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তবে মোটামুটি ভাবে এইটুকু আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি যে, এন্‌লাইটেন্‌মেণ্টের ইতিহাস-সাধনা সে যুগের বুদ্ধিবাদ ও মানবিকতার সাধনারই অঙ্গ—রেনেশাঁসের উত্তরাধিকার। আর রোমান্টিক ইতিহাস-সাধনা অনেক দিক থেকে তার পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি। বলতে পারি, ন্যাশানালিজম্‌-ভাবনার অঙ্গ।

উনবিংশ শতকের ইতিহাসচর্চার শক্তির দিকটাকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করব। আগের যুগের ইতিহাস-চিন্তার কল্পনা-বিমুখতা ও সংকীর্ণ বুদ্ধিবাদের[২] বিরুদ্ধে, তার আত্মতৃপ্ত অতি-নিশ্চয়তা ও যান্ত্রিকতার ভাবের বিরুদ্ধে রোমান্টিসিস্ট বিদ্রোহ যে একটি বাঞ্ছিত মুক্তির স্বাদ এনেছে তাতে সন্দেহ নেই।

---

১. মন্তব্যটি সাধারণ ভাবেই গ্রহণীয়। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমও নজরে পড়বে। অষ্টাদশ শতকের একেবারে প্রথম দিকেই ভিকো ইতিহাস চর্চায় এই রকম ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে—এই রেনেশাঁসী উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন।

২. ১৮শ শতকের ঐতিহাসিকদের সকলেই যে সমপরিমাণে বুদ্ধিবাদী ছিলেন এমন বলা চলে না। এখানে মন্তেস্‌কিউ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তিনি স্পষ্টতই বুদ্ধি সম্পর্কে সন্দিগ্ধ। হিউম্‌-ও বুদ্ধিবাদী নন। তাঁর আস্থা Common sense-এ।

অবহেলিত মধ্যযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে রোমান্টিক ঐতিহাসিকেরা এই মুক্তিরই আর-একটা নতুন দরজা খুলে দিয়েছেন। এইখানেই শেষ নয়। ইতিহাস-অনুসন্ধানে ভাষাতত্ত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করা, লোকসংস্কৃতির মূল্য অনুধাবন করা, জাতীয় জীবনপ্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার প্রতি মনোযোগী হওয়া, এর প্রত্যেকটিই ইতিহাসচিন্তার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

রোমান্টিক ইতিহাস-সাধনার এইসব মূল্যবান্ দানের কথা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করব। সেই সঙ্গে এই সত্যটাও স্বীকার করব যে, অধিকাংশ সময়ই এর প্রত্যেকটির মধ্যেই একটু বাড়াবাড়ির ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ ঝোঁকটা অর্থপূর্ণ। একটু সুযোগ পেলেই তার চেহারা পালটে যায়। তখন বাঁধাবুলি মুখর হয়ে ওঠে, ফাঁকা কথার ধূম্রজাল ঘন হয়, ক্ষেত্র-বিশেষে মূঢ়তা প্রশ্রয় পেয়ে obscurantism-এর পথ মসৃণ করে দেয়। পরিণামের এই চেহারা দেখে সহজেই সন্দেহ হয় যে, রোমান্টিক ইতিহাস-চিন্তার বুকের মধ্যেই এমন একটা অন্ধকার শক্তি লুকানো আছে যার গতি রসাতলের দিকে।

৬

র‍্যাঙ্কে থেকে মম্‌সেন্, মেকলে থেকে অ্যাক্‌টন্, ঊনবিংশ শতকের সকল ঐতিহাসিককেই সমানভাবে অভিযুক্ত করা বা সকলকেই একই চিহ্নে সমভাবে চিহ্নিত করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য বিশেষভাবে সেই দুর্বলতাগুলি যা রোমান্স-ধর্মী ইতিহাসের বিশিষ্ট লক্ষণ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতিহাসচর্চা যেখানে জাতির গোষ্ঠীর বা ব্যক্তির অতৃপ্ত কামনার ছদ্ম পরিতৃপ্তির অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

ঊনবিংশ শতকীয় ইতিহাস-চিন্তায় প্রধান বিশেষত্বগুলির দিকে যদি স্থিরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে তার মধ্যেই আমরা এই ইচ্ছাপূরণ-তন্ত্রের কলা-কৌশলের কিছু আভাস পেতে পারব। এগুলো যে সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে উপস্থিত তা নয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতকের মেজাজের সঙ্গে এদের যোগ আছে। পূর্ণ তালিকার এখানে আবশ্যক নেই, নমুনা হিসেবে কয়েকটির উল্লেখ করছি মাত্র।

যেমন, প্রথমত, কল্পনাধিক্যের ফলে অতিরঞ্জনপ্রবণতা। দ্বিতীয়ত, ঘটনার চাকচিক্যের প্রতি, বর্ণাঢ্যতার প্রতি টানের ফলে বহিরঙ্গে মনোযোগ এবং বিরল-বর্ণ সত্যের প্রতি অবহেলা। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অপর এক লক্ষণ হল—নাটকীয়তার প্রতি আকর্ষণ, ইতিহাসকে নাট্যপরম্পরারূপে দেখার চেষ্টা। এর স্বাভাবিক ফল অগভীরতা। ব্যক্তিগত নাটকের উপর অতিরিক্ত জোর দিলে সমষ্টিগত নাটক— সামাজিক শক্তি-সংঘর্ষের নাটক ঢাকা পড়ে যায়; বাইরের নাটক রঙীন হয়ে ফুটে ওঠে, ভিতরের নাটক হারিয়ে যায়। এইভাবে উপরের স্তরের হালকা তথ্যগত নাটকীয়তায় মুগ্ধ হয়ে রোমান্টিক ঐতিহাসিকেরা অনেক সময় অর্থের নাটকীয়তাকে— গভীরতর নাটকীয়তাকে অবহেলা করেছেন।[৩]

---

৩. এই অগভীরতার প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে মেকলের কথা তুলতে পারি। ঊনবিংশ শতকের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক -বিষয়ক গ্রন্থে জি. পি. গুচ্, মেকলের রচনাশক্তির প্রভূত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে শেষকথা যা বলেছেন তা মারাত্মক :

আর-একটা বড় বিশেষত্ব হল বিশিষ্টের প্রতি পক্ষপাত, সাধারণের অবহেলা। এই যে অসামান্যের প্রতি আকর্ষণ, ব্যতিক্রমের প্রতি পক্ষপাতে নিয়মের প্রতি অবহেলা, এর সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত বিশেষত্বগুলির যোগ খুব সুদূর নয়। এই প্রবণতা থেকেই ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা অতিরিক্ত গুরুত্ব পায়, ইতিহাস হয়ে ওঠে অসামান্যের শক্তিলীলা। এই অতিমানব বা মহানায়ক -ভিত্তিক ইতিহাসচিন্তাই ইতিহাসকে জীবনী-পরম্পরায় পরিণত করে এবং ইতিহাস শেষ পর্যন্ত জীবনী-সাহিত্যের রূপ পায়।

জাতি-বিশেষের স্বকীয়তার প্রতি— জাতীয় বিশেষত্বের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ, তাকে চরম ও চূড়ান্ত জ্ঞান করা, এও উনবিংশ শতকীয় ইতিহাসচিন্তার অন্যতম প্রধান একটি বিশিষ্টতা। এ হল, 'জাতীয় আত্মা'র অনন্যতা ও নিত্যতায় বিশ্বাস এবং ইতিহাসকে সেই 'জাতীয় আত্মা'র রহস্যময় লীলারূপে গণ্য করা। এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত— মনগড়া জাতিতত্ত্বে আস্থা, জাতিবিশেষের চিরন্তন শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস। এক কথায়, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী।[8]

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, এই বিশেষত্বগুলি, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এরা যতই নিরীহ-দর্শন হোক-না কেন, সীমা ছাড়ালে এর প্রত্যেকটি কোনো-না-কোনো রকম অতৃপ্ত ক্ষুধার অভিব্যক্তি, তা সে জাতিগতই হোক, গোষ্ঠীগতই হোক আর ব্যক্তিগতই হোক। স্বল্পতম প্রশ্রয়েই যে এরা সীমা ছাড়ায় তারও নিদর্শন আমরা কম দেখি নি। অতৃপ্ত কামনার ছদ্মবেশী গুপ্তচরেরা সুযোগ পেলেই যেমন করে স্বাভাবিক বাস্তববোধকে ঘুলিয়ে দেয়, অতৃপ্ত কামনার ছদ্মবেশী এই ইতিহাসও ঠিক তাই করে। এ'কে ইতিহাস-জাতীয় বস্তু না বলে 'মিথ্'-জাতীয় বস্তু বললে খুব ভুল হয় না।

এই যে রোমান্টিক বা রোমান্সধর্মী ইতিহাস, এর সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আপাতদৃষ্টিতে একটা বড় মিল নজরে পড়বে। দুয়ের মধ্যেই ঘটনা আর কল্পনার মাখামাখি, দুয়েতেই সত্য আর মিথ্যার মিশ্রণ। কিন্তু মৌলিক তফাতটাও লক্ষ করবার মতো। ঐতিহাসিক উপন্যাসে মিথ্যা যদি থেকে থাকে তো ছলনা করবার জন্যে নেই, সত্যের ভান করবার জন্যে নেই। ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে মিথ্যা আছে, সে মিথ্যা সব উপন্যাসেই আছে। এ হল সেই মিথ্যা যা আর্টের। সেই মিথ্যা যা সত্যকে আবৃত করে না, প্রকাশই করে। রোমান্সধর্মী ইতিহাসে এরকম মুক্ত মিথ্যার লীলা নেই। সেখানে যে মিথ্যা তা সত্যকে আবৃত করে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষ্য যদি বলি মুক্তি, তাহলে তার লক্ষ্য বলব, সম্মোহন— বন্ধন।

উভয়ের মধ্যে এই যে মৌলিক পার্থক্য, এ'কে যদি একবার আমরা স্বীকার করে নিই, তাহলে এ সিদ্ধান্তও অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের তথ্যগত সত্যগুলি কিছুমাত্র তথ্যগত সত্যতার অহংকার পোষণ করে না এবং পাঠকের কাছে যে দাবি নিয়ে তারা উপস্থিত হয় তা মোটেই তথ্যগত সত্যতার দাবি নয়। তাদের দাবির জোর তথ্যতায় নয়, অন্যত্র।

এই একই সিদ্ধান্তকে ঈষৎ অন্যরকম ভাষায় এ-ভাবেও বলতে পারি যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস

"He is better at description than at explanation. No historian of the front rank has…made less effort to fathom the depths on which the pageantry of events floats like shining foam."

8. এদের সাক্ষাৎ, বীজাকারে, হয়তো আগেও পাওয়া যাবে, কিন্তু এদের প্রত্যেকটিরই পূর্ণ পরিণতি উনবিংশ শতকে।

ইতিহাসের কাছে থেকে আর যা-ই ধার করে আনুক না কেন, তথ্য ধার করে আনে না। বিশুদ্ধ তথ্যে— স্থান-কালের ফ্রেমে আটকানো সুনির্দিষ্ট এবং সু-সীমায়িত তথ্যে তার প্রয়োজন নেই। তেমন কঠিন নিরেট অনমনীয় তথ্য সে হজমও করতে পারে না। ঐতিহাসিক উপন্যাসকে যদি সত্যিই উপন্যাস হতে হয়— যদি সত্যিই আর্ট হতে হয়, তাহলে তাকে সত্যের ভান, অন্তত তথ্যগত সত্যের ভান সম্পূর্ণ ছাড়তে হবে। অথবা বলি, ভান সে শুধু সেইটুকুই করতে পারবে যা আসলে ভান নয়, যা আসলে খেলারই অঙ্গ। যার আর-এক নাম আর্টের মায়া।

একই সিদ্ধান্তের অপর-পিঠটাকেও এখানে বলে রাখা দরকার। ঐতিহাসিক উপন্যাস যখন 'ঐতিহাসিক সত্য'কে পরিবেশন করবার অভিপ্রায় পোষণ করে তখন সে আর উপন্যাস থাকে না— সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও থাকে না। তখন সে রোমান্সধর্মী ইতিহাসের সমগোত্রীয়। কেননা তখন উভয়েরই কাজ প্রায় অভিন্ন : তথ্যের মুখোশপরা মিথ্যার পরিবেশন। উভয়েরই ধর্ম তখন ছলনা। যে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্মোহিত করে মাটিতেই টেনে রাখতে জানে, অথবা বলি, মাটির তলার দিকে টানে— খোলা আকাশের মুক্তির সন্ধান দিতে পারে না— যা ইতিহাসও নয়, আর্টও নয়, তা সর্বৈব ব্যর্থ।

আমরা সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিচয় পেতে চাই বলেই রোমান্সধর্মী ইতিহাসের পরিচয়টা আগেভাগে সেরে রাখলাম। ঐতিহাসিক উপন্যাস কী নয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা জেনে রাখা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মনে রাখতে হবে যে, ছদ্ম রোমান্সধর্মিতাই ঐতিহাসিক উপন্যাসকে সব থেকে সহজে স্বধর্মভ্রষ্ট করে ফেলে।

৭

উপন্যাস যেমন মানুষের কথা বলে, ইতিহাসও তেমনি মানুষেরই কথা। কিন্তু দুই ক্ষেত্রে মানুষের দুই রকম পরিচয়— দুই দিককার পরিচয়। ইতিহাসের মানুষ বহির্জগতের মানুষ, প্রকাশ্য-পরিচয়ের মানুষ, যাকে বলা যায় 'পাবলিক' মানুষ। ইতিহাসের মানুষ প্রমাণিত তথ্যের-মাপে মাপ-করা মানুষ। ইতিহাস মানুষের অন্তর্জীবনের সন্ধান রাখে না। সন্ধান রাখে শুধু সেইটুকুরই যা ক্রিয়ার মধ্যে বাইরে ব্যক্ত হয়েছে। তারও সবটুকু নয়। মাত্র সেইটুকু যার দলিলগত প্রমাণ আছে।

উপন্যাসের কাজ অনেকটা এর বিপরীত। ইতিহাস যা দেয়, তা উপন্যাস দেয় না, দিতে চায় না। ইতিহাস যা দিতে পারে না সেইটে দেওয়াই উপন্যাসের অভিপ্রায়। যে মানুষ অন্তরময়, ইতিহাসের দলিলে তার প্রত্যক্ষ পবিচয় মিলবে না। সে মানুষ নিকটে থেকেও দুর্গম। অন্তর মেশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়। উপন্যাস মানুষের সেই অন্তরময় রূপটিকে প্রত্যক্ষ করতে চায়। সে রূপের কোনো দলিল নেই। তা কেবল মাত্র উপলব্ধির দ্বারাই সমর্থিত।

ঐতিহাসিক উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও মানুষের সেই অন্তরময় রূপটিই উদ্‌ঘাটিত। ঐতিহাসিক উপন্যাসেও রচয়িতার আসল জোর তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জোর, উপলব্ধির জোর, সমবেদনার জোর, কল্পনার জোর। দলিলের জোর নয়। যার মধ্যে অন্তর মিশিয়ে দেওয়া যায় না, সেই রকম বোবা বধির বিরূপ তথ্য সাহিত্য-রচয়িতার পক্ষে অবাঞ্ছিত ভার ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐতিহাসিক

উপন্যাসের কাছে মাত্র ফ্যাক্ট্ হিসেবে ফ্যাক্টের কোনো দাম নেই। যখন দাম হয় তখন আর তা ফ্যাক্ট্ নয়। তখন তা উপলব্ধি। কল্পনার সঙ্গে তার নিবিড় সখ্য।

ইতিহাস যদি তথ্য-সাধনা হয়, তাহলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে তার মর্মগত কোনো যোগ নেই— থাকতে পারে না, এ কথা স্পষ্ট। উভয়ের অতি-সান্নিধ্যে উভয়েরই ক্ষতি। তথ্য-অনুরাগী ঐতিহাসিকদের কাছে ঐতিহাসিক উপন্যাস যে প্রায় সব সময়ই একটু সন্দেহভাজন, এটা নিতান্ত অকারণ নয়। ইতিহাসের শুষ্ক তথ্য-সাধনার পাশে ঐতিহাসিক উপন্যাস এমন একটা মনোহরণ বিকল্প খাড়া করে যা ঐতিহাসিকের পক্ষে রীতিমত ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে স্কটের কথা উল্লেখ করা যায়। মেকলে থেকে আরম্ভ করে অনেক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক স্কটের উপন্যাসের 'ঐতিহাসিক কল্পনাশক্তির' অনেক প্রশংসা করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্কট সম্পর্কে ঐতিহাসিকের বিরূপতা খুব প্রচ্ছন্ন নেই। ফ্রীম্যান সাবধান করে দিয়েছেন, যদি ক্রুশেড'কে জানতে চাও, স্কটের 'আইভ্যান্হো' পড়ো না। তথ্যেরও যে একটা নিজস্ব আনন্দ আছে, ইতিহাস-পাঠককে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন এই কারণেই ঐতিহাসিকের পক্ষে জরুরি হয়ে ওঠে। এই তাগিদেই স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির প্রতি কটাক্ষ করে র‍্যাঙ্কে-কে বলতে হয়েছিল যে, ইতিহাসের সত্য সব সময়ই "far more beautiful and far more interesting than romantic fiction"। কার্লাইলের উক্তিও এ প্রসঙ্গে সমান তাৎপর্যপূর্ণ: "Let any one bethink him how impressive the smallest historical *fact* may become as contrasted with the grandest *fictitious event*"।

কিন্তু ইতিহাসকে যে এই রকমই তথ্য-সর্বস্ব এবং তথ্য-অন্তপ্রাণ হতে হবে এমন কী বাধ্যবাধকতা আছে? ইতিহাস কি তথ্যের অতিরিক্ত কিছুতেই হতে পারে না? এমন যা মাত্র ফ্যাক্ট্ নয়, ফ্যাক্ট্ এবং ভ্যালু? এমন যা রোমান্সধর্মী ইচ্ছা-পূরণে অনিচ্ছুক, কিন্তু কল্পনার সঙ্গে সখ্যে আপত্তি করে না?

প্রশ্নটা প্রত্যেক ইতিহাস-প্রেমিকেরই, কিন্তু বিশেষ ভাবে ইতিহাসতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর। ইতিহাস শাস্ত্রটা কোন্ জাতীয়? বিজ্ঞান, না আর্ট, না অন্য-কিছু? বিষয়টি ক্রিটিক্যাল ইতিহাস-দর্শনের বহু-বিতর্কিত প্রসঙ্গসমূহের অন্যতম। ইতিহাসে কল্পনার স্থান কতটুকু? ঐতিহাসিক কল্পনা কোন্ জাতের কল্পনা? ইতিহাসের অনুসন্ধান-পদ্ধতি, প্রমাণরীতি— এসব কি স্বতন্ত্র, না পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের অনুসন্ধান-পদ্ধতি ও প্রমাণরীতির সমগোত্রের?

ক্রিটিক্যাল ইতিহাস-দর্শনের এই সব দুরূহ বিতর্কের এইখানেই আমরা সমাধান করে ফেলব, এমন নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করা যায় না। আপাতত তেমন কোনো নির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছনো আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যকও নয়। আমাদের প্রয়োজন সমস্যাটাকে বোঝা এবং বিকল্প সমাধানগুলোর কোন্‌টা আমাদের মূল আলোচনার বিষয় সম্পর্কে কী ইঙ্গিতে দেয় তা লক্ষ করা। এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মতগুলোকে পাশাপাশি রাখলেই আমাদের কাজ চলে যাবে।

আসল প্রশ্নটা ইতিহাসের চরিত্র নিয়ে। ইতিহাস কোন্ চরিত্রের শাস্ত্র? ছোটখাট পার্থক্যকে বাদ দিলে এক্ষেত্রে আমরা প্রধান দাবিদার হিসেবে সাক্ষাৎ পাচ্ছি তিনটি বিশিষ্ট মতবাদের। এর একটি

পজিটিভিজম্। আর একটিকে বলতে পারি আইডিয়ালিজম্। তৃতীয়টির কী নাম দেওয়া যায় জানি না।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কি না, থাকলে সে সম্পর্ক কী —এই প্রশ্নে উক্ত তিন মতবাদীর এক-এক জনের উত্তর এক-এক রকমের। কিন্তু তার আগে এদের পরিচয়টা একটু জেনে রাখা দরকার।

প্রথমে পজিটিভিস্টদের কথা ধরা যাক। পজিটিভিস্টরা সর্বপ্রকার অতীন্দ্রিয়বাদ ও রহস্যবাদের বিরোধী, ষোলো আনা প্রত্যক্ষবাদী। আধুনিক পজিটিভিস্ট মতবাদে দু'দিক থেকে দুটো ধারা এসে একত্র মিশেছে। এক হল বিজ্ঞানপ্রীতির ধারা। দুই বলা যেতে পারে তথ্য-প্রেমের ধারা। বলা বাহুল্য পজিটিভিস্ট ঐতিহাসিকেরা সকলেই অল্পবিস্তর কল্পনা-বিমুখ, সকলেই অল্পবিস্তর ব্যাখ্যা-কুণ্ঠিত।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, কঁৎ নিজে— কিংবা ত্যান্, বাক্‌ল্ প্রভৃতি প্রথম দিকের পজিটিভিস্টরা ইতিহাসকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে ইচ্ছুক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা আধুনিকদের মতো ব্যাখ্যাতে অনাগ্রহী ছিলেন না। বরং 'বিশ্ব-ইতিহাস' 'সামাজিক ব্যাখ্যা' প্রভৃতি সন্দেহজনক ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ উৎসাহ ছিল। আধুনিকেরা এসব ব্যাপারে অনেক বেশি সাবধানী। এত বেশি যে কারো কারো সেইটেই সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে।

এইবারে তথ্যের কথা। তথ্যপ্রীতি স্বাভাবিক অবস্থায় ঐতিহাসিকের অত্যাবশ্যক গুণ, মোটেই দোষ নয়। অষ্টাদশ শতকের উপদেশাত্মক এবং নীতিবাদী ইতিহাসচিন্তার বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে র‍্যাঙ্কে যখন তাঁর সেই বিখ্যাত সূত্রটি ঘোষণা করেন—'ঐতিহাসিকের কাজ আর কিছুই নয়, শুধু ঠিক কী ঘটেছিল, কেমন করে ঘটেছিল, সেইটুকু দেখানো', তখন তাঁর এই সূত্রের মধ্যে তথ্য-ভিত্তিক অনুসন্ধানের সদিচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু উপদেশ বা নৈতিক বিচার এক জিনিস, ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র জিনিস। তথ্য-প্রীতি যখন তথ্যপূজায় পরিণত হয়, ঐতিহাসিক যখন তথ্য-সর্বস্ব হয়ে ওঠেন, যখন তিনি শুধু ব্যাখ্যা-বিমুখই নন, যখন তাঁকে প্রায় সিদ্ধান্ত-বিমুখ বলেই সন্দেহ হবে, তখনই তিনি যথার্থ পজিটিভিস্ট বলে গণ্য হবেন।

সাদা কথায়, পজিটিভিস্ট মতে, ইতিহাস তথ্যের কারবারী। ইতিহাস কখনো সুস্পষ্ট ও সুপরীক্ষিত তথ্যের বাইরে যাবে না। ইতিহাস ভ্যালুর কারবারী নয়। যে ব্যাখ্যায় মূল্যবোধের স্পর্শ থাকে সে ব্যাখ্যা ইতিহাসের নয়। ইতিহাসের প্রমাণ-পদ্ধতি ষোলো আনা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-পদ্ধতি। ইতিহাস খাঁটি বিজ্ঞান, ঠিক যেমন পদার্থবিদ্যা অথবা রসায়ন।

আইডিয়ালিস্টরা মনে করেন যে, ইতিহাস আর বিজ্ঞান দুয়ের মধ্যে কোনো খানে কোনো সমধর্মিতা নেই— ইতিহাসকে কোনো ক্রমেই বিজ্ঞান বলা যায় না। ইতিহাসের তথ্যও তদ্‌গত বা নৈর্ব্যক্তিক নয়, তার প্রমাণ-পদ্ধতিও বৈজ্ঞানিক নয়। ইতিহাসের প্রমাণ অঙ্কের মতো অবরোহীও নয়, পদার্থ-বিদ্যার মতো আরোহীও নয়। ইতিহাস বিশেষ থেকে সাধারণে যায় না, কোনো নিয়ম আবিষ্কার করতে পারে না, কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারে না।

আইডিয়ালিস্ট মতে, ইতিহাসের সব প্রমাণই শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক সঙ্গতির প্রমাণ। তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এটা হল সামগ্রিক শৃঙ্খলার প্রমাণ। অর্থাৎ ঐক্য এবং সুষমার প্রমাণ। কল্পনার ক্ষেত্রে— আর্টের ক্ষেত্রে যে প্রমাণ, উপন্যাসের ভাল-মন্দর যে প্রমাণ, অনেকটা সেই প্রমাণ।

আইডিয়ালিস্ট মতে তথ্য এবং ভ্যালু অভিন্ন। ভ্যালুই তথ্যের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। তথ্য যেন খোলস মাত্র, ভ্যালুটাই চরম। তারই নাম সত্য। তদ্গত তথ্য বলে কিছু নেই। অতীত কখনোই তথ্যরূপে আমাদের হাতে এসে পৌছয় না। অতীত আমাদের কাছে আসে স্মৃতিরূপে, চিন্তারূপে, হয়তো বা কল্পনারূপেও। স্মৃতি-কল্পনা-চিন্তার যে মানসলোক, ঐতিহাসিকের তার বাইরে যাবার জো নেই। হয়তো যাবার প্রয়োজনও নেই। কারণ যাবার জায়গাও নেই। ইতিহাস তো বস্তুর ইতিহাস নয়, ইতিহাস হল চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ।

আইডিয়ালিস্টদের কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, ইতিহাস যখন ঐতিহাসিকের চিন্তা মাত্র, এবং চিন্তাটা যখন বর্তমান— বর্তমান চিন্তাতেই যখন অতীত অনুপ্রবিষ্ট, তখন বলা যায় যে, সমস্ত ইতিহাসই বর্তমান ইতিহাস। ইতিহাস হচ্ছে ঐতিহাসিকের অতীত-কল্পনা, বর্তমানে সংঘটিত। ইতিহাস নিত্য-বর্তমান। একই সঙ্গে কালিক এবং কালাতীত।

আইডিয়ালিস্ট মতবাদ প্রসঙ্গে অনেকেরই নাম মনে হতে পারে। বিশেষ করে জার্মান ব্রহ্মবাদীদের প্রায় সকলেরই নাম। তবু আলাদা করে হেগেল আর ডিল্‌থের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। তা হলেও এখানে কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিকদের কথাই বেশি করে স্মরণ করছি। যেমন ক্রোচেকে, কিংবা কলিংউড্-কে।

আমরা দেখতে পেলাম, প্রথম মতে ইতিহাস খাঁটি বিজ্ঞান। যে-কোনো এম্পিরিক্যাল অনুসন্ধানের সঙ্গে ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানের কোনো মৌলিক প্রভেদ নেই। যে-কোনো জ্ঞান-ক্ষেত্র যে পরিমাণ নিয়মশাসিত, ইতিহাসের ঘটনাও তাই। যে-কোনো বস্তু-চর্চায় প্রকল্প গঠনের জন্যে যতটা কল্পনাশক্তির প্রয়োজন ইতিহাসেও তাই। তার বেশিও নয়, কমও নয়। দ্বিতীয় মতে দেখলাম— ইতিহাস চৈতন্যের অভিব্যক্তি। মহাবিশ্বচৈতন্যেরই হোক আর ঐতিহাসিকের খণ্ড-চৈতন্যেরই হোক— চৈতন্যের বাইরে ইতিহাস নেই। চৈতন্যের বাইরে— স্মৃতি-কল্পনা-চিন্তার বাইরে— ঐতিহাসিকের পদক্ষেপ নেই। সমবেদনার মধ্যে দিয়ে, কল্পনার মধ্যে দিয়ে, হয়তো বলতে পারি আত্মচৈতন্যের উদ্‌বোধনের মধ্যে দিয়ে, ঐতিহাসিক একই সঙ্গে কাল এবং কালাতীতের সাক্ষী হন।

তৃতীয় মতটি অনেক দিক থেকে এই দুই চরমের মধ্যগামী। হয়তো বা এই দুই বিপরীতের সমন্বয়-সাধক। সমন্বয় ঘটুক আর না ঘটুক, সমস্ত মধ্যগামী মতবাদের মতোই এর প্রাঙ্গণেও আমরা বিচিত্র জন-সমাবেশ দেখতে পাই। তার কোনোটাকে পজিটিভিজ্‌মের কোল-ঘেঁষা, কোনোটাকে বর্ণচোরা আইডিয়ালিজ্‌ম্ বলে সন্দেহ হয়। এই তৃতীয় মতবাদের প্রাঙ্গণে যে বিভিন্ন ধরণের ইতিহাস-তত্ত্বের ভীড়, তাদের মধ্যে সাধারণ-লক্ষণ শুধু এইটুকু যে, সকল মতেই ইতিহাস তথ্যাতিরিক্ত— তথ্যাশ্রয়ী হয়েও।

অর্থাৎ সমন্বয়পন্থীরা পজিটিভিস্টদের মতো তদ্গত তথ্যবাদীও নন, আইডিয়ালিস্টদের মতো বিশুদ্ধ চৈতন্যলোকবিহারীও নন, আত্মগত কল্পনাবাদীও নন। এঁরা তথ্যও মানেন ব্যাখ্যাও মানেন। ঘটনাও মানেন, অর্থও মানেন। নিরেট কঠিন বস্তুপিণ্ডকেও মানেন, আবার কল্পনাকেও অস্বীকার করেন না।

এঁদের মতে ইতিহাসের সব তথ্যই নির্বাচিত তথ্য। নির্বাচন সব সময়ই ব্যক্তিমনের তাৎপর্যবোধসাপেক্ষ। তাৎপর্যবোধ মূল্যমানের সঙ্গে জড়িত। মূল্যবোধ-বর্জিত ইতিহাস অসম্ভব। ইতিহাসচেতনা একদিক থেকে জীবনচেতনারই অন্যতম অভিব্যক্তি। সুতরাং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, সম্পূর্ণ তদ্গত ইতিহাস সম্পূর্ণই অবাস্তব। কিন্তু তথ্য-নির্বাচন কেবলই বোধসাপেক্ষই নয়, বলা বাহুল্য, তথ্য-সাপেক্ষও বটে। নির্বাচন শূন্যের নয়, বিষয়ের। বিষয়শূন্য মনোভূমিতে আকাশকুসুমের মতো আপনাতে আপনি ফুটে ওঠে নি। বিষয়ের একটা আপন ভূমি আছে, সেখানে তার শিকড় আছে, ডালপালা আছে। সেই জগতের নাম বহির্জগৎ। ইতিহাসের 'বিষয়' তুই জগতেরই অধিবাসী। কোনো তথ্যই নিছক মানসিক নয়, নিছক কল্পনা নয়। তথ্য বাস্তব, কিন্তু কেবল বাস্তবই নয়। তথ্য আর তার বোধ— অন্তত আমাদের কাছে— অবিভাজ্য। ফ্যাক্ট্ আর তার ভ্যালু— অন্তত আমাদের কাছে— অচ্ছেদ্য। এই কারণেই, ইতিহাস ফ্যাক্ট-ভিত্তিক, কিন্তু ভ্যালু-নিরপেক্ষ নয়।

ইতিহাস কি বিজ্ঞান? এ সম্পর্কে তৃতীয়পন্থীদের বক্তব্য কী? একটা কথা মনে রাখতে হবে। এমন এক সময় ছিল যখন বিজ্ঞান না হওয়াই ছিল আভিজাত্য। এখন দিন পাল্টে গেছে। এখন বিজ্ঞান বলে পরিচিত হতে পারলেই গৌরব। যাঁদের মনে পুরানো আভিজাত্যের স্মৃতি প্রবল, তাঁরা ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষার জন্যেই তাকে বিজ্ঞান বলে মানতে কুণ্ঠিত হন। উল্টো প্রবণতার সঙ্গে একালে আমরা সকলেই পরিচিত। ইতিহাসের গৌরব-রক্ষার মানসেই তাকে বিজ্ঞান বলে ঘোষণা করা, এটা তো যুগেরই হাওয়া।

তৃতীয়পন্থীদেরও কেউ কেউ হয়তো ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলতে আপত্তি করবেন। কিন্তু অনেকেই করবেন না। এটা মাত্র নাম নিয়ে মতবিরোধ। ইতিহাসের অনুসন্ধান-প্রণালী খুব স্বতন্ত্র নয়, তার দৃষ্টিভঙ্গীও বিজ্ঞানের মতোই। তার লক্ষ্য বিশিষ্ট জ্ঞান, সে দিক থেকেও সে বিজ্ঞানধর্মী। কিন্তু তার প্রমাণ-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। সেখানে কল্পনার অবকাশ বেশি। সঙ্গতি এবং ঐক্যের প্রশ্ন সেখানে সম্পূর্ণ অবান্তর নয়। সেখানে ঐতিহাসিকের জীবনবোধ নিজেই অন্যতম প্রধান প্রমাণ। এ দিক থেকে আর্টের সঙ্গে ইতিহাসের সূক্ষ্ম একটা আত্মীয়তাও আছে। যদি পদার্থবিদ্যাকেই বিজ্ঞানের আদর্শ ধরি, তাহলে ইতিহাস বিজ্ঞান নয়। যদি দৃষ্টিভঙ্গী, লক্ষ্য এবং চেষ্টাকে প্রাধান্য দিই, তাহলে— তৃতীয়পন্থী মতে— ইতিহাস অবশ্যই বিজ্ঞান।

এতক্ষণে, এই তিন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পরিচয়ের পরে, আবার আমরা আমাদের মূল প্রশ্নের সম্মুখীন হবার সুযোগ পেলাম— ইতিহাস আর ঐতিহাসিক উপন্যাসের সম্পর্কের প্রশ্ন।

পজিটিভিস্ট মত গ্রহণ করলে এ কথা মানতেই হবে যে, ইতিহাস আর উপন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিবাসী। তুটো জগৎ পরস্পরকে কোথাও স্পর্শ করে না। এদের একের ভাণ্ডারে এমন কিছু নেই যা অপরে নিতে পারে, বা নিয়ে কোনোরকম বিকৃতি না ঘটিয়ে তাকে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে। যেমন রাসায়নিক বা গাণিতিক উপন্যাস অসম্ভব, যেমন দেহক্রিয়াতত্ত্বঘটিত বা ভাষাতত্ত্বঘটিত উপন্যাস অসম্ভব, তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসও অসম্ভব— মাত্র কথার কথা।[৫]

---

৫ মনস্তাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক উপন্যাস সম্পর্কে এই একই কথা প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু এখানে সে প্রসঙ্গ অবান্তর।

আইডিয়ালিস্ট মত গ্রহণ করলে, চৈতন্যের অভিব্যক্তিরূপে আর্ট এবং ইতিহাস— এ দুয়ের ভেদ সম্পর্কেই মনে সংশয় জাগবে। ইতিহাস আর উপন্যাসের সীমারেখা কোথায়? যদি কোনো সীমানা থাকেও, তা স্থির নয়, সতত-পরিবর্তনশীল। তাছাড়া, কে কার উত্তমর্ণ? ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাস থেকে নেয়, না ইতিহাসই উপন্যাস থেকে নেয়? ইতিহাসের প্রমাণ, সে তো সমগ্রতাবোধ সুষমাবোধ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। এ সব বোধ ঐতিহাসিক ইতিহাস থেকে আহরণ করেন না, আহরণ করেন জীবন থেকে। সমগ্রতার বোধই হোক আর জীবনবোধই হোক, এ তো সব থেকে স্পষ্ট অভিব্যক্তি পায় সাহিত্যেই। এ বোধের সংগঠনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দান যেমন আছে, তেমনি এর মধ্যে সাহিত্যের দান— কবিতা উপন্যাস নাটক মহাকাব্য— এদের দানও অবশ্য-স্বীকার্য। কে বলতে পারে সেকালের গ্রীক ঐতিহাসিকেরা হোমারের কাছে কী সূত্রে কতখানি ঋণী? এ ক্ষেত্রে, জীবনবোধের বাবদে, ইতিহাসকেই তো বরং উপন্যাসের কাছে ঋণী ব'লে মনে হয়।

এও বাহু। ইতিহাস আর উপন্যাস দুইই বিষয়ীর মানস-ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত। দুয়েরই অবলম্বন সমবেদনা। দুয়েরই বাহন কল্পনা। ফ্রুড্ থেকে কলিংউড্, নানা কালের নানা গোত্রের লেখক ঐতিহাসিকের সমবেদনা ও কল্পনাশক্তির উপর জোর দিয়েছেন। অতীতের মানুষকে জানতে হলে ঐতিহাসিককে মনে-মনে অতীতের মানুষ হয়ে যেতে হবে। আওরঙ্জেবের ইতিহাস লিখতে হলে মনে-মনে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে তাঁর ভাবনা-কল্পনা-সাধনাকে নিজের বলে জ্ঞান করতে হবে। এই যে এক-হয়ে-যাওয়া, এইটেই তো আর্টের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। তা যদি হয়, তাহলে ঐতিহাসিকে আর ঔপন্যাসিকে তফাত কোথায়?[৬] ঐতিহাসিক উপন্যাসই বা ইতিহাস থেকে ভিন্ন কীসে? ভিন্নই যদি না হয়, তাহলে আর তর্ক কী নিয়ে। সে ক্ষেত্রে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস নামে স্বতন্ত্র কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই।

একমাত্র তৃতীয় মতটিকে গ্রহণ করলে তবেই ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অর্থ তাৎপর্যবোধ ভ্যালু ইত্যাদির উপর জোর দিয়ে এই তৃতীয় মতটি আমাদের যে পথের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, অনেকের মতেই তা বিশুদ্ধ ইতিহাসের পথ নয়। যদি ইতিহাসের হয়ও, তা হলেও শুধু ইতিহাসের নয়। হয়তো তা স্পেকুলেটিভ ইতিহাস-দর্শনেরও পথ।

ইতিহাস-জিজ্ঞাসু হিসেবে আপন বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী আমরা উক্ত তিনটি মতের যে-কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারি, যে-কোনো দুটিকে বর্জন করতে পারি। কিন্তু সাহিত্যিক— যিনি ঘটনাকে

---

৬. আইডিয়ালিস্ট কলিংউড্ ইতিহাস আর উপন্যাসের পার্থক্য নির্দেশ করে বলেছেন যে, উপন্যাস জিনিসটা কল্পনার দ্বারা শাসিত, আর ইতিহাস জ্ঞাত তথ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কথাটার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, কল্পনার জগৎ অনেক এবং তারা পরস্পর-অসংপৃক্ত। কিন্তু ইতিহাসের জগৎ তা নয়। সে জগৎ এক। সে জগৎ দেশে-কালে অধিষ্ঠিত এবং অখণ্ড। বলা অনাবশ্যক যে, কলিংউডের এই বক্তব্য আইডিয়ালিস্ট ইতিহাসতত্ত্বের সঙ্গে মিলবে না। এবং তাঁর রিয়ালিস্ট প্রতিপক্ষেরা এর প্রায় প্রত্যেকটি কথাই সানন্দে সমর্থন করবেন। কারণ দেশে-কালে অধিষ্ঠিত বহির্বাস্তবকে একবার মানলে, আইডিয়ার একচ্ছত্র অধিকারকে খর্ব করতেই হবে।

সব সময় উপলব্ধির মধ্যে গ্রহণ করেন, তিনি তা পারেন না। অন্তত যিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিশ্বাস করেন, তিনি তা পারেন না। তাঁর কাছে তিনটে বিকল্পই তুল্যমূল্য নয়। একটি মতের দরজাই তাঁর কাছে খোলা— সেই যাকে বলা হয়েছে তৃতীয় মত।

তার কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের কতকগুলি পূর্ব-স্বীকৃতি আছে, কতকগুলি সুস্পষ্ট শর্ত আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্ভব, এই কথাটুকু মেনে নিলেই, সেই শর্তকে মেনে নেওয়া হয়। এতক্ষণ আমরা ইতিহাসের দিক থেকেই ইতিহাসের পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি। এইবারে আমরা সাহিত্যের দিক থেকে— ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিক থেকে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের পূর্ব-স্বীকৃতিগুলির দিক থেকে ইতিহাসকে দেখতে চেষ্টা করব।

ঐতিহাসিক উপন্যাস কথাটা যদি নিতান্তই ফাঁকা কথা না হয়, তার যদি সত্যিই কোনো বিশিষ্টতা থাকে, সেই বিশিষ্টতার যদি কোনো রসগত তাৎপর্য থাকে, তাহলে তার ঐতিহাসিকতাটাও সত্য, এবং সেই ঐতিহাসিকতারও তাহলে নিশ্চয়ই একটা রসগত তাৎপর্য আছে। এই রসগত তাৎপর্যের দাবির মধ্যেই আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের পূর্ব-শর্তগুলির সন্ধান পাব।

প্রথমত মানতে হবে যে, পরিবর্তন জিনিসটা সত্য, নিয়ত এবং নিত্য। এ পরিবর্তন সর্বাত্মক। জীবন এবং জীবন-পরিবেশ— সব-কিছুর। মানব-উপলব্ধিতে এ পরিবর্তনের যে বিশেষ রূপটি ফুটে ওঠে, যাকে বলতে পারি জীবনের চলৎরূপ, তা অর্থহীন কার্যকারণ-শৃঙ্খলাবিহীন নিরাকার নিরবয়ব পিণ্ড নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তব কার্য-কারণে এবং কার্য-কারণের পারম্পর্যে বিশ্বাসী। প্রকাশ-রীতিতে হোক আর না-হোক, চরিত্র-ধর্মে সে ঘোর বাস্তববাদী। যে-কারণে তাকে বাস্তববাদী বলছি, ঠিক সেই কারণেই বলতে পারি যে, সমস্ত বাস্তববাদী উপন্যাসই ভিতরে-ভিতরে ঐতিহাসিক উপন্যাস— তা সে অতীতচারী হোক আর না-ই হোক। কথাটা পরে আসছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসকে সত্য বলে স্বীকার করলে, নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, আবার পর্বে পর্বে সার্থক নতুনত্ব— এই দুইকেই আমাদের সত্য বলে মেনে নিতে হবে। নতুনত্ব যখন অর্থবান্, তখন তার কারণও মানববোধের অগম্য নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস এই অর্থবান্ নতুনত্বের রূপ ও রহস্যকে আমাদের দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস যদি সম্ভব বলে মানি, তাহলে এও মানতে হবে যে, মানুষ যথার্থই ইতিহাস-সন্ততি। ইতিহাসের প্রত্যেক পর্বের অভিনবত্ব মানুষের জীবনের মধ্যে, মানুষের মানবিক মর্মসত্যের মধ্যে প্রবেশ করে। মানুষের মর্মসত্যের কোনো নিত্য রূপ নেই। তার রূপ তার সত্য সবই ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত।

সঙ্গে সঙ্গে এও মানতে হবে যে, ইতিহাস পর্বে পর্বে যে নতুনত্বের সৃষ্টি করে তার মধ্যে দিয়ে নতুন ভ্যালুরও জন্ম হয়। সেই ভ্যালুর সাধনাই মানুষের ঐতিহাসিক ভূমিকা। এই ভূমিকার গুণেই উপন্যাসের পাত্রপাত্রী যথার্থ ঐতিহাসিকতা অর্জন করতে পারে— উপন্যাস যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে ওঠে। 'গোরা' যে-অর্থে যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস, তা হল এই। গোরা ইতিহাসের বই থেকে

নেমে এসেছে কি না প্রশ্ন সেটা নয়, গোরা যে প্রকৃত ঐতিহাসিকতা অর্জন করেছে, আসল কথা হল সেইটে। এই অর্থে অনেক সার্থক উপন্যাস 'অতীতের' না হয়েও ঐতিহাসিক হয়ে উঠতে পারে।

মনে রাখতে হবে যে, ভ্যালু-সচেতন ইতিহাসগত মানুষের চাওয়া এবং পাওয়া— না-পাওয়া এবং পাওয়ার জন্যে সংগ্রাম, এর মধ্যে দিয়ে মানবজীবনের যে রূপবৈচিত্র্য ফুটে ওঠে, যে রূপ অগভীর ত্বকের নয়, গভীর মর্মের, ঐতিহাসিক উপন্যাস সেই রূপকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। অন্য উপন্যাস যদি তাই করে, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে অন্য জাতীয় নয়, সেও ঐতিহাসিক। সেই অর্থে সমস্ত সার্থক উপন্যাসই অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক— সজ্ঞানে অথবা অলক্ষ্যে।

দেখা যাচ্ছে, ইতিহাস আর ইতিহাস-দর্শনকে মিলিয়ে দেখাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংস্কার। এ সংস্কার বোধকরি সাধারণ বুদ্ধিরও। সাধারণ বুদ্ধিও ইতিহাসের একটা সামগ্রিক রূপ দেখতে চায়, ইতিহাসের মধ্যেই তার অর্থকে পাবার প্রত্যাশা করে।

সাধারণবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা ইতিহাসের তিনটি স্বতন্ত্র অঙ্গ বা ধাপকে পরিষ্কার চিহ্নিত করে নিতে পারি। এই ধাপের এক-একটিতে ইতিহাসের এক-এক রকম দায়িত্ব— এক-এক রকম ভূমিকা। প্রথম ধাপে সন্ধান ও সংগ্রহ। দ্বিতীয় ধাপে সংশ্লেষণ ও সংগঠন। তৃতীয় ধাপে সংরচন।

প্রথম ধাপটি প্রধানত বিজ্ঞানধর্মী। দ্বিতীয় ধাপ চিন্তা-প্রধান। তবে মাত্র চিন্তা নয়, কল্পনা, সমবেদনা, সামগ্রিক জীবনবোধ সবই এর মধ্যে ক্রিয়াশীল। তৃতীয়, অর্থাৎ সংরচনের ধাপটি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই সাহিত্যধর্মী।

এই তিন ধাপের কোন্‌টির গুরুত্ব কার কাছে বেশি, তারই উপর নির্ভর করে ইতিহাসকে কে কোন্ মূর্তিতে দেখছেন। প্রথম ধাপটিকে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে আমরা বিউরি-র সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলব, "...Though she [ইতিহাস] may supply material for literary art or philosophical speculation, she is herself simply a science, no less and no more"। তৃতীয় ধাপের গুরুত্বের কথা মেকলে থেকে ট্রেভেলিয়ান অনেকেই বার বার আমাদের শুনিয়েছেন, এবং শোনাবার প্রয়োজন এখনো শেষ হয় নি। যে গুণে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে, যে গুণের জন্যে ইতিহাস 'ক্লিও'-নামে মিউজ'দের একজন, সে এই তৃতীয় অঙ্গের গুণ। আর দ্বিতীয় ধাপ? তার কথায় পরে আসছি।

শুধু সাধারণ বুদ্ধি নয়, ঐতিহাসিকেরাও অনেকে এ বিভাগ সমর্থন করবেন। যেমন ট্রেভেলিয়ান। তিনিও ইতিহাসের এই রকম তিন অঙ্গের ভাগের কথা বলেছেন।[৭] প্রথম অঙ্গকে তিনি বলেছেন— বৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয়টিকে বলেছেন— কল্পনাত্মক বা চিন্তামূলক (imaginative or speculative)। তৃতীয় অঙ্গ সাহিত্যিক। যদিও ইতিহাসকে তিনি আর্ট বলে মনে করেন, তবু তিনি এই তিন অঙ্গের কোনোটিকেই লঘু করে দেখেন নি। তাঁর মতে এর কোনোটিই গৌণ নয়।

ট্রেভেলিয়ান ঐতিহাসিক, সুলেখক এবং সুপণ্ডিত। তাঁর কাছে তিন অঙ্গেরই গুরুত্ব সমান হওয়া আশ্চর্য নয়। যে-কোনো একটিকে মুখ্য করে অপর দুটিকে গৌণ করলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

---

৭. *Clio, A Muse*-গ্রন্থে 'Clio Rediscovered' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিকেরই দৃষ্টিভঙ্গী। আমাদের প্রশ্ন সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। সাহিত্য ইতিহাসকে কোন্ দৃষ্টি দিয়ে কী মূর্তিতে দেখে?

ইতিহাসের সন্ধান সংগ্রহ সাক্ষ্য দলিল ইত্যাদির সম্পর্কে— ইতিহাসের খাঁটি বিজ্ঞানধর্মী দিকটির সম্পর্কে— সাহিত্যের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ইতিহাসের বিজ্ঞান-মূর্তিকে সাহিত্য শ্রদ্ধা করতে পারে, কিন্তু দূর থেকেই। ইতিহাস-রচনার সাহিত্যগুণ, সেখানে তো ইতিহাসই বরং অধমর্ণ, ইতিহাসের এই আংশিক সাহিত্য-মূর্তির প্রতিও সাহিত্যের স্বতন্ত্র কোনো আকর্ষণ নেই। সে-ইতিহাসেরও সাহিত্যকে দেবার কিছু নেই। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্গ তা নয়। কেননা সেই খানেই জীবনের সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি, সেই খানেই জীবনের সমগ্রতা।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সম্ভবপরতার দিক থেকে ইতিহাসের এই ভাবগ্রাহী, চিন্তাশীল, দ্রষ্টা-মূর্তিটিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই খানেই প্রথম ধাপ আর তৃতীয় ধাপের মিলন। এই খানেই ইতিহাসের হয়ে-ওঠা। এই খানে বিজ্ঞান আর্ট এবং দর্শন পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিত। এইখানে ইতিহাস আর জীবনদর্শন পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পুষ্ট হয়, ইতিহাস-দর্শন ইতিহাসের সঙ্গে মিলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ইতিহাস রস', এইখানেই তার উৎস।

১০

স্পেকুলেটিভ ইতিহাস-দর্শনের প্রতি আধুনিক ঐতিহাসিকের বিরূপতার কারণ একাধিক। একালের হেগেল-বিরোধী মনোভাব এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে পরাবিদ্যার অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া যে এই বিরূপতার অন্যতম প্রধান হেতু তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিস্থিতিকে আসলে সংকটময় করে তুলেছে মার্কসের সংগ্রামী ইতিহাসতত্ত্ব। ইতিহাস-দর্শন আজ আর নিরুপদ্রব গ্রন্থলোকবিহারীদের নিরাসক্ত শাস্ত্রালোচনায় সীমাবদ্ধ নয়। তা এখন বহু-বিরোধ ও বহু-সমর্থনে প্রবলভাবে দ্বন্দ্ব-মুখর। ফলে স্পেকুলেটিভ ইতিহাস-দর্শন আধুনিক ঐতিহাসিকদের কাছে এখন বিপজ্জনক নিষিদ্ধ এলাকা। পাছে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে এই সংকটাকীর্ণ এলাকায় পদক্ষেপ ঘটে যায়, সেই আশঙ্কায় ঐতিহাসিকেরা এখন সমস্ত রকম অর্থগর্ভ সিদ্ধান্ত, সমস্ত রকম ব্যাপকতা-সম্পন্ন ব্যাখ্যা এবং সমস্ত রকমের ভ্যালু-সংক্রান্ত মন্তব্য সযত্নে এড়িয়ে চলেন।

এই 'নিরাপত্তা-নীতি'কে কেউ কেউ ঐতিহাসিকের কূর্মবৃত্তি বলতে পারেন, এক ধরণের এস্‌কেপিজম্ বলে নিন্দা করতে পারেন। এ নিন্দা কতদূর সঙ্গত— এই নিরাপত্তা-নীতি সত্যিই ঐতিহাসিককে জীবন-বিমুখ করে তোলে কি না, সে আলোচনা আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হবে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, ইতিহাস যদি ইতিহাসের মধ্যেই তার অর্থকে খুঁজে বার করতে না পারে, ইতিহাসের নিজের সীমানার মধ্যেই যদি ফ্যাক্ট্ এবং ভ্যালু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে, তবে সে ইতিহাস যতই খাঁটি নিরাপদ এবং নিশ্চিত হোক না কেন, সাহিত্য কোনো কারণেই তার দ্বারস্থ হবে না। তার ভাণ্ডার ধনরত্নে পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যকে দেবার মতো কিছুই যে সে ভাণ্ডারে নেই এ কথা নিশ্চিত জানব।

সাহিত্য জীবনকে বুঝে নেবার জন্যেই কালের প্রবাহকে বুঝে নিতে চায়। ঠিক সেই কারণেই—

জীবনকে কালস্রোতের মাঝখানে চলমান রূপে দেখবার আশাতেই সাহিত্য ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়। ইতিহাসের কাছে সে তথ্যগত সত্য চায় না, চায় ঐতিহাসিক মানুষের মর্মগত সত্য।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক নামিয়ার বলেছেন, ঐতিহাসিকেরা "imagine the past and remember the future"। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কী রহস্যে পরস্পর পরস্পরে সঙ্গত থাকে, সাহিত্যিক ঐতিহাসিকের কাছে তারই সন্ধান পেতে চায়। অতীতকে কল্পনায়, ভবিষ্যৎকে স্মৃতিতে ধরতে চায়। অতীতের মধ্যে বর্তমানকে, বর্তমানের মধ্যে অতীতকে এবং এই দু'য়ের মধ্যে ভবিষ্যৎকে দেখতে চায়। ইতিহাস যদি ত্রিকালদ্রষ্টার ভূমিকায় নামতে ভয় পায়, তাকে দিয়ে সাহিত্যের কাজ নেই। ত্রিকালের প্রতিই সাহিত্যের বিশেষ লোভ। সেইখানেই জীবনের চলৎ-রূপের রহস্য। তারই আশায় উপন্যাস ইতিহাসের সামনে অঞ্জলি মেলে দাঁড়ায়। কিন্তু সে অঞ্জলি মূষিকের অঞ্জলি নয়। কুণ্ঠিত হাতের মুষ্টিভিক্ষায় তার আগ্রহ নেই।

তথ্য-সর্বস্ব অর্থবিমুখ বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আপন মহিমায় স্বস্থানে বিরাজ করুক। তার শ্রীবৃদ্ধিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি। তাতে সাহিত্যের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। কিন্তু আরো অন্য এক-রকমের ইতিহাস থাকুক— তার নাম যদি ইতিহাস না হয় তো না-ই হল— কিন্তু একটা-কিছু থাকুক যেখানে আমরা জীবনের ফ্যাক্‌ট্‌গুলোকে শ্রেয় এবং সুন্দরের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারব।

সাহিত্যের প্রয়োজনে ইতিহাস নিজেকে বদলাবে না তা জানি। সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষার টানে নতুন ইতিহাস রচিত হবে না এও জানি। কিন্তু প্রয়োজনটা তো শুধু সাহিত্যেরই নয়। প্রয়োজনটা জীবনের। যে ইতিহাস সাহিত্যের পক্ষে নিষ্ফলা, খুব সম্ভব সে জীবনের পক্ষেও নিষ্ফলা। যে ইতিহাসকে জীবনের সত্যিই প্রয়োজন, সে ইতিহাস অবশ্যই আছে, অবশ্যই থাকবে। ভীড়ের মধ্যে তাকে চিনে নেবার দায়িত্ব আছে সে কথা অস্বীকার করি না।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের যা-কিছু অন্তরের যোগ, তা শুধু সেই ইতিহাসের সঙ্গেই। এবং শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাসের নয়, কম-বেশি সব উপন্যাসেরই। সেই ইতিহাসের সত্যকেই উপন্যাস তার নিজের মতো করে প্রকাশ করে। সে সত্য কেবল তথ্য নয়, তথ্যের অন্তরের মর্মসত্য— একদিকে তথ্যের থেকে কম, অন্যদিকে তথ্যের থেকে অনেক বেশি। ইতিহাস আর উপন্যাসের মর্মকথাটা একই। তার নাম মানবসত্য। একই মানবপরিচয়, কেবল উভয়ের উপলব্ধির ধরণটা ভিন্ন, প্রকাশটা স্বতন্ত্র। উপন্যাসে যে মানবপরিচয় তার প্রকাশ ঘটে কল্পনার জগতে। সে প্রকাশ রূপের ভাষায়, প্রতীকী বিগ্রহের সাংকেতিকতায়।

এই মানবপরিচয়-মূলক ইতিহাস হয়তো স্পেকুলেটিভ ইতিহাসদর্শনের সঙ্গে হরিহরাত্মা। 'ইতিহাস-বিজ্ঞানী' হয়তো এর প্রতি অপ্রসন্ন ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করবেন। তা করুন, উপন্যাসের তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। উপন্যাস নিজেও তো কম স্পেকুলেশনধর্মী নয়।